রঙ্কিনী
অঙ্কুর বর
BIVA

BIVA

রঙ্কিনী

রঙ্কিনী

(রাঢ় দেবীর ভয়ঙ্কর কল্পকথা)

অঙ্কুর বর

বিভা পাবলিকেশন

RANKINI
by ANKUR BAR
Published by Biva Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Roypara, Hatiara, Kolkata 700157
Phone : 9434343446
e-mail : biva.publications@gmail.com
follow us : facebook.com/BivaPublication
Website : www.bivapublication.com
Rs. 277.00

ISBN: 978-93-86548-84-9

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০, অগ্রহায়ন ১৪২৭

প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

অলঙ্করণ: কৃষ্ণেন্দু মন্ডল ও অঙ্কুর বর

সম্পাদক: সুমঙ্গল পণ্ডিত

২৭৭ টাকা

প্রকাশক: বিভা পাবলিকেশন

পরিবেশক

দে বুক স্টোর (দীপু দা),
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভারতী বুক স্টল,
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

। উ । ৎ । স । র্গ

সেইসব পাঠক বন্ধুদের, যারা আমার মতোই গল্প পড়তে পড়তে একদিন ঠিক সাহস করে গল্প লেখা শুরু করে দেবেন।

ভূমিকা

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হলেও ব্যাপারটা আপনাদের খুলেই বলি। উপন্যাস লিখতে গিয়েও আমায় এমন নাকানি চোবানি খেতে হয় না যতটা আমায় আমার বই এর ভূমিকা নিয়ে খেতে হয়। এখানে এসেই কেমন যেন একটা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় পড়ি। অবশ্য এই সময় যে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসবো তারও উপায় নেই। বই লিখব অথচ ভূমিকা লিখতে গিয়ে নানান বায়না? সম্পাদক দাদা ছাড়বে নাকি? হারগিজ নহি। তাই আর কী করা, পেন চিবিয়ে, চিবিয়ে কোনওরকমে শুরু করতেই হল ব্যাপারটা।

প্রথমেই আসি যে ধরনের কনফিউশন তৈরি হয় এই ধরনের বই নিয়ে। অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন, 'এই যে আপনি এরকমভাবে এই গল্পটা লিখলেন, আমরা তো অন্যরকম কিছু শুনেছি, কোন্‌টা সত্যি?', 'আপনি কোথায় পেলেন এই ধরনের তথ্য?', 'জানেন দেবী কত জাগ্রত? তাঁকে নিয়ে যা হোক কিছু একটা লিখে দিলেই হল?', 'আমরা তো শুনেছি অমুক জায়গায় দেবীর প্রভাব রয়েছে, সেখানটিকে নিয়ে কেন লিখলেন না?' আরও কত কী।

সব ক-টা প্রশ্নের জন্য আমার কাছে মাত্র দুটো উত্তর আছে। প্রথমটি, রঙ্কিনী দেবীর যে ধরনের কাহিনিগুলো শুনি সেগুলো বেশির ভাগই মিথ, বাংলায় যাকে বলা হয় শ্রুতিকাহিনি। সত্যি কথা বলতে কী আমার বিশ্বাস, সকল দৈবিক-কাহিনিই তাই। তো এই শ্রুতিকথার ওপর নির্ভর করে যে ধরনের কাহিনি (সে লৌকিক হোক বা অলৌকিক) গড়ে ওঠে তার সত্যতা প্রমাণ করাটা যে কারোর পক্ষেই বড় দুঃসাধ্য একখানা ব্যাপার। তাই এই গল্পটি আমি আমার মতো করেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। আর দ্বিতীয়টি উত্তরটি হল, (ফিসফিস করে) এই উপন্যাসটি আগাগোড়াই একখানা কল্পকথা। আর

কল্পকথার সত্যতা যাচাই করতে নেই। তাই সকলকে একটাই কথা বলব। সকলে পড়ুন। আশাকরি এই পর্বটা গতবারের মতোই উপভোগ্য হবে।

এই যে বইটা বেরোচ্ছে এটার একমাত্র কৃতিত্ব সুমঙ্গল পণ্ডিত দাদার। তারই ইচ্ছেতে 'রঙ্কিনী' আজ ফেসবুকের পাতা থেকে ছাপার অক্ষরে। তাকে অনেকটা ভালোবাসা। ওহ, হ্যাঁ আরো দু-জন রয়েছে তালিকায়। আমার মা, বাবা। এমনিতে সময় সারাক্ষণ বকাবকি করেন। সবসময় বলেন 'এটা কর', 'ওটা কর'। কিন্তু যখন লিখতে বসি, কী আশ্চর্যভাবে তাঁরা আমার চারপাশটা এত শান্ত করে তোলেন যে আপনা হতেই লেখা বেরিয়ে আসে। তারা সেই পরিবেশটা আমায় দিয়েছেন, তাই হয়তো এই লেখা বেরিয়েছে। সন্তান হিসেবে তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়াটা উচিত নয়, তবে একজন লেখক হিসেবে তাঁদের ধন্যবাদ দিতেই পারি। তাই না?

অঙ্কুর বর
কলকাতা
৬ অক্টোবর, ২০২০
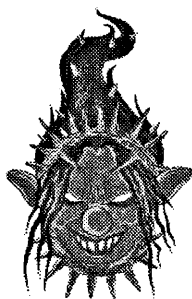
সূচিপত্র

(অপদেবতার শয্যা)

জহরডুনী গ্রামটা খুব একটা বড় নয়। পাহাড়ি জঙ্গলের কোল ঘেঁষে তৈরি করা বিশ-পঁচিশটি কুঁড়েঘরে আদিবাসী, ভিল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সহাবস্থান। বেশিরভাগ ঘরগুলোরই ছাদ নিচু, নারকেল তালপাতার ছাউনি মাথার উপর। দেওয়াল বাঁশের কঞ্চির গায়ে কাদামাটি লাগিয়ে কোনওরকমে দাঁড় করানো। পাহাড়ের জঙ্গল থেকে মধু আহরণ করা এদের মুখ্য জীবিকা হলেও, এতে উপার্জনের পরিমাণ যথেষ্ট কম। তাই ইদানীং কিছু পরিবার শিকার আহরণ করে হাটে বাজারে মাংস বিক্রি, পশুর চামড়া ছাড়িয়ে মাদল বানানের দিকে ঝুঁকেছে। রোজগার মন্দ হয় না। একসময় ছিল, যখন সারাদিন এরা বনে বনে পশুশিকার, মধু সংগ্রহ করত, আর সন্ধ্যা নামলেই গাঁয়ের মাঝের খোলা চত্বরে আগুন জ্বালিয়ে মহুলের রস খেয়ে উদ্দাম নাচ, গান চলত। মাদলের বোলে, মহুয়ার গন্ধে সারা এলাকা ম ম করত। এসব বহুবছর আগেকার কথা, তখন লোকদের মনে প্রশান্তি থাকত, আনন্দ থাকত, উৎসাহ থাকত। স্বচ্ছলতার অভাব থাকলেও শান্তির অভাব খুব কমই থাকত।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন। পুরো রাঢ়ভূমি জুড়ে এখন যা অবস্থা, তাতে সকলের মনে শুধু আতঙ্ক, সকলের মনে শুধু ভয়। এ এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। সকলে ভাবে এই বুঝি সর্বনাশ তাদের দুয়ারে হাজির হল, এই বুঝি কারও পালা পড়ল।

কারও মনে শান্তি নেই, কারো মনে সুখ নেই। এক ভয়ঙ্কর অপেক্ষার প্রহর যেন সকলে গুনে চলছে চুপটি করে। এখন আর অকারণে মাদল বাজে না গাঁয়ে, কেউ কারও সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না। হয় না আগেকার মত মহুলের রস খেয়ে সেই উদ্দাম নৃত্য, গীত। সূর্য ডোবার আগেই গ্রামের মহিলারা রান্নাবান্না আর রাত্রিকালীন সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয়। পুরুষরা ফিরে আসে যে যার কাজ সেরে। তারপর সূর্যডোবার সঙ্গে সঙ্গেই

খাওয়াদাওয়া সেরে, কুপির আলো নিবিয়ে যে যার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। চরাচরে অন্ধকার ঘনালে এই গাঁয়েও অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এক নীরবতার অন্ধকার, আতঙ্কের অন্ধকার। শিশুরা পর্যন্ত কাঁদে না এ গাঁয়ে। এক লহমায় দেখলে মনে হয় সারা গ্রাম কোনও এক অপদেবতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন।

সূর্য অস্ত গিয়েছে অনেকক্ষণ। সময়ের হিসেব করলে এখন মধ্যরাত্রি।

গ্রামের শেষ মাথায় যে ঘরটি আছে সেটি গ্রামের আর পাঁচখানা ঘরের তুলনায় আকার আয়তনে বড়। এই ঘর গাঁয়ের মোড়ল হেমেন সরেনের। বছর চল্লিশের হেমেন কর্মঠ, দক্ষ শিকারি আর বিবেচক নেতা। আজ এই ঘরের ভেতরে জ্বলতে-থাকা ধুনির আগুন ঘিরে বসে রয়েছে গ্রামের একাধিক লোক। সকলেই পুরুষ। প্রত্যেকের হাতে খোলা অস্ত্র। কারও হাতে টাঙ্গি, কারও হাতে তীরধনুক, কারও হাতে শিকারের বর্শা, কেউ বা এনেছে নদীতে মাছ ধরার ত্রিফলা বল্লম। ধুনির আলোয় তাদের চিকন কালো মুখগুলো যেন পাথরের মতো কঠিন দেখতে লাগছিল। প্রত্যেকের মুখেই আতঙ্ক, কিন্তু সেই আতঙ্ক ছাপিয়ে চোখে জ্বলে উঠছে অদম্য একখানা তেজ।

— "উহারা আইসছে।" দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠল হেমেন সরেন।

— "তবে মুরাও তৈরিটো আছি। ই গাঁয়ের একটাও ঝিয়ের বলি হতে দিবক লাই।"

— "কিন্তু উহাদের সঙ্গে কি মুরা পারবো?" দলের মধ্যে থেকে একজন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল মোড়লের দিকে, "উরা তন্তর, মন্তর টো জানে। ভূত, পিশাচ, জল, বাতাস ওদের হাতে। নদীর জল, রাঢ়ের ধুলা, আর সূর্যের আগুন লিয়ে উ অপদবতা তৈরি। তাকে কীভাবে মুরা হারাবো? আমরা কি এই টাঙি, তীর ধনুকটো লিয়ে..."

— "লোধাই ঠিকটো কইঞ্ছে..." একটি প্রৌঢ় গোছের লোক বলে উঠল বিড়বিড় করে, "ওরা তুগান এর মিয়াটোকে অপদেবতার বলিটো করতে

চায়...। যদি আমরা উদের পথে বাধা দিই উরা পুরা জহরডুনী শেষটো করি দিবে। শকরগঞ্জ, নিধুপুরলির কথা ভুলি গেলি। একটো মিয়ার জন্য পুরা গাঁ-টো শেষ হই গিছিল। গাঁয়ের লোকেদের মড়া দূরের কথা, একটা নখ পর্যন্ত খুঁজে পেতে লারে সেথাকে। ইবার এখানেও একটো মিয়ার জন্য পুরা গাঁটো শেষ হয়ে যাবে। আরেকবার ভেবে দ্যাখ সর্দার। উরা...”

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না সেই প্রৌঢ়। হেমেন সরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝপথেই থেমে গেল তার স্বর।

— “তুরা কী ভাবছিস?” হেমেন সরেনের গলা স্থির। “এ গাঁয়ের একটা মিয়াটো লিয়েই ওরা থেমে যাবে? ভুল ভাবছিস। মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘকে দেখেছিস কখনও শিকার বন্দোটো করতে? ই অপদেবতাও বন্দোটো করবেক লাই। আজ ও তুগানের মিয়াটোকে লিয়ে যাবে, কাল উ তুর মিয়াটোকে লিয়ে যাবে। তখনও এক কথা কইবি তো?”

ঘরের ভেতর পিনপতন নীরবতা। হেমেন উঠে দাঁড়াল টাঙি হাতে।

— “জহরডুনী গ্রাম কখনও শেখায়নি মোদের, বিপদে মোদের বন্ধুটোর হাতটো ছেড়ে দিতে। তবুও যাদের মনে হচ্ছে, এ শুধু তুগানের বিপদ... পুরা গাঁয়ের লয় তারা নিজেদের পরিবারটো লিয়ে জঙ্গলে গাটো ঢাকা দিতে পারিস্। তাদের জন্য দরজাটো খোলাটো আছে।”

হেমেনের উদাত্ত কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যা শুনে সকলেই চুপ করে রইল। এমন কী একটু আগে যুদ্ধের বিরোধিতা করা প্রৌঢ়ও।

ঠিক এমনসময় অনতিদূরে কোথাও একখানা শিঙার আওয়াজ ভেসে আসতেই চমকে উঠল হেমেন। এ যে তাদের আগমন বার্তা। রাত্রি প্রায় শেষের দিকে। তুগানের মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন সময়ই তো আসার কথা ছিল অপদেবতার অনুচরদের। হেমেন নিজেও জানে এদের সঙ্গে তারা কিছুতেই পেরে উঠবে না। এদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউই পেরে ওঠেনি। কিন্তু এরপরেও এক অদম্য জেদ যেন কাজ করছে তার। কিছুতেই মন চাইছে না বিনা যুদ্ধে একটা ফুটফুটে নিষ্পাপ মেয়েকে শয়তানের ভোগের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে। বারবার তার মন বলছে কিছু একটা ঘটবে।

ঘটবেই।

চোখের ইশারায় সে সকলকে একটা নির্দেশ দিতেই ধুনির আগুনে একে একে সকলেই মশাল ধরিয়ে কুঁড়েঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। হেমেনের ঘরের বাইরে জায়গাটা কিছুটা ফাঁকা। তারপরেই একটা চওড়া রাস্তা সোজা গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিশেছে।

সকলের আগে হেমেন সরেন। তার পাশেই দাঁড়িয়ে তুগান মান্ডী। ওদের পিছনে আরও জনা দশেক পুরুষ। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র।

ওদিকে শিঙার আওয়াজের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশ্রী মড়মড় করে শব্দও পাওয়া গেল।

সামনের বনে কিছু একটা আলোড়ন হচ্ছে। কীসের আলোড়ন ওটা? অপেক্ষা করতে হল না বেশিক্ষণ। উত্তর পাওয়া গেল অচিরেই। একদল মুণ্ডিত মস্তক, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত লোক দ্রুতপায়ে সামনে এগিয়ে আসছে। কিছুজনের হাতে মশালের আলো। আর সেই আলোয় দেখা গেল দলের অগ্রভাগে থাকা এক ব্যক্তি কিছু একটা হাতের ইশারা করছে, আর দলের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে-থাকা বড় বড় গাছ বিকট শব্দে মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

দেখতেই দেখতে পুরো দলটি ওদের গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করল। এত দূর থেকেও টের পাওয়া যাচ্ছে ওদের মুখের সেই পৈশাচিক ভাব, আর চোখের কুটিল দৃষ্টি।

মুহূর্তে তীর সংযোজন করে আগত দলের উদ্দেশে সেই তীর নিক্ষেপ করল হেমেন। দক্ষ শিকারির নির্ভুল পরিমাপে সেই তীর গিয়ে পড়ল আগত দলটির হাতদুয়েক সম্মুখে। থমকে দাঁড়াল সেই দল।

"যতটা আসিছিস ততকটা আসিছিস, আর পা বাড়াইসনি।" আগতদলের উদ্দশে চিৎকার করে উঠল হেমেন। "আর এক পা বাড়ালে তার জবাবটো মোদের তীরটো দেবে। নিজেদের ভালোটো চাইলে তুরা ফিরে যা কিনে... মুরা মুদের গাঁয়ের বেটিটো কিছুতেই তোদের নিয়ে যেতে দেবক লাই।"

হেমেনের কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উলটোদিকের দলে একটা হাসির

রোল পড়ল যেন। ভাব এমন যেন ভারী মজার কথা বলেছে হেমেন।

কয়েকমুহূর্ত পরে সেই হাসি স্তিমিত হলে, দলের পুরোভাগে থাকা লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল,

— "হুহ! মহান কল্লকেশীর ভক্তদের আটকাবি তোদের এই সামান্য তীর দিয়ে?" লোকটির কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল, "ভুলে গেছিস তোদের আশপাশের গ্রামগুলোর কী অবস্থা করেছি আমরা? চাইলে তোদের চোখের পলকে শেষ করতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রভুর ঘুম ভাঙার সময় আগত। এই সময় তাঁর মুখের সামনে খাবার সাজিয়ে রাখাই নিয়ম। বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। অযথা রক্তপাতে সময় নষ্ট করতে চাই না। তার চেয়ে বরং সেই মেয়েটিকে নিয়ে আয় যাকে..." কথা শেষ করবার আগেই তুগানের ধনুক হতে একটা বিষ তীর দ্রুতবেগে ছুটে এল বক্তার উদ্দেশ্যে। আর ঠিক তখনই এমন এক কাণ্ড ঘটল যা দেখে প্রবল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল হেমেনের দল।

তীরটি বক্তার থেকে যখন ঠিক হাতদুয়েক দূরে সেই মুহূর্তে লোকটি হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর একটা ভঙ্গী করতেই তীরটি আচমকা গতি পরিবর্তন করে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এক মুহূর্তের বিস্ময় অপেক্ষা, কিন্তু তারপরেই আবার ছুটে এল তীরের দল। আবার লোকটি মশা তাড়ানোর মতো করে হাতটা নাড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব ক-টা তীর মাঝপথে গতি হারিয়ে পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

অবাক বিস্ময়ে এদের ক্ষমতা দেখছে হেমেন সরেন। এতদিন সে এদের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনি শুনেছে শুধু। আজ চোখের সামনে এসব দেখে যেন মুখে কথা যোগাচ্ছে না তার। আচমকা ওদের মধ্যে থেকে টাঙি হাতে ছুটে গেল তুগান, কিন্তু সাথে সাথে সেই লোকটি মুখের সামনে হাত তুলে কী একটা মন্ত্র পড়তেই, তুগান এর শরীর মাটি থেকে হাত পনেরো শূন্যে উড়েই সজোরে আছাড় খেল শক্ত মাটির ওপর। মুখ থেকে ছলকে একদলা রক্ত বেরিয়েই সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল তুগানের নিষ্প্রাণ দেহ।

লোকটি কুটিল এক হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলে উঠল, "পাগলেও

নিজের ভালো বোঝে...”

আর তারপরেই পেছনের দলের উদ্দেশে কী একটা ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক শিঙায় ফুঁ দিতেই পরিবেশটা যেন আচমকা বদলে গেল। মশালের হলুদ আগুনগুলো বদলে গেল লাল আভায়। জায়গাটির উষ্ণতা হু হু করে কমতে লাগল এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে। আর তারপরেই যা ঘটল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

আচমকা মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠল কতগুলো ভয়ংকর বীভৎস শরীর। তাদের সেই ভয়ংকর রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। লম্বা শরীর খানিকটা সামনের দিকে ঝোঁকানো, যার ফলে হাতগুলো হাঁটুর নিচে ঝুলছে। হাতের নখ করাতের ফলার মতো তীক্ষ্ণ, শরীরের বেশিরভাগ জায়গায় মাংস হাড়ের আস্তরণ ছেড়ে খসে পড়েছে। আর মুখগুলো দেখলে তো আপনা থেকেই বুকের রক্ত ভয়ে শুকিয়ে যায়। একতাল মাংসে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি আর ভাঁটার মতো জ্বলন্ত একজোড়া চোখ, কপালের উপরের অংশ যেন উপড়ে নেওয়া তাই মাথার ভিতরের ঘিলু দৃশ্যমান। ঠোঁটের কষ থেকে গড়িয়ে পড়া লালা দেখে মনে হয় সামনে শিকার দেখে এরা অস্থির হয়ে উঠছে।

লোকটি এক অদ্ভুত ভাষায় নির্দেশ দিতেই সেই ভয়ংকর জীবের দলটি একটা প্রবল হুঙ্কার দিয়েই ধেয়ে এল আদিবাসীদের দিকে।

হেমেনের নির্দেশে তার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে আর রক্ষা নেই। কেউ বাঁচাতে পারবে না ওদের। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্য ওরা কেউই তৈরি ছিল না।

দলটি যখন হেমেনদের দল হতে হাত দশেক দূরে, আর প্রায় ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কুটি কুটি করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে যাবে ঠিক এমন সময় কোথাও যেন হাজার হাজার শঙ্খ একসঙ্গে বেজে উঠল, আর সেই সাথে বাতাস ভারী হয়ে উঠল সুমিষ্ট চন্দনের সুবাসে। কী ঘটছে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক চোখ ধাঁধানো তীব্র সাদা আলোর ভয়ংকর বিস্ফোরণ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আলোর তীব্রতা কমলে জহরডুনীর সকলে চোখ মেলে দেখল অন্ধকারের কোল থেকে জেগে ওঠা সেই ভয়ংকর জীবেরা ছাই হয়ে

বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওরা অবাক! শুধু কী ওরা? কল্লকেশীর অনুচরেরাও বিস্ময়ে হতবাক। এ কী মায়া বিস্তার হল এখনই? অপদেবতার অপরাজেয় সৈনিক ধ্বংস হল কী করে?

কল্লকেশীর অনুচরেরা বুঝতে পারছে শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা ভয়ংকর অঘটন ঘটে গিয়েছে ওদের সঙ্গে। কিন্তু কী ঘটেছে, তা আর ভাববার অবকাশ পেল না শয়তান নরপিশাচ প্রধান। সঙ্গে সঙ্গে এক বিষমাখা সুতীক্ষ্ণ তীর তার খুলির এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গাঁথা হয়ে গেল। সকলকে অবাক করে দিয়ে মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল তার প্রাণহীন নিথর দেহটা। তীরটা ছুঁড়েছে হেমেন সরেন। তার সন্দেহ ঠিক প্রমাণিত হল। সেই তীব্র মায়া-আলো শুধু অন্ধকারের জীবেদের ধ্বংস করে দেয়নি, একইসাথে শেষ করে দিয়েছে এই নরপিশাচদের সব অলৌকিক ক্ষমতা।

পূর্বদিকের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। ঠিক যেন অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে আলোর পুনর্জন্ম। সেই পুণ্যমতী নব আলোয় কল্লকেশীর অনুচররা ভয়ার্ত চোখে দেখল, জহরডুনীর যোদ্ধারা ধীর পায়ে খোলা অস্ত্র হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু আগে ওদের চোখে যে ভয় ছিল তা কখন যেন বদলে গেছে প্রতিহিংসা আর অপরিমিত রাগে।

(রাজক্ষত)

"ঠক... ঠক... ঠক..."

অনবরত এই ভোঁতা আওয়াজটা রানি কঙ্কাবতীর কানে এসে লাগছে। একটানা যে হচ্ছে, তা নয়। কিছুটা থেমে থেমে। কিছুটা সময় নিয়ে। যেন কেউ কোন ভারী বস্তুর ওপর কিছু ঠুকে চলছে।

কিন্তু কীসের আওয়াজ এত রাত্রে? গভীর তন্দ্রার মধ্যেও এই বিচ্ছিন্ন আওয়াজ রানির ঘুমের ঘোর কাটিয়ে দিচ্ছে। রাজামশাই কি শুনতে পাচ্ছেন

না আওয়াজটা? তাহলে বন্ধ করছেন না কেন?

কিন্তু না। এই আওয়াজের থামবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। একইরকম ভাবে আওয়াজ হতেই থাকল।

"ঠক... ঠক... ঠক..."। এবার ঘুমের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন রানি কঙ্কাবতী। সত্যি তো? কীসের আওয়াজ হচ্ছে? এরকম শব্দে ঘুম হয় নাকি? বিরক্ত হয়ে গায়ের রেশমের চাদরটা সরিয়ে নিজের বিছানায় উঠে বসলেন রানি কঙ্কাবতী।

কার্তিকের শেষের দিকে এ রাজ্যে বেশ হিম পড়ে। আর পাথুরে জমি হওয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ ও দারুণ। রানি কঙ্কাবতী এই সময় উত্তর আর দক্ষিণদিকের জানালা বন্ধই রখেন। তাঁদের এই নতুন রাজবাড়ি পাথরের উঁচু টিলার ওপর। অট্টালিকার এই কক্ষটি রানি কঙ্কাবতীর বেশ পছন্দের। গোলাকৃতি এই ঘরটির উঁচু ছাদ। উত্তর আর দক্ষিণ জানালার নীচেই খাঁড়া ঢাল। ধলভুমগড় সাম্রাজ্য আয়তনে বিশাল না হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এ তুলনাহীন। এই খাঁড়া টিলার অনেক নীচে দিগন্ত বিস্তীর্ণ জমি। আর তারপরেই শুরু হয়েছে সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ি। পূর্ণিমার আলোয় উত্তরের জানালায় দাঁড়ালে সুবর্ণরেখার জলে চাঁদের প্রতিফলন এখান থেকে দেখা যায়। নদীর অপর প্রান্তে আবার মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পাহাড় আর বনের সারি। সুবর্ণরেখার তীর পর্যন্ত ধলভূমগড় সাম্রাজ্যের পরিসীমা। এই অট্টালিকা যে টিলার ওপর তার কাছাকাছি আর কোনো পাহাড় বা উঁচু টিলা নেই। তবে পশ্চিমদিকে জমি আবার ঢালু হয়ে অনেকগুলি পাহাড়ের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। ওই পাহাড়ের কোলেই দেবী রঙ্কিনীর মন্দির। ভীষণ জাগ্রত।

ঘরটিতে তিনটি প্রদীপের আলো জ্বলছে। তাই ঘরে উষ্ণতার অভাব না হলেও আলোর কিঞ্চিত অভাব আছে। রানী কঙ্কাবতীর ঘুম চোখ হলেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তাঁর শয্যার পাশটা। একী? রাজামশাই কোথায়? উনি তো বিছানায় নেই। কোথায় গেলেন উনি?

হঠাৎ করেই একটা ভয় গ্রাস করল তাঁকে। রানি কঙ্কাবতী গর্ভবতী। অজানা কারণেই আজকাল কেঁপে কেঁপে ওঠে তাঁর বুকের ভেতরটা। রাজামশাই সেটা

ভালো করেই জানেন তারপরেও না বলে কোথায় গেলেন?

এমন সময় আবার সেই আওয়াজটা। "ঠক... ঠক... ঠক..."

চমকে উঠলেন রানি। কান পাতলেন, আবার হল শব্দটা, "ঠক... ঠক... ঠক..."

একটা অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে রানি কঙ্কাবতীর সারা শরীর জুড়ে। কীসের আওয়াজ ওটা?

রানি কঙ্কাবতী ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে এলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো উত্তরের হাওয়া ধাক্কা মারছে জানালায়। কিন্তু না, শব্দটা আসছে ঘরের অন্ধকারময় পশ্চিম দিক থেকে, যেখানে প্রদীপের আলো পৌঁছোতে পারছে না। রানি প্রদীপদানী থেকে একটা প্রদীপ তুলে নিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের পশ্চিমদিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু বেশিটা এগোতে হল না। প্রদীপের আলোটা একটু সামনে মেলে ধরতেই দৃশ্যটা রানির নজরে এল।

দেখলেন রাজা মশাই ওনার দিকে পিঠ করে দেওয়াল এ ক্রমাগত মাথা ঠুকছেন। আর সেই মাথা ঠোকার শব্দই ভেসে আসছে... "ঠক... ঠক... ঠক..."

কিন্তু এ কী? দেওয়ালে এটা কী?

রানি দেখলেন কেউ লাল রঙ দিয়ে সাদা দেওয়ালের ওপর বড় করে এঁকেছে একটা চতুর্ভুজ, তার মাঝে একটা ত্রিভুজ, আর তার মাঝে একটা বৃত্ত। এ আবার কী? কে আঁকল? রাজামশাই? কিন্তু কখন? ঘুমোতে যাওয়ার সময় ও তো ছিল না?

আচ্ছা? এটা কি লাল রঙ? নাকি?...

শিউরে উঠলেন রানি। রাজামশাই তখনও সেই বৃত্তের মাঝে একইরকম ভাবে মাথা ঠুকে চলেছেন, "ঠক... ঠক... ঠক"

রানি কঙ্কাবতীর ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে। তিনি কাঁপতে থাকা হাত বাড়ালেন রাজার দিকে, "রাজামশাই?"

এক মুহূর্ত সময় গেল না। রাজামশাই সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ঘুরলেন। কিন্তু এ কে? প্রদীপের আলোয় এ কাকে দেখছেন রানি? কাকে দেখছেন? রাজার চোখের কোন তারা নেই। পুরোটাই কালো। চোখে মুখে ভয়ানক হিংস্রতা।

আর বুকের কাছের কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

গুলিয়ে উঠল গর্ভবতীর সারা শরীর।

আর্তনাদ করে চিৎকার করে উঠলেন রানি কঙ্কাবতী। পালাতে হবে, পালাতে হবে এ ঘর ছেড়ে। কঙ্কাবতী মাটির প্রদীপ ফেলে ছুটে দ্বারের আগল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দ্বাররক্ষীরা ছুটে এল।

"মহর্ষিকে ডাকো কেউ। মহর্ষি কে ডাকো।" চিৎকার করে উঠলেন কঙ্কাবতী।

রাজার চোখে মুখে শয়তানের ছায়া। নিজের বুকের রক্ত দিয়ে যে দেওয়ালে ছবি আঁকতে পারে সে মানুষ নয়। কখনোই নয়।

রাজমাতা, মহামন্ত্রী ছুটে এলেন। "কী হয়েছে মহারানি, আপনি এরকম করছেন কেন?"

"রাজামশাই, রাজামশাই..." নিজের ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

এক মুহূর্ত দেরি না করে মহামন্ত্রী তখন দ্বাররক্ষী আর মশাল নিয়ে কক্ষে ঢুকে পড়েছেন। কিন্তু এ কী? ঘরে তো কেউ নেই? রাজা মশাই কোথায় গেলেন? আর ঠিক এমন সময় উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে একটা কনকনে বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের সব কটা প্রদীপ একসঙ্গে নিবিয়ে দিল। মহামন্ত্রী তখনও ভাবছেন, এ জানালা খোলা কেন? এ জানালা তো বন্ধ থাকার কথা। তবে কি...?

* * * * * * * *

অমাবস্যার অন্ধকার। ভয়ংকর পাহাড়ি ঘন বন। এমন এক রাতের অন্ধকারে মহর্ষি শম্ভুপাদ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছেন পাকদণ্ডীর একটার পর একটা পাথরে পা রেখে। তাঁর এক হাতে মশাল, অন্যহাতে সিঁদুর মাখানো খড়গ। তাকে এই পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নেমে যেতে হবে। অনেকটা পথ।

একেবারে এই পাহাড়ের পাদদেশে। যেখানে পাহাড়ের বড় বড় পাথরগুলো ভাঙতে ভাঙতে সুবর্ণরেখা নদীতে গিয়ে মিশেছে। এক একটা পাথরে পা রাখছেন আর পাকদণ্ডীর দুদিকের ঘন বন থেকে ক্ষুধার্ত বন্য পশুদের গর্জন ভেসে আসছে। আর ভেসে আসছে কাদের যেন পায়ে হেঁটে চলার অশরীরী শব্দও। কিন্তু মহর্ষির লক্ষ স্থির। তিনি জানেন এই অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে সুবর্ণরেখার তীরে পৌঁছোতেই হবে। নইলে এসব ক্ষুধার্ত চিৎকার ছাপিয়ে যে মেয়েলি কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এসে বিঁধছে তা কিছুতেই থামবে না। হ্যাঁ, একটা মেয়েলি কান্না। গুঙিয়ে গুঙিয়ে কেঁদে চলছে। একটানা। করুণ, কিন্তু তীক্ষ্ণ সেই স্বর।

মহর্ষি অতিদ্রুত পা চালাচ্ছেন। যত নীচে নামছেন সব কিছু ছাপিয়ে সেই কান্নার শব্দও বেড়ে চলছে। যেন প্রবল যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে কেউ। কিন্তু কে কাঁদছে? কেনই বা কাঁদছে ?

হঠাৎ শম্ভুপাদ দেখলেন পাকদণ্ডী শেষ আর তিনি মশাল হাতে এক প্রশস্ত নদী তীরে দাঁড়িয়ে। মশালের আলোয় বেশিদূর চোখ চলে না। কিন্তু পায়ের তলার বড় বড় পাথর। এ পাথর তো নগরের দিকের তীরেই পাওয়া যায়। তাহলে কি তিনি নগরের দিকের তীরেই দাঁড়িয়ে? কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে যায়গাটা চিনতে পারছেন না কেন? এ কোথায় এসে পৌঁছলেন তিনি?

পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। অন্ধকার বনানী উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁয়ে আছে। তার মানে তিনি পাহাড়ের পাদদেশে।

এখানে আর হিংস্র পশুদের ডাক শোনা যাচ্ছে না। কী অদ্ভুত ভাবে থেমে গিয়েছে সব ডাক। শব্দও বলতে পাথরে ধাক্কা লেগে জলের ছলাৎ ছলাৎ স্রোতের শব্দ আর সেই নিরবিচ্ছিন্ন ঝিঁঝির ডাক। আচ্ছা! এ কি ওনার মনের ভুল? নাকি সত্যি কেউ বিপদে পড়েছে? সারা শরীর কুলকুল করে ঘামছে। একটু চোখে মুখে ঠান্ডা জল দিতে পারলে আরাম লাগত। মহর্ষি খড়গটিকে কটিবন্ধনীতে গুঁজে রেখে এক হাতে মশাল উঁচিয়ে এগিয়ে চললেন। সাবধানে এগোতে হবে। নদীর তীরের পাথর জল লেগে শ্যাওলাতে পরিপূর্ণ। কোনোভাবে পা হড়কে গেলে আঘাত পেতে সময় লাগবে না।

মহর্ষি সাবধানে নদীর তীরের একটি পাথরে বসে এক আঁজলা জল তুলে ঘাড়ে চোখে মুখে ভাল করে দিলেন। কী শান্তি! দীর্ঘ পথ চলায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে এসেছিল। আরও এক আঁজলা জল তুলে কুলকুচি করলেন। আহ, কী ঠান্ডা! কিন্তু এ কী? মুখের ভিতরটা এত নোনতা আর বিস্বাদ লাগছে কেন? সুবর্ণরেখার জল তো অতি সুস্বাদু। মহর্ষি মুখের জল নদীতে ফেলেই মশালের আলো জলের কাছে নিয়ে এলেন। আর তারপরই যা দেখলেন, এক অজানা ভয়ের চোরা স্রোত তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে নীচে নেমে গেল। ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। একী দেখলেন তিনি? সুবর্ণরেখার স্ফটিক স্বচ্ছ জলে কেউ যেন রক্ত গুলে দিচ্ছে। আর সেই রক্ত জলের স্রোতে মিশে সরু ধারায় বয়ে চলছে। আর ঠিক এমন সময় আবার হঠাৎ করে সেই মেয়েলি কান্নার শব্দ। একেবারে কাছে। এই নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে আচমকা এই কান্নার আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন শম্ভুপাদ।

আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলবে না। নিশ্চয়ই কেউ বিপদে পড়েছে।

মশালের আলো উঁচিয়ে মহর্ষি তাড়াতাড়ি সেই দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন। এবড়ো-খেবড়ো পাথর, নইলে ছুট লাগাতেন।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। মশালের আলোয় নদীর তীরের প্রশস্ত পাথরের উপর একটা অবয়ব দেখতে পেলেন। কেউ যেন পাথরের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে আছে। মহর্ষি এগিয়ে গেলেন মশাল তুলে। একটা মেয়ে! পরনে লাল শাড়ি। লাল বলেই তো মনে হচ্ছে। পিঠ ছাপিয়ে খোলা চুল জলে ভিজে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওই কি কেঁদে চলছে? কিন্তু কেন? কোনও বিপদ হয়েছে মেয়েটির? নাকি ঘন রাতে পথ হারিয়ে ফেলেছে? মহর্ষি মেয়েটির একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র কান্নার শব্দই পাচ্ছেন না একইসঙ্গে পাথরে কিছু ঘষার শব্দও হচ্ছে, মেয়েটার হাতও নড়ছে। মেয়েটা কী করছে? পেছন থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সেটা দেখতে গেলে জলে নামতে হবে। মহর্ষি ধীরে ধীরে জলে পা দিলেন। উফ! কী ঠান্ডা এই জল! পেছন দিক থেকে শম্ভুপাদ ধীরে ধীরে সামনের দিকে আসছেন। হ্যাঁ! মেয়েটি যেই পাথরের ওপরে বসে আছে সেটাতে কিছু ঘষে...

শম্ভুপাদ মশালের আগুনের আলোয় যা দেখলেন, তাতে তার চোখ জোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

এ কী? এ যে... এ যে মা রঙ্কিনীর সোনার জিব! মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে পাথরের ওপর ঘষে চলেছে মা রঙ্কিনীর সোনার জিব। মা রঙ্কিনীর সোনার জিব এ পেল কোত্থেকে? কিন্তু না, ভয় আর চমকের তখনও বাকি ছিল। মেয়েটি পাথরের ঠিক যে স্থানে সোনার জিব ঘষছে সেখান থেকে কোনো সোনার গুঁড়ো বেরোচ্ছে না। তার বদলে সেই সোনার জিব থেকে কুলকুল করে রক্ত বেরিয়ে নদীর স্রোতে মিশে যাচ্ছে। লাল হয়ে উঠছে সুবর্ণরেখার জল। মহর্ষি মাথা ঝোঁকালেন। কে এই মেয়েটি? মুখ দেখতেই হবে।

ওদিকে হঠাৎ করেই মেয়েটির হাতের কাজ থেমে গেল। মেয়েটি আর সেই সোনার জিবটি পাথরে ঘষছে না। আর ঠিক তখনই, হ্যাঁ, একদম সেই মুহূর্তেই মেয়েটি ফট করে মুখ তুলল।

ভয়ে, বীভৎসতায় আঁতকে উঠলেন মহর্ষি। মেয়েটির নীচের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, আর... আর মেয়েটির মুখের ভেতরে জিবটা কে যেন টেনে উপড়ে ফেলেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা মুখ, চুল, শাড়ি। বীভৎস সেই দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠতেই হঠাৎ করে পা পিছলে নদীর জলে পড়ে গেলেন শম্ভুপাদ। আর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেলেন সুবর্ণরেখার রক্তমেশা গভীর জলে।

আর ঠিক তখনই, ধড়ফড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসলেন মহর্ষি। ওহ! তাহলে স্বপ্ন দেখছিলেন? কিন্তু আবার এই এক স্বপ্ন কেন দেখলেন তিনি? কয়েকদিন ধরে বারবার এই এক স্বপ্নই দেখে চলেছেন তিনি। চিন্তার মেঘ মনের আকাশে ঘনীভূত হচ্ছে। অবশ্য বেশি সময় পেলেন না ভাববার, ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কার শব্দ পেলেন।

“ঠক... ঠক... ঠক...”

কাঠের দরজার ভোঁতা আওয়াজ ঘরের ভারী বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

কেউ দরজা ধাক্কা দিচ্ছে! এত রাতে? এত রাতে কে এসেছে?

(বিশ্বস্ত দ্রোহী)

জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে একটা বড় গুহা।

গুহার ছাদ অনেক উঁচুতে। গুহা অন্ধকার নয়। গুহার ভেতরে পাথরের খাঁজে খাঁজে মশাল জ্বলছে। আর মশালের আলোয় গুহার ভেতরটা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত আলোকিত। গুহার মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত পাথরের ইঁদারা। আর সেই ইঁদারা ঘিরে কিছু মানুষের ভিড়। এই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছে পাঁচজন ভিল আর আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। পেটানো চেহারা, কালো কষ্টি পাথরে যেন কুঁদে গড়া দেহ তাদের। কিন্তু চোখে মুখে তাদের ভয় এর ছাপ। আর বাকী যারা আছে, তারা সংখ্যায় সাতজন। ফর্সা, লম্বা, ন্যাড়া মাথা, সাদা সুতির কাপড় সারা শরীরে আলগোছে প্যাঁচানো। তারা ইঁদারার পাশে জড়ো হয়ে কিছু নিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে।

এমন সময় হঠাৎ করে কোথাও দূরে যেন এব খানি শিঙা বেজে উঠল। আর সেটা শুনেই সেই সাদা কাপড় পড়া লো র মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। আর যারা এক কোণে জবুথবু হয়ে ছিল তাদের চোখে মুখে এক অবর্ণনীয় ভয়ের ভাব ফুটে উঠল। কীসের জন্য বেজে উঠল সেই শিঙা? ও কি কোনো সাংকেতিক বাদ্য?

হঠাৎ করেই গুহার দ্বারে আরেকজন মুণ্ডিতমস্তক লোকের অবয়ব ফুটে উঠল। এই লোকটির পরনের পোশাক সেই সাদা কাপড়। কিন্তু বাকিদের থেকে এর চরিত্রের দৃঢ়তা আর মুখের ক্রূরতা দেহ ভঙ্গিমাতেই ফুটে উঠছে। চোখ দুটো যেন শিকারি হায়নার মতো জ্বলজ্বল করছে। লোকটি গুহার দ্বারে পৌঁছোতেই সকলে মাটিতে মাথা ঠুকিয়ে প্রণাম জানাল। বোঝাই যায়, এই লোকটি এই দলের অধিপতি গোছের। কিন্তু লোকটি তো একলা নয়।

লোকটির পিছনে আরেকটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তার নগ্ন শরীরে চাপ চাপ রক্ত। মনে হবে যেন রক্তনদীতে স্নান সেরে উঠে এসেছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে আর শূন্য। লোকটি দুই হাতে কিছু ধরে আছে। যা-ই ধরে থাক,

সেটা একটি ভেজা লাল কাপড়ে মোড়া। আর সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে গুহার দ্বার ভিজিয়ে দিচ্ছে। কী আছে ওই কাপড়ে মোড়া? লোকটি হাতে করে কী এনেছে?

লোকটির বুকে একটা ক্ষত। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে ওটা সাধারণ ক্ষত নয়। একটা চিহ্ন। কেউ ছুরি দিয়ে বুকের ওপর একটা চতুর্ভুজ, তার মাঝে একটা ত্রিভুজ, আর তার মাঝে একটা বৃত্ত এঁকেছে। সেই ক্ষত থেকেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ইনিই রাজা জগন্নাথদেব।

ওদেরকে দেখেই দলের মধ্যে থেকে একটা লোক সরে এসে আদিবাসী লোকগুলোর সামনে দাঁড়াল। তারপর হিসহিসে গলায় অবোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলতেই সেই লোকগুলি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। বোঝা যাচ্ছে, ওরা ভীষণ ভয় পেয়েছে।

ধীরে ধীরে এক কোণে রাখা মাদলগুলো গলায় ঝুলিয়ে নিল সকলে। আর তারপরেই একসাথে আকাশ বাতাস কেঁপে বেজে উঠল মাদলের অপার্থিব বোল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

এক নাগাড়ে বেজে চলছে মাদলের বোল। এক আবেশময় ধ্বনিতে। মাদলের বোল উঠতেই সেই সাত জন লোক ইঁদারাকে ঘিরে একটা নকশা গঠন করে বসল। প্রথম চারজন এমনভাবে বসল, যেন চতুর্ভুজের চার কোণে। তারপরের তিনজন বসল এমনভাবে, যেন ত্রিভুজের তিন কোণে বসেছে। ওরা নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়তেই শুরু হল অবোধ্য ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ। মাদলের বোলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওরা দুলে দুলে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলছে। একটানা। ওদিকে এক নাগাড়ে বেজে চলছে মাদলের বোল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"
"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

দেখতেই দেখতে মশালের আলোগুলো কমতে লাগল মাদলের বোলের সঙ্গে। কমতে কমতে একেবারে ধিকি ধিকি করে যখন জ্বলতে লাগল মশালের আলোগুলো তখন সারা গুহা জুড়ে এক ভয়ংকর অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

পরে আসা মুণ্ডিত মস্তক লোকটির মুখে একটা নারকীয় হাসি খেলে উঠেছে। নির্বিকার রাজার দৃষ্টি তখন ও ঘোলাটে। যেন কিছু দেখতে পারছেন না। বুঝতে পারছে না।

কিন্তু এমন সময় আবার শিঙা বেজে উঠল গুহার বাইরে। আবার কেন?

চমকে উঠল সেই লোকটি। একমাত্র এই লোকটিই হুঁশে আছে, নইলে না রাজা, না যারা মন্ত্রপাঠ করছে আর না যারা মাদল বাজাচ্ছে কেউ আপন হুঁশে নেই। সকলেই এক অলৌকিক ঘোরে চলে গিয়েছে।

শিঙার শব্দও হঠাৎ করে যেমন বেজে উঠেছিল, তেমন হঠাৎ করেই থেমে গেল। কিন্তু চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল এই ন্যাড়া লোকটির। সে দেওয়াল থেকে একটা প্রায় নিবু নিবু মশাল খুলে এনে রাজা জগন্নাথ দেবের সামনে দাঁড়াল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে হিসহিস করে কী একটা বলতেই জগন্নাথ দেব হাতে ধরা জিনিসটার ভেজা কাপড় ধীরে ধীরে খুলতে লাগলেন। খুলছে, খুলছে, খুলছে। যত খুলতে লাগল কাপড় ততই বেশি করে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল সেই জিনিসটা থেকে। আর তারপর একসময় খুলে যেতেই ন্যাড়া মাথার লোকটি সেই কাপড়খানা ছিনিয়ে নিল রাজামশাইয়ের কাছ থেকে।

তারপর ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা মশালের আলোয় জিনিসটা দেখে চকচক করে উঠল সেই অধিপতির চোখজোড়া। চকচকে, শাণিত জিনিসটা যেটা রাজার হাতের ধরা ছিল সেটা আর কিছুই নয় মা রঙ্কিনীর স্বর্ণজিহ্বা। যেটা থেকে তখনও ঝরে পড়ছিল টাটকা রক্ত।

* * * * * * * *

জঙ্গলের মধ্যে নিঃশব্দে তখন পাকদণ্ডী বেয়ে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে

এগিয়ে চলছে একটা দল। অন্ধকারে ঠিক যেন শিকারি ধূর্ত শেয়ালের দল। এদের না দরকার পড়ে কোনো মশালের আলোর না দরকার পরে কোনো পথবাতির। হঠাৎ দলের পুরোভাগে যিনি তিনি হাত উঁচিয়ে পেছনের সকলকে থামবার নির্দেশ দিলেন। আর নীচে যাওয়া চলবে না। এবার পাকদণ্ডী ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগোতে হবে। আর ঠিক এমন সময়ই রাত্রির নীরবতা ছিন্ন করে দূরে কোথাও মাদলের বোল বেজে উঠল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

"গুরুদেব, শুনতে পাচ্ছেন?" মহামন্ত্রীর উদ্বেগ মেশানো কণ্ঠ।

শম্ভুপাদ মাথা নাড়ালেন অন্ধকারে। হ্যাঁ, তিনি শুনতে পাচ্ছেন। না আর দেরী করা চলবে না। এ মাদলের বোল এ যুগের নয়। মনে হয় বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসছে। আর তিনি যা ভাবছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে রাঢ়ভূমির সর্বনাশ আটকানোর সাধ্যি কারো নেই।

শম্ভুপাদ মাটির ওপর বসে পড়লেন।

তিনি জানেন খুঁজলে এখানে মাটির ওপর কোনো না কোনো রক্তের ফোঁটা পাওয়া যাবেই যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। জগন্নাথদেব এ কী করলেন? নিজের হাতে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা উপড়ে নিলেন। রাজপরিবার দেবীর আশীর্বাদ ধন্য। রাজরক্ত ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয় এ কাজ। তবে দেওয়ালের রক্তচিত্র, রানি কঙ্কাবতীর বর্ণনা সবকিছু প্রমাণ করছে রাজা জগন্নাথ দেব বশীভূত হয়েছেন অপশক্তি দ্বারা। অবশ্য তাঁর নিজেরও দোষ কম নয়। প্রতি রাতের এই স্বপ্ন দেখে তাঁর আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। তিনি যদি আগে থেকে অপশক্তি প্রতিহত কিছু উপাচার করতেন তাহলে রাজা মশাইকে বশ করে এই কাজ করানো সম্ভব হত না। এখন আর এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। শুধু জানতে হবে এ কোন অপশক্তি। যার রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বার প্রতি ক্ষোভ। যদিও তিনি সন্দেহ যে কাউকে করছেন না তা একেবারেই নয়। কিন্তু সেটাও কীভাবে সম্ভব? তারা তো বহুকাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে রাঢ়ভূমি হতে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে পাথুরে জমির ওপর হাত বোলালেন শম্ভুপাদ। কী একটা পেতেই জিনিসটা দু-আঙুলে ঘসে নাকের সামনে ধরে আঘ্রাণ নিলেন। হ্যাঁ! তিনি যা ভেবেছিলেন তা ঠিক। মা রঙ্কিনীর জিহ্বার রক্ত এখান থেকে পাকদণ্ডী বরাবর নীচে না নেমে বাম দিকের জঙ্গলে ঢুকে এগিয়েছে।

— "এদিকে এসো, ওরা বনের মধ্যে ঢুকেছে।"

তারপর সকলে পাকদণ্ডী ছেড়ে বাম দিকের বনের মধ্যে ঢুকে গেল। শম্ভুপাদ ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছেন। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার কালো মেঘের ঘনঘটা ধীরে ধীরে জমাট বাঁধছে।

বেশ অনেকক্ষণ চলার পর যখন মাদলের বোল তীব্র হয়ে উঠল ঠিক তখনই ওরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছোল। পাদদেশে একটা বড় গুহার মুখ। সেখান থেকে আগুনে হলুদ আলো বাইরে এসে পড়ছে। হ্যাঁ! ওখান থেকেই মাদলের সেই ভয়ংকর বোল ভেসে আসছে।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

গুহার মধ্যে কিছু মানুষের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে বাইরে থেকে। কারা আছে ওখানে? শম্ভুপাদের ভুরু জোড়া কুঁচকে রইল।

— "এবার আমরা কী করব গুরুদেব?"

— "সকলে তৈরি হও।" শম্ভুপাদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল আষাঢ়ের মেঘের মতো। "দেবী রঙ্কিনীর জিহ্বা হরণ আর সেবাইতদের হত্যা রাজামশায় এর হাতে হলেও আসল কলকাঠি কিন্তু এদের হাতেই। এরাই রাজাকে বশীভূত করে এই গর্হিত অপরাধ করিয়েছে। এরা মায়াবী, নৃশংস আর তন্ত্রে সিদ্ধ হতে পারে। তবে আমাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও মা রঙ্কিনীর আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের সঙ্গে।"

কথাটা বলেই কোমর বন্ধনী হতে শম্ভুপাদ বের করে আনলেন সিঁদুর মাখানো একটা খড়্গ। এটা আর কারও নয় মা রঙ্কিনীর খড়্গ। এরপর যা আছে ভাগ্যে দেখা যাবে। শম্ভুপাদ বাকীদের নির্দেশ দিলেন তাকে অনুসরণ করতে কিন্তু ওরা এগোতেই হঠাৎ করে একটি গাছের মগডাল হতে একটা

শিঙা বেজে উঠল।

চমকে উঠলেন শম্ভুপাদ। চমকে উঠলেন বাকি সকলে। সর্বনাশ! উনি একদম খেয়াল করেননি, এই শয়তানেরা কাউকে না কাউকে ঠিক পাহারায় রাখবেই। চকিতে মহামন্ত্রী শব্দ লক্ষ করে তীর ছুঁড়লেন। আর ভগ্নাংশের কম সময়ে ওপর থেকে একটা ভারী দেহ ধপ করে ডালপালা ভেঙে নীচে পড়ল।

ইশ! তিনি এতো বড় ভুল আবার করলেন? এতক্ষণে আর কিছুই করার নেই। যারা সতর্ক হওয়ার তারা সতর্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রবল কৌতূহল হচ্ছে মহর্ষির। কারা আছে এসবের নেপথ্যে। তিনি সৈনিকের হাত থেকে মশাল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই পতিত দেহের কাছে। কিন্তু না, তিনি যেতে পারলেন না, কে যেন তাঁর পা জোড়া মাটিতে টেনে গেঁথে দিয়েছে, এ কাকে দেখছেন তিনি? মুণ্ডিত মস্তক, শ্বেত কাপড় পরিহিত এক দেহ, যা সন্দেহ করেছিলেন তা-ই, "এ যে বিকশবাহু!"

শম্ভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছেন সময় চক্রে, সেই সময় যখন সমগ্র রাঢ়ভূমি জুড়ে বিকশবাহুদের তাণ্ডব চলত। এরা অগ্নিদেবের শাপিত পুত্র কল্লকেশীর উপাসক। তন্ত্র শক্তিতে অবধ্য, নির্মম, ক্রুর, শয়তান। এরা গ্রামের পর গ্রাম নিজের অধীনে রেখেছিল। লোকেরা এদের শক্তি কে ভয় পেত। এমনকি রাজ্যের সম্রাটরাও এদের পদানত ছিলেন। কোনো শুভশক্তির আরাধনা হত না। একজনই উপাসক ছিল সেই সময় তা হল কল্লকেশী। তার শক্তিতে বলীয়ান এই সব পাপী তান্ত্রিকদের অত্যাচারে যখন নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় এক আশ্চর্যের কাণ্ড ঘটে, যা রাঢ়ভূমির ইতিহাস বদলে দেয়।

একদিন বর্ষাকালে ধলভূমগড়ের রাজা আচিন্ত্যদেব শিকারের আশায় এই পাহাড়গুলিতে ভ্রমণকালে প্রবল বৃষ্টির কবলে পড়েন। সেখান থেকে বাঁচতে তিনি বাধ্য হয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। আর সেই গুহায় তিনি সন্ধান পান একটি বৃহৎ কালো পাথরের। সেই পাথরের গা থেকে এক উজ্জ্বল আলো বের হচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারেন ওই পাথর কোন সাধারণ পাথর নন। আচমকাই তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে। কোনোরকমে সেই গুহা থেকে

বেরিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসেন। আর এসেই ধুমজ্বরে আক্রান্ত হন। তিন দিন হয়ে যায় কিন্তু কোনও পথ্যে রাজার জ্বর ছাড়ে না। সকলে যখন সবথেকে খারাপটা ভেবেই নেন, ঠিক সেই সময় রাজা জ্বরের ঘোরে এক স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নে এক কিশোরী মেয়ে তাকে জানায়, কীভাবে কল্লকেশীর প্রকোপ থেকে রাঢ়ভূমিকে রক্ষা করা যাবে। রাজা আর দেরি না করে সেই মতো কাজ করলেন। সকলের অগোচরে রাজা উঠে স্বচ্ছরেখা নদীতে গিয়ে ডুব দিলেন। তিনবারের ডুবে তিনি নদীর গর্ভ থেকে তুলে আনলেন এক বৃহৎ সোনার টুকরো। তারপর তা নদীর ধারে একটি পাথরে ঘষতে লাগলেন। ঘষতে ঘষতে সেটি একটি শাণিত জিবের আকারে আসলে রাজা দেখলেন ততক্ষণে পূর্বদিক একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। সেই আবছা অন্ধকারে রাজা টের পেলেন স্বচ্ছরেখা নদীর জলে সোনার গুঁড়ো মিশে অপূর্ব সুবর্ণ রং ধারণ করেছে। রাজা ঠিক করলেন তিনি আজ সফল হলে এই নদীর নাম স্বচ্ছরেখা বদলে সুবর্ণরেখা করবেন।

তারপর সেই আধো অন্ধকারেই রাজা পাকদণ্ডী বেয়ে সেই গুহার উদ্দেশে রওনা হলেন। দৈব আদেশ মেনে তিনি গুহায় পৌঁছে সেই সোনার জিহ্বাটিকে সেই কালোপাথরে ঠেকাতেই সেটি পাথরের গায়ে অদ্ভুতভাবে আটকে গেল। তারপর রাজা নিজের হাতের তালু ধারালো পাথরে কেটে সেই পাথরে মাখিয়ে দিতেই এক তীব্র আলোর বিস্ফোরণ হল সেই গুহা জুড়ে। তারপর আলোর তীব্রতা কমলে রাজা দেখলেন সেই কালপাথর থেকে অদ্ভূত জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। রাজা অচিন্ত্যদেব নতজানু হয়ে সেই বিগ্রহকে প্রণাম করে নগরের উদ্দ্যেশে রওনা দিলেন। তিনি জানেন দৈব আদেশ অনুযায়ী কল্লকেশী ঘুমিয়ে পড়েছে কালের গর্ভে। আর কোনও ভয় নেই। বিকশবাহুরা শক্তিহীন এখন।

সত্যি তা-ই হল। কল্লকেশীর সব মূর্তি, উপাচার সামগ্রী সুবর্ণরেখার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। আর গুনে গুনে বিকশবাহুদের হত্যা করা হল। তারপর থেকেই রাঢ়ভূমিতে শান্তি ফিরে এল।

অন্তত এতদিন তাই ছিল। কিন্তু দেবী রঙ্কিনীর মূর্তি থেকে জিব উপড়ে

পাওয়া, বারবার সেই ভয়ংকর স্বপ্নের দেখা আর এখন বিকশবাহুদের একজনকে এখানে দেখে শম্ভুপাদ বুঝতে পারলেন, সেই সময় সকলে মারা যায়নি। সকলকে মারা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারলেন না, রাজা জগন্নাথদেবকে বশ করবার জন্য কাউকে না কাউকে তো রাজার কাছেই থাকতে হবে। কিন্তু কই? এই বেশে তো কেউ আসেনি কখন রাজার কাছে, থাকলে তো তিনি দেখতে পারতেন, বুঝতে পারতেন...

আর তারপরেই কী একটা মাথায় আসতেই চমকে উঠলেন শম্ভুপাদ। যদি ছদ্মবেশ ধারণ করে কেউ? মাথায় পাগড়ি বেঁধে যদি থাকে কেউ... তাহলে তো বোঝা যাবে না লোকটির মাথায় কেশ আছে নাকি সে ন্যাড়া। সর্বনাশ!

*   *   *   *   *   *   *   *

আদিবাসী লোকেরা ভয়ে ভয়ে মাদলগুলো খুলে পায়ের কাছে রেখে দিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওরা বাজানো বন্ধ করে দেওয়ার পর ও সেই মাদলের থেকে বেজে উঠছে সেই বোল।

“দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।”
“দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।”

আপনা থেকেই। নিজে নিজে।

প্রধান বিকশবাহু রাজার কাছ থেকে সরে এসে সেই আদিবাসী লোকগুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর প্রত্যেকের ঘাড় ধরে নুইয়ে সেই রক্ত ভেজা কাপড় প্রত্যেকের মুখের ওপর বুলিয়ে দিলেন।

এই কাজটা কয়েক লহমার মধ্যে হয়ে গেলে, প্রধান বিকশবাহু সাপের মতো হিস হিস করতে করতে বলে উঠল, “যাহ তোরা গুহার পেছনের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যা। যত তাড়াতাড়ি পারিস পালিয়ে যা। কিন্তু একটা

কথা মাথায় রাখিস, তোদের মুক্তি নেই। রঙ্কিনীর রক্ত তোদের মুখে লেগেছে। তোরা মরবি না সহজে। আজকের এই পুণ্য তিথিতে যদি কোনও কারণে আমরা ব্যর্থ হই তাহলেও তোরা বেঁচে থাকবি পরের বার পর্যন্ত। কল্লকেশীকে জাগালে তবেই তোদের মৃত্যু হয়ে মুক্তি ঘটবে। যা! বেরো!"

ওরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে পালাল পড়ি-মরি করে। বেচারারা বুঝতে পারল না কী ভয়ংকর এক অভিশাপ ওদের কপালে আঁকা হয়ে রইল আজকের তিথিতে।

এদিকে প্রধান বিকশবাহু হঠাৎ রাজা জগন্নাথদেবকে হাত ধরে টানতে টানতে ইঁদারার দিকে নিয়ে গেল। মাদলের বোল আপনা আপনি বেজে চলছে গুহার অভ্যন্তরে। বাকি বিকশবাহুরা জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করতে করতে শরীর দোলাচ্ছে। আধো-অন্ধকার এই গুহার মধ্যে আধিভৌতিক এক আবহ তৈরি হচ্ছে। মনে হচ্ছে নরকের দরজা খুলে ছায়াময় প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা গুহা জুড়ে।

প্রধান বিকশবাহু জগন্নাথদেবকে ইঁদারার প্রাচীরে টেনে তুলে দাঁড় করালো। ইঁদারার মধ্যে কী আছে? কিছু একটা আছে, একটা চাপা গর্জন বেরোচ্ছে। কে আছে ওই ইঁদারার নীচে?

ততক্ষণে প্রধান বিকশবাহু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া শুরু করে দিয়েছে। চোখ উলটে মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ছে তার মন্ত্রের প্রকোপ। জগন্নাথ দেব দু-হাতে ধরে রেখেছেন মা রঙ্কিনীর সোনার জিহ্বা। আর সেই জিহ্বা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত ঝরে রাজামশায় এর শরীর আরও ভিজিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ করে মন্ত্র পড়া থামিয়ে বিকশবাহু হাতের নিবু নিবু মশালটা ইঁদারার মধ্যে ফেলতেই এক তীব্র নীল আভা ইঁদারার নীচ থেকে উঠে গুহার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আর চতুর্দিক নীল আলোয় ভরে উঠতেই প্রধান বিকশবাহু চিৎকার করে উঠল, "হে, মহান কল্লকেশী, জেগে উঠুন আপনার শতবর্ষের নিদ্রা ত্যাগ করে, যে রক্তের অভিষেকে রঙ্কিনীর অপূর্ণ মূর্তিতে জিহ্বা স্থাপিত হয়েছিল, সেই রক্তই আজ নিজের হাতে রঙ্কিনীর জিহ্বা টেনে উপড়ে এনেছে। আপনার

পুনরায় জেগে ওঠার সময় হয়ে গিয়েছে প্রভু। শত্রুর তিন ফোঁটা রক্ত আর সেই জিহ্বা আপনার পায়ে উৎসর্গ করলেই সব প্রতিবন্ধকতা কেটে যাবে। আপনি আবার স্বমহিমায় ফিরে আসবেন।”

কথাটা বলতে বলতেই কোমর বন্ধনী থেকে একটা ছুরি বের করে আনল বিকশবাহু। রাজার বাম হাতটা টেনে ধারালো ছুরি দিয়ে ফালা করে কেটে ইঁদারার সামনে মেলে ধরল সেই পিশাচ তান্ত্রিক। রাজার মুখ ভাবলেশহীন। তিনি তখনও জানেন না কত বড় প্রলয় আসতে চলছে।

রাজার হাতের কাটা জায়গাটা থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়তেই নীল থেকে সবুজ হয়ে গেল সে ইঁদারার ভেতরের আলোর আভা। একটা শোঁ শোঁ শব্দে গরম হাওয়া জেগে উঠছে গুহার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ফোঁটা। এবার সবুজ রঙ পালটে লাল রঙের আলোয় চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে। ইঁদারার ভেতর থেকে গর্জনের শব্দ প্রবল ভাবে গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আর এক ফোঁটা রক্ত, আর তারপরেই জেগে উঠবে কল্লকেশী। উঠেই সে আগে দীর্ঘদিনের ক্ষুধা নিবারণ করবে অগণিত নরবলি নিয়ে। তারপর প্রতিশোধস্পৃহায় ধ্বংস করে দেবে সারা রাঢ়ভূমি।

ওই পড়ছে, শেষ ফোঁটা রক্ত, তারপরেই সব শেষ। সব শেষ।

কিন্তু আচমকা গুহার দ্বারে একটা বজ্রনিনাদ।

“জয় মা রঙ্কিনী!!”

চমকে উঠে দেখবার অবসরটুকু পেল না বিকশবাহু, শম্ভুপাদ সজোরে মায়ের খাঁড়া দিয়ে মাটিতে এক কোপ বসালেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর ভাবে কেঁপে উঠল সেখানকার মাটি। যেন প্রবল ভূমিকম্প হল।

আর সেই কম্পনে কেবল রাজা আর প্রধান বিকশবাহু দু-জনেই নয় যারা বসে মন্ত্রপাঠ করছিল তারাও নিজেদের জায়গা থেকে ছিটকে পড়ল। স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে অশুদ্ধ হল উপাচার।

বিকশবাহুরা পালাতে যাবে তার আগেই সৈনিকেরা ঘিরে ধরল সকলকে।

প্রধান বিকশবাহুর মাথায় আঘাত লেগেছে, কিন্তু সে আঘাত ভুলে উঠে দাঁড়ানোর আগেই একটা শাণিত খড়গ তার গলায় চেপে বসল।

শম্ভুপাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "লেগেছে বুঝি? আমি নিশ্চিত মাথায় পাগড়িটা পরে থাকলে এতোটা বোধহয় লাগতো না সেনাপতি মশাই।"

* * * * * * * *

— "আপনি কী করে বুঝলেন যে এসবের পিছনে সেনাপতি বিমল রয়েছেন?"

রাজা জগন্নাথ দেব নিজের বিছানায় শুয়ে। অসুস্থ। ক্লান্ত। বুকের ক্ষতে ওষুধের প্রলেপ লাগানো।

একপাশে মহামন্ত্রী সহ অন্য সভাসদেরা দাঁড়িয়ে। অপর প্রান্তে রাজমাতা আর মহর্ষি শম্ভুপাদ দণ্ডায়মান। ঘরের মধ্যে অনবরত দাস-দাসীদের যাওয়া আসা।

— "আগে থেকে বুঝিনি, তবে আন্দাজ করেছিলাম আপনি সকালে নগর পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন, আর আপনার সঙ্গে ছিলেন কেবল সেনাপতি বিমল। এই অট্টালিকায় এমন কিছু করা সম্ভব নয় কারণ কুলদেবী স্বয়ং মা সিংহবাহিনী। যিনি আবার মা রঙ্কিনীর আরেক রূপ। আপনাকে বশ করতে হলে এই প্রাসাদের বাইরে যেতেই হত।"

— "হ্যাঁ! পথের মাঝে আমায় এক বুড়ি কিছু খেতে দিয়েছিল বটে... সেখানেই হয়তো।" জগন্নাথদেব বিড়বিড় করে বলে উঠলেন।

— "তবে আমার প্রথম সন্দেহ হয় সেই মৃতদেহ দেখে যেটা গাছের ওপর থেকে পড়েছিল। সে গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মস্তক। খেয়াল করে দেখবেন আমরা সকলেই শ্যামবর্ণ, একমাত্র মন্ত্রী বিমল তুলনামূলক গৌর, আর মাথায় সবসময় পাগড়ি পরে থাকত। তখনই বুঝতে পারি সকল বিকশবাহু বিনষ্ট হয়নি। তারা ছদ্মবেশেই আমাদের আশপাশে লুকিয়ে ছিল।"

— "আর এখন?"

— "রাজমাতার নির্দেশে ওদেরকে সেই গুহাতেই জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছে। আর গুহার মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজগুরু

সেখানে কিছু উপাচার করেছেন। আপনি ছাড়া আর কেউ সেই গুহার মুখ খুলতে পারবে না।”

মহামন্ত্রীর মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

— “আর মা রঙ্কিনীর জিহ্বা? সেটা কোথায়?”

— “সেটা কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে রেখে দেওয়া হয়েছে।”

জগন্নাথ দেবের চোখে জল, — “আমি এ কী পাপ করলাম গুরুদেব? কী পাপ করলাম? মা রঙ্কিনীর অঙ্গহানি করে মা'কে শক্তিহীন করে দিলাম।”

— “আপনি কিছু করেননি রাজামশাই। আপনি বশীভূত ছিলেন অপশক্তির। হ্যাঁ, এটা ঠিক মা রঙ্কিনীর অঙ্গহানি হয়েছে, তবে এর একটা প্রতিকার আছে। আজ থেকে দেবী ওখানে কালী নয়, দুর্গা রূপে পূজিত হবেন। আর আপনি দেবীর আরেকটি মন্দির নির্মাণ করুন রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে। রাজ্যবাসী সেখানেও পুজো দিতে পারবে।”

— “বেশ,” রাজা চোখের জল মুছলেন, “তা-ই হবে গুরুদেব। তা-ই হবে। কিন্তু কল্লকেশী আর কোনদিন জেগে উঠবে না তো?”

— “কল্লকেশীকে জাগাতে গেলে, আপনার রক্তের শেষ ফোঁটা আর মা রঙ্কিনীর জিহ্বা নিয়ে আপনাকেই পৌঁছোতে হবে সেই গুহায়। গুহার মুখটি যেই দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আপনার বুকের রক্ত দিয়ে আপনারই বুকের ক্ষতের মতো আঁক কাটলে তবেই খুলবে সেই গুহার মুখ। আর এই জন্মে আপনি নিশ্চই এরকম কাজ আর করবেন না। তা-ই না?”

কথাটা বলেই শম্ভুপাদ মুচকি হাসলেন। তাঁর মন এখন কিছুটা প্রসন্ন। কাল রাতে তিনি আর সেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখেননি। তারমানে আর কোন বিপদ নেই। সব বিপদ কাটানো গিয়েছে।

মানুষের মন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নিশ্চিন্ত হলে সম্ভাব্য সতর্কতার কথা ভুলে যায়। নাহলে এমন গোপন কথা এই রকম উন্মুক্ত স্থানে আলোচনা করাটা শুধু মুর্খামিই নয়, দম্ভের ও পরিচায়ক। তাই হয়তো কেউ খেয়াল করলেন না, ঘরের মধ্যে পথ্য রাখার নাম করে কেউ একজন তাঁদের সমস্ত কথা শুনে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। চুপি চুপি!

(নিঃশব্দ অনুসরণ)

— "তুমি ঠিক আছো?"

সাগর মাথা তুলে দেখল সেই ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে। পেশীবহুল শরীরে অসংখ্য ট্যাটু। কোনটা ভারতীয় মাইথোলজি, কোনটা আমেরিকান ট্রাইবসদের চিত্র আবার কোনটা হরিফাইং! সাগর ডাম্বেল দুটো নীচে নামিয়ে রাখল। বাতানুকূল এই ফিটনেস ক্লাবের ভেতর তখন উচ্চস্বরে বেজে চলছে বিদেশি মিউজিক।

— "আমি একদম ঠিক আছি।", সাগরের ঠোঁটে সৌজন্য মূলক হাসি, "আসলে কয়েকদিন থেকে খুব একটা ভালো ঘুম হচ্ছে না! তা-ই একটু মাথা ঘুরে গেছিল।" সাগর আসল কথাটা এড়িয়ে গেল।

— "তাহলে এক কাজ কর, আজকে আর বেশি সময় না কাটিয়ে বাড়ি ফিরে ঘুম দাও।"

ছেলেটির আন্তরিকতা সাগরের ভালো লাগল।

ছেলেটির নাম বিষাণ। হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করছে। সাগরের সঙ্গে এই জিমেই আলাপ।

বিষাণ বলল, "এক কাজ করি চলো, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই!

— "its very kind of you. But I could manage. please তুমি continue করো।"

বিষাণ হাসল, "আমি জানি তুমি পারবে, কিন্তু আজকে আমায় তোমাদের ওইদিকে একটা কাজে যেতে হবে। তা-ই..."

— "কিন্তু তোমার তো এখন কমপ্লিট হয়নি!" সাগর জিমের চারদিকটা ভাল করে তাকাল। কেউ ফলো করছে না তো!

— "ওই যে বললাম কাজ আছে। বেরোতে হবে।"

— "ঠিক আছে! চলো, বেরোনো যাক!"

— "আমি সত্যি ভীষণ লজ্জিত! সেদিন ওইভাবে তোমার ওই ট্যাটুর কথাটা জিজ্ঞেস করলাম।"

বিষাণ গাড়ি চালাতে চালতে কথা বলতেই সাগরের মনে পড়ল প্রথম যেদিন বিষাণ জিম জয়েন করেছিল সেদিনের কথা। অজান্তেই বুকের কাছে হাত চলে যায়। আর তারপরেই একটা ভয়ের স্রোত বয়ে চলে ওর শিরদাঁড়া দিয়ে। সেদিন শার্টলেস হয়ে আপার শোল্ডার এর এক্সারসাইজ করছিল সাগর। এমনিতেও কলকাতায় তার সময় যেন কাটতে চায় না। আফটার অফিস সে বাড়িতে বোর ফিল করে বলে সদ্য এই জিম জয়েন করেছে। কাঁহাতক আর মুম্বাই নিবাসী বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটানো যাবে? এখানে এসে ভাল লাগে। বিষাণ এসে তার বুকের ট্যাটুর কথা নিজের থেকেই জানতে চায়। এমনিতে সাগর একটু লোকজনের সঙ্গে কম মেশে। বন্ধু ও যে খুব একটা আছে তাও নয়। থাকার মধ্যে আছে মিলি আর অনিকেত। দু'জনেই ওর অফিস কলিগ। অনিকেত আবার ওর স্কুলফ্রেন্ড। মুম্বাইতে ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে পড়াশোনা। ওঠাবসা সব। কিন্তু অনিকেতের জিমে আগ্রহও নেই। ও যোগব্যায়ামের ক্লাসে যায়। নতুন শহরে এসে অনিকেত আবার ওকে নিয়ে ভীষণ প্রোটেক্টিভ। সব সময় এই করবি না, ওই করবি না। ঠিক মায়ের মতো। বেশ মজা লাগে সাগরের এসবে।

বিষাণ নিজের থেকে ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে দেখে ও জানায় বুকের দাগটা কোনও ট্যাটু নয়। ওর জন্মদাগ। কিন্তু বিষাণের মুখ দেখে মনে হল সে বিশ্বাস করেনি।

না হওয়ারই কথা। এত গভীর রঙের একটা অদ্ভুত নকশা বুকে নিয়ে জন্মেছে সে, যে সত্যি কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর কথায় কথায় ওদের মধ্যে কথা বাড়ে। বিষাণ জানায় ওর প্রাচীন ভারতের রহস্যময় ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ। সেই নিয়ে পড়াশুনাও করছে। সাগর ও কৌতূহলী হয়। সে জানায় একটি বড় ম্যাগাজিনের 'দুনিয়ার বিস্ময়' নামক জনপ্রিয় কলাম এর লেখক সে। তার কাজ হল ভারত ও ভারতের বাইরের, যা আশ্চর্য আর বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তা নিয়ে কলামটিতে লেখা।

আর ঠিক তখনই বিষাণ জানায় ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়া অঞ্চলের কোনও এক পাহাড়ি এলাকায় নাকি এক গোপন গ্রাম আছে। সেই গ্রামের পাঁচ জন

এমন লোক আছে, যারা নাকি অমর!

প্রথমে সাগর হো হো করে হেসেছিল এই কথা শুনে। কিন্তু বিষাণ গম্ভীর হয়েছিল। অফার দিয়েছিল, সে কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্যাপারের খোঁজে বেরোচ্ছে ঝাড়খণ্ড। সাগর চাইলে আসতে পারে।

গোটা ব্যাপারটাতে সাগর বেশ মজা পেয়েছিল। বিষাণকে তার খুব আকর্ষণীয় লাগছে। খুব চার্মিং একটা ক্যারেক্টর। এমনিতেও তার হাতে এমন কোন টপিক নেই যেটা পাবলিক খাবে। আর দুর্ঘটনাবশত বিষাণের কথা যদি মিলেও যায়। তাহলে তো তারই লাভ। যাইহোক সে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

আর গোল বাঁধল ঠিক তারপর থেকেই।

একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই চমকে উঠল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ কিন্তু কে যেন ড্রইংরুমের মেঝেতে রঙ্গোলী এঁকে রেখেছে সিঁদুর দিয়ে। সাধারণ নকশা হলেও এক কথা ছিল কিন্তু এই নকশা তার অত্যন্ত পরিচিত। অবিকল এই নকশা তার বুকে আঁকা জন্মদাগের মতো। একটা চতুর্ভুজ, তার মাঝে একটা ত্রিভুজ, আর তার ভেতরে একটা বৃত্ত।

ভয়ের একটা ঠান্ডা শিরশিরে অনুভূতি নেমে গিয়েছিল সেদিন। এমনিতেও প্রায় রাতে বুকের এই জন্মদাগ নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে সে। কাউকে ভয়ে বলতে পারে না। প্রতি রাতে ঘামে ভিজে ঘুম ভাঙে তার। স্বপ্নে দেখতে পায়, একটা গুহার মধ্যে একটা ইঁদারা। সে সেই ইঁদারার ওপরে বসে পা দোলাতে দোলাতে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের জিব নিজেই কাটছে। সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তারপর সেই নিজের কাটা জিবটাকে নিজেই চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। বীভৎসতায় কেঁপে উঠে ঘুম ভেঙে যায় তার। পরে আর কিছু মনে পড়ে না তার। শুধু মনে থেকে যায় গুহার মেঝেতে আঁকা একটা বিশাল বড় নকশার কথা। অবিকল তার বুকে যেমন আঁকা রয়েছে।

পরের দিন সাগর সবটা অনিকেত আর মিলিকে জানায়। আর এ-ও জানায় যে তার ঝাড়খণ্ড যাওয়ার কথা। শুনে দু-জনেই প্রবল আপত্তি করে। বিশেষ করে অনিকেত। ও মনে করে কেউ সাগরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ও যেন এসব এ পাত্তা না দেয়। আর ঝাড়খণ্ড যাওয়ার প্ল্যানটা ক্যানসেল

করে এই সময়। কিন্তু ভয় পাওয়ার তখন ও অনেকটা বাকি ছিল।

দুপুরে হঠাৎ করে অফিসে বসে আছে। এমন সময় একটা কুরিয়ার এল। সাগর অবাক, সে নিজে তো কিছু আনতে দেয়নি। তাহলে? প্রেরকের নামটাও গোলমেলে। যাইহোক সাগর প্যাকেটটা খুলতেই সেই রাত্রের অজানা ভয় তাকে দিনেরবেলায় ভরা অফিসে গ্রাস করল। সে দেখল, লাল সুতোয় বাঁধা কতকগুলো কাটা লেবু আর আরকটা কাগজ। কাগজে পরিষ্কার করে লেখা আছে লাল কালি দিয়ে,

'প্রাণে বাঁচতে চাইলে ঝাড়খণ্ড যেও না। গেলে বেঁচে ফিরবে না।'

এ তো পরিষ্কার হুমকি!

সাগর তখনি ভাবল পুলিশে যাবে। কেউ চায় না সে যাতে বিষাণের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড যাক। কিন্তু কেন? কী আছে ওখানে? আর তাকেই বা কে হুমকি দিচ্ছে?

বাড়ি ফিরে এলো। শরীর ভালো লাগছে না। অনিকেত বা মিলিকে জানাতে পারলে বেশ হত। কিন্তু ওরা এসব শুনলে আরও ভয় পাবে। আর ওকে যেতে বারণ করবে। কিন্তু কিছু তো একটা আছেই ওই গ্রাম ঘিরে। নইলে কেউ তাকে বারণ করবে কেন যেতে? কী চায় ওরা?

এ রহস্যের সমাধান না করে সে শান্তি পাবে না। কিছুতেই না।

"ওটা ট্যাটু নয়! ওটা আমার জন্মদাগ!"

সাগরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিষাণ মুচকি হাসল, "ওই হল! তা আমাদের কিন্তু পরশু ভোরে বের হতে হবে। মাথায় আছে তো?"

সাগর দেখল বিষাণ গাড়ি তার বিল্ডিং এর গেটের উলটোদিকে এনে দাঁড় করিয়েছে।

"বিষাণ?" সাগর একটু ইতস্তত করছে। "তুমি কি আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কাউকে কিছু জানিয়েছ?"

"নাহ! কেন বলো তো?" বিষাণ অবাক।

সাগর মুচকি হেসে মাথা নাড়াল। " নাহ! এমনি।" অযথা বিষাণকে টেনশন দেওয়ার মানে হয় না।

কথাটা বলে গাড়ি থেকে নেমে যেই রাস্তা পার হতে যাবে, ওমনি তীব্র গতিতে এগিয়ে আসা হেডলাইটের আলো তাকে ভাসিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটা হ্যাঁচকা টান। হুস করে একটা কালো চারচাকা পুরো নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এখনও ঘোর কাটছে না সাগরের। একটু হলেই গাড়ির তলায় থেঁতলে পড়ে থাকত। ভাগ্যিস বিষাণ ছিল! কিন্তু ও অত তাড়াতাড়ি টানল কীভাবে?

কিন্তু সে সব ভাববার সময় ছিল না। তার আগেই বিষাণ চিৎকার করে উঠল, ‘‘পাগল হলে নাকি? এখনি কী হত ভেবে দেখেছ? দেখে পার হবে তো!’’

— ‘‘সরি! আসলে বুঝতে পারিনি।’’ সাগরের বুকটা তখন ঢিপঢিপ করছে উত্তেজনায়।

‘‘ঠিক আছে, সাবধানে যাও। পরশু ভোরে দেখা হচ্ছে, কেমন? গুড নাইট!’’ কথাটা বলেই হুশ করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল বিষাণ!

সাগর রাস্তা পের হতে গিয়ে বাম দিকে তাকাল। সেই কালো গাড়িটা ওইদিকেই বেরিয়ে গেল না? আচ্ছা? ব্যাপারটা সত্যি অ্যাকসিডেন্ট ছিল নাকি কারো পূর্ব পরিকল্পনা! কেউ কি তাকে মারতে চায়? কিন্তু কেন?

সাগর সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে আলো জ্বালাতে যাবে এমন সময় একটা কথা বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো মাথায় ধাক্কা মারল,

‘আচ্ছা, বিষাণ তো কোনদিনও তার বাড়ি আসেনি, তাহলে সে কী করে কোনও ইন্সট্রাকশন ছাড়া ঠিকঠাক তাকে তার বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি থেকে নামাল! বিষাণ কী করে জানল যে সাগর এখানেই থাকে? ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। সময় বুঝে ব্যাপারটা জানতে হবে ওর থেকে!’

কথাটা ভাবতে ভাবতে সাগর যেই ড্রইংরুমের আলো জ্বালালো, তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। আর ভয়ে আতঙ্কে আপাদ মস্তক কেঁপে উঠল থরথর করে। এ কী দেখছে সে?

তার পোষা বেড়াল মিনির কেউ মুণ্ডু ছিঁড়ে ঘরের মেঝেতে ফেলে রেখেছে। সারা ঘরের মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত। আর কেউ সারা ড্রইংরুমের চার দেওয়াল আর ছাদ রক্ত দিয়ে একটা বিশেষ নকশায় ভরিয়ে তুলেছে। এ নকশা

তার বহু চেনা।

একটা চতুর্ভুজ, তার মাঝে একটা ত্রিভুজ, তার মাঝে একটা বৃত্ত।

* * * * * * * *

— "কী বুইললেন? অমদ্দের গ্রাম?!" কথাটা বলে খিকখিক করে হেসে উঠতেই ঠোঁটের কোল থেকে ছলকে পানের রস নোংরা জামার উপর পড়ল লোকটার। আপাতত ওরা যে গেস্ট হাউসের মতো বাড়িটাতে এসে উঠেছে, তার কেয়ারটেকার এই বুড়ো লোকটা। বেঁটে চেহারা। মাথায় ঝাকড়া কাঁচা-পাকা চুল। জামা ময়লা। মচমচ করে পান চিবিয়ে চলছে এক নাগাড়ে। সাগরের একদম লোকটাকে পছন্দ হয়নি। সেই ভোরবেলা বেরিয়ে এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছেছে এই গ্রামে। সাগরের ইচ্ছে ছিল ঘাটশিলার কোনও ভালো হোটেলে যাতে ওঠে বিষাণ। কিন্তু বিষাণ জানায় হোটেলে থাকলে সেই গ্রামের খবর পাওয়া কোনোদিন সম্ভব হবে না।

গ্রামের খবর পেতে গেলে গ্রামের কোনও হোমস্টেগুলোতেই থাকতে হবে। এখানকার অনেক গ্রাম আছে যার গ্রামবাসীরা আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত। তারা নিশ্চয়ই জানবে এরকম কোনও লোকেদের কথা।

তাই তারা এসে উঠেছে পালুধি নামক এই গ্রামটিতে। এখানে ওঠার কারণ এখানে গেস্ট হাউসের মতো একটা ঘর দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মাটির দোতালা ঘর। বেশ ছিমছাম। আর এই গ্রামটির একেবারেই পেছন থেকেই বনে ঢাকা খাড়া পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে গিয়েছে পরপর।

সুন্দর প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এই গ্রামটির জনজীবন বড় সাধাসিধে। এরা চাষবাস করে। কাছাকাছি একটা মাইন আছে অবশ্য কিন্তু এই গ্রামের কেউ সেখানে কাজ করে না। সুন্দর অথচ কী অনাড়ম্বর জীবন যাপন এদের।

— "তাহলে এখানে এরকম গ্রাম নেই বলেছেন?" বিষাণ লোকটির হাসি থামলে গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল।

— "পাগুল হইলেন নাকি?" লোকটির চোখে তাচ্ছিল্য, "এইকানে

এইরুকুন কুন গ্রাম লাই। কোত্থেকে খবর পাইছেন?"

বিষাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সাগর বলল, "আপনি কিছু খাবার ব্যাবস্থা করুন। কী খাবো দুপুরে?"

— "আজ তো আমাবস্যি। তেমন কিছুই মাছ মাংস হবে না, তবে ভালো নিরামিষ খাবার হবে, মোটা চালের ভাত, ভাঙা মুগ ডাল, পাঁচমেশালি তরকারি, চালতার চাটনি আর দই।"

— "বেশ, সেগুলো যেন একটার মধ্যে পাই, একটু দেখুন।" সাগরের গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল।

— "আচ্ছা!" লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, তা আগেই বিষাণ বলে উঠল, "একটু ঠান্ডা খাবারের জল দিয়ে যান তো!"

"মনুর মা!"লোকটি হাঁক পাড়তেই একটা বুড়ি দরজার কাছে জুবুথুবু পায়ে হাজির হল। বুড়ির গায়ের রং কুচকুচে কালো। মাথায় সাদা চুলের জটা। পিঠে একটা বড় কুব্জ। মুখে বলিরেখার ভারে চামড়া কুঁচকে গিয়েছে।

— "বাবুরা আইসচে! উদের খাওয়ারের জল দে!"

বুড়িটি মাথা নেড়ে সরে যেতেই ওর পিছন পিছন কেয়ারটেকারটি বেরিয়ে গেল। তবে যাওয়ার আগে একবার আড়চোখে দেখে নিল ওদের। কলকাতায় এখুনি ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে গোটা ব্যাপারটা। তার ওপর অনেক বড় কাজের দায়িত্ব পড়েছে। এদের চোখে চোখে রাখবার। সে কাজে গাফিলতি হওয়া চলে না।

বিষাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নারকেল ছোবড়ার গদিওলা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

সাগর ভাবছে তাহলে কি সবটাই ভুল! কিন্তু যদি ভুল হবে তাহলেই বা বার বার কেউ বা কারা কেন ওকে ঝাড়খণ্ড আসতে বারণ করবে। আচ্ছা এই কেয়ার-টেকার লোকটিই মিথ্যে বলছে না তো?

এমন সময় মনুর মা একটা ছোট কুঁজোয় করে জল নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সাগর এগিয়ে এল,

— "মনুর মা, বলতে পারো? এখানে কি কোনও গ্রাম আছে যেখানের

লোকেরা মরে না?"

মনুর মা খরদৃষ্টিতে তাকাল একবার সাগরের দিকে, তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ আসছে কি না, যেই দেখল কেউ আসছে না অমনি ফিসফিস করে বলে উঠল, "আছে গো বাবুরা! আছে। এরা কেউ বলবে লাই তোমায় তাদের কুথা। ওদের কথা বুলতে নেই গ। তুমি কী সেথায় জেতি চাও লাকি?"

বিষাণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে, "হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পারবে?"

মনুর মা ফিসফিস করে বলে উঠল, "টিলার উপর ভাঙা রাজবাড়িতে সুয্যি ডোবার আগে চলি এস। এখানে কিছু বলা যাবেনি। জানতি পাইরলে এরা আমায় জ্যান্ত পুঁতে দিবেক। ওদের কথা কইতে লাই গ। কইতে লাই।"

* * * * * * * *

— "আমি কিছু জানি লাই। উদের তো রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরে যাওয়ার ছিল। কিন্তু এখন ঘরে গিয়ে উহাদের দেখতে পাই লাই... না। উরা তো কিছু বলেনি... ভুল হয়ে গেছি... খাওয়ার পর একটু চোখ লেগে গেছিল... হ্যাঁ, জানি... অমাবস্যা পড়ি গ্যাছে? মাপ করেদিন। আমি এখুনি খুঁজতিছি।"

ফোনটা রেখেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো নবারুণ। দুপুরে খাওয়ার পর একটু চোখ লেগে গেছিল। সেই ফাঁকে কখন ওরা দু-জনে বেরিয়ে গিয়েছে সে জানতেই পারেনি। কী করবে এবারে সে? কোথায় খুঁজবে তাদের। অমাবস্যা এরই মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আচ্ছা? ভাঙা রাজবাড়ির দিকে কি ওরা যাবে? কিন্তু কেন যাবে ওরা ওখানে? ওরা তো এসব কিছু জানেই না। হয়তো ওরা আশপাশে ঘুরতে গিয়েছে। কিন্তু অমাবস্যা পরে যাওয়ার পর ওর তো বাইরে থাকা উচিত নয়।

আর ঠিক এই সময় পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল নবারুণ। হঠাৎ করেই ভয়ংকর কালো মেঘ জমছে পশ্চিমের পাহাড়ের মাথায়।

— "হে! মা রঙ্কিনী রক্ষা কর মা! রক্ষা কর!"

কথাটা বলেই নবারুণ পেছনের বনের দিকে ছুট লাগাল। যে করেই হোক ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। খুঁজে বের করতেই হবে।

ততক্ষণে, কলকাতার রাস্তায় তীব্র গতিতে একটা কালো রঙের চারচাকা ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। গাড়ির গন্তব্য ঝাড়খণ্ড।

(নিদ্রাভঙ্গ)

ওইদিকে এক নাগাড়ে শাবল চালিয়ে মাটি খুঁড়ে চলছে সাগর। প্রবল পরিশ্রমে মাথা থেকে টিপ টিপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে কপচানো মাটিতে। অনভ্যস্ত হাতে ফোস্কা পড়েছে অনেক আগেই। কিন্তু তবুও থামছে না তার হাত। যেন কোনও আসুরিক শক্তি ভর করেছে ওকে।

সামনে মনুর মা দাঁড়িয়ে। পিঠের কুব্জ সামলাতে একটা বাঁকানো লাঠির ওপর ভর দিযেছে সে।

ভাঙা রাজবাড়ির ঘরের দেওয়ালে কোন ছাদ আর অবশিষ্ট নেই। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এর মতো রাজবাড়ির দেওয়াল গুলো কেবল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত-নখ বের করা বুড়ো রাক্ষসের মতো। তারই মাঝে সাগর আর সেই বুড়ি দাঁড়িয়ে। এক পাশে পড়ে আছে প্রাচীন রাজবাড়ির কুলোদেবীর ভাঙা পাথরের সিংহাসন। বোঝাই যাই সেটি সরিয়েই এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে।

মাথার ওপর ভয়ংকর কালো মেঘের ধুম্রজটায় চতুর্দিক অন্ধকার। এখুনি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে অথবা মহা প্রলয় ঘটবে।

বুড়ি চিৎকার উঠল। সেই ফ্যাসফেসে গলা পালটে গিয়ে একটা হিসহিসে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা বাড়িটা জুড়ে, "আরও, জোরে খোঁড়। আরও জোরে। ওদের গ্রামে যেতে গেলে এর নীচে যেটা আছে, সেটা বের করতে হবে।"

এমন সময় ঠং করে মাটির নীচে একটা ধাতব শব্দ হল। শাবলে কিছু ধাতুর সঙ্গে ঠোকা লেগেছে। সাগর এর হাত থেমে গেল। বশীকরণ এর প্রভাবে

ওর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে বহুক্ষণ আগেই। দু-হাত দিয়ে শক্ত মাটি সরাতে লাগল। নখ উপড়ে গেল। কিন্তু তবুও পরোয়া নেই। দু-হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলছে। জিনিসটা যেনতেন প্রকারেণ বের করে আনতেই হবে। হঠাৎ কাপড়ে মোড়া একটা ভেজা ভেজা জিনিসে হাত ঠেকতেই সাগর মুখ তুলে তাকাল বুড়ির দিকে। বুড়ির চোখ, মুখ লোভে চকচক করে উঠল।

"তোল... তোল... তুলে লিয়ে আয়। উপড়ে তুলে লিয়ে আয় কেনে।" ফের সাপের মতো হিসহিসে স্বর ছড়িয়ে পড়ল।

সাগর লাল কাপড়ে মোড়া ভেজা জিনিসটা মাটির নীচ থেকে তুলে আনতেই অন্ধকার আকাশের বুক চিরে একফালি বিদ্যুৎ কড়াৎ করে ঝলসে উঠল, আর তারপরেই প্রবল জোরে বাজ পড়বার শব্দ।

সাগরের হাতে ধরা রয়েছে লালরঙের কাপড়ে মোড়া একটা জিনিস। বোঝা যাচ্ছে না কী আছে ভেতরে কিন্তু টুপটাপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে সেই ভয়ংকর জিনিসটা থেকে।

এমন সময় সাগরের পেছন দিকের ভাঙা দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা দেহ। মাথা ন্যাড়া। পরনে সাদা কাপড় আলগোছে জড়ানো। সারা শরীরে উল্কি। বিষাণকে চেনা যাচ্ছে না। তাকে দেখে সেই বুড়ি লাঠি ফেলে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

তারপর কাপড়ের কোঁচড় থেকে বের করে আনল একটা শিঙা। বিষাণের মুখে চোখে নারকীয় হাসি।

শিঙাটি বিষাণ নিজের হাতে নিয়ে একটা ফুঁ দিতেই সাগর মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। তার পিছনে পিছনে বিষাণ। তাদেরকে অনেকটা পথ যেতে হবে। প্রথমে যেতে হবে আদিবাসীদের গ্রামে। তারপর যেতে হবে সেই গুহায় যেখানে কল্লকেশীর প্রধান মন্দিরের গর্ভগৃহ আছে। এখন অনেক কাজ। অনেক।

বুড়ি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল, এ কান্না আনন্দের। কল্লকেশী জেগে উঠলেই তার ঠাকুরদারা মুক্তি পাবে অমরত্বের অভিশাপ থেকে। যারা এতদিন অপেক্ষা করছিল আজকের তিথির।

*   *   *   *   *   *   *   *

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"
"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

মাদলের বোল গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। যারা বাজাচ্ছে তাদের শরীর থেকে ঘাস গজিয়ে গিয়েছে। দুর্বল শরীর তাদের, তিনশ বছরেরও বেশি আয়ু তাদের। তারা পারছে না সেই পুরনো বোল বাজাতে, কিন্তু তাদের থামলে চলবে না, কিছুতেই না। বিষাণ একটা ছুরি দিয়ে সাগরের বুকের দাগটা আবার গভীর করে তৈরি করে দিয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে বুক থেকে পাথুরে মাটিতে।

বিষাণ গুহার দরজার কাছে বসে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া শুরু করেছে। কবর থেকে টেনে তুলতে হবে বিকশবাহুদের। যাদেরকে জ্যান্ত পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, মাটির ভিতরে। তারা না বেরিয়ে আসলে উপাচার করবে কে? বিষাণ তো কেবল মাত্র একজন শিক্ষানবিশ। বিকশবাহুর রক্ত তার শরীরে। কিন্তু সে কি পারবে কল্লকেশীকে জাগাতে? তার জন্য জাগতে হবে তার পূর্বপুরুষ প্রধান বিকশবাহুকে। উফ! কতদিন যে অপেক্ষা করেছে তারা বংশ পরম্পরায়। শুধু রাজার পূর্ব জন্মের অপেক্ষায়। শুধুমাত্র রাজরক্তের অপেক্ষায়। আজ সে সফল। কল্লকেশী প্রসন্ন হবেন। হবেনই।

এমন সময় গুহার পাথুরে মাটি ফুঁড়ে একটা কঙ্কালের হাত বেরিয়ে এল। ওই, ওই তো ওরা জেগে উঠছে। ধীরে ধীরে। মন্ত্রের তালে তাল রেখে।

*   *   *   *   *   *   *   *

— "আপনার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।"

অনিকেত এগিয়ে চলছে। ওর পিছনে নবারুণ বাবু। তার পিছনে একটা ছোটখাটো দল।

— "আমি বুঝতে পারিনাই উরা আজকেই বেরায়ে যাবে।" নবারুণবাবু কাঁচুমাচু করে বললেন।

— "আপনার অলক্ষ্যে কেউ না কেউ ওদের কিছু জানিয়েছে। যা ওদের জানা উচিত ছিল না।"

অনিকেতের হাতে পাঁচ সেলের বিরাট টর্চ লাইট। ভাঙা রাজবাড়ির থেকে রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করে ওরা অনেকটা পথ চলে এসেছে।

— "আপনার আর আমাদের বংশ পরম্পরায় এই কাজটাই ছিল, যে আমরা রাজাকে রক্ষা করব। সেই কাজে আপনি আমি দু-জনেই ব্যর্থ হয়েছি।"

নবারুণ সত্যি কিছু বলতে পারল না। তার প্রপিতামহ রাজ বংশের মহামন্ত্রী ছিলেন। তার কাজটাই ছিল স্বর্ণ জিহ্বার রক্ষা করা। আর অনিকেত হলেন শম্ভুপাদের বংশধর। তাদের বংশ পরম্পরায় কাজ ছিল জগন্নাথদেব পুনর্জন্ম নিলে তাকে আগলে রাখা। দু-জনেই নিজের কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

— "আমি তবুও অনেক ভাবে ভয় দেখিয়েছি, হুমকি ভরা চিঠি পাঠিয়েছি, এমনকি ওর এক্সিডেন্ট ও করাতে চেয়েছি কিন্তু ওই ছেলেটি ওকে ঠিক সামলে নিয়ে এসেছে। আর এখানেই আমার কেন জানি না সন্দেহ হচ্ছে, ওই ছেলেটির সঙ্গে বিকশবাহুর কোনো না কোনো সংযোগ আছে।"

নবারুণ অনিকেতের কথায় অবাক হল, "তাইলে ওই ছেলেটিই রাজার ঘরে ওইসব এঁকে আসত ?"

— "না।" অনিকেত দ্রুত পাহাড়ের ঢালে নামতে নামতে বলল,"ওইসব সাগর নিজে করত।"

— "কী?" নবারুণ অবাক হল।

— "আপনি নিশ্চয়ই জানবেন রাজ রক্তের সাথে কল্লকেশীর দু-ফোঁটা রক্তের সংযোগ হয়েছিল। সেই দু-ফোঁটা রক্তের বন্ধনেই নিজের মধ্যে কল্লকেশীর সত্ত্বা লালন করছিল সাগর। এটা ও জেনে বুঝে করেনি হয়তো। কিন্তু ওই করেছে। আমি মাঝে মাঝে ওই শরীর থেকে নরকের গন্ধের আভাস

পেতাম। আর আর সেই জন্য আমি আগলে রাখতাম।"

কথাটা বলতে বলতেই ডান হাতের বাজুতে ধারণ করা শিকড়ের মাদুলী খানা স্পর্শ করল সে। বংশ পরম্পরায় তারা এই শিকড়ের তাবিজ ধারণ করে এসেছে। এটাই তাদের শক্তির মূলাধার বলা চলে।

— "আপনি মায়ের খাঁড়াটা এনেছেন? ওটা কাজে লাগতে পারে।" অনিকেতের প্রশ্নে নবারুণ একখানা লোহার খড়গ বাড়িয়ে দিলো অনিকেতের দিকে।

— "দেবীর স্বর্ণ খড়গের কোনো সন্ধান পেয়েছেন? শুনেছিলাম তার নাকি অসীম ক্ষমতা ছিল।"

— "সেই সোনার খাঁড়ার কথা তো গল্পেই শুনিছি। সে কী সত্য সত্য রইচে?"

— "কোথাও না কোথাও তো..." ... হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনিকেত। অনেকটা চলে এসেছে কিন্তু এখানে এসেই দেবী রঙ্কিনীর রক্তের ফোঁটা হঠাৎ করে যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কী করবে এবার সে? সে কি নিজের গোপন শক্তি প্রয়োগ করবে? না আর ভাবলে চলবে না। একটা মাদলের বোল অনেকক্ষণ ধরেই শুনতে পাচ্ছে তারা। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে নিজের বীজমন্ত্র পড়তে থাকল বিড়বিড় করে। পারলে এটাই পারবে তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। রাজার সন্ধান তার যেমন করেই হোক চাই।

*   *   *   *   *   *   *   *

ওরা যত দুলছে মন্ত্রের তালে তালে মাংস গলে গলে খসে পড়ছে ওদের কঙ্কালময় শরীর থেকে। সাতটি কঙ্কাল সেই আগের বারের মতো নকশার কোণে বসেছে। ওদিকে বিষাণ গুহার দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে মাদলের বোলের তালে তালে চিৎকার করে অবোধ্য মন্ত্র পড়ছে। মাংসের পচা গন্ধে গুহার ভেতরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আবার ধিকি ধিকি করে জ্বলছে মশালগুলো। আর মাদলের বোল বেজে চলছে,

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

ইঁদারার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আছে একটা নরকঙ্কাল। সারা শরীর থেকে রস আর রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে সেই কঙ্কালটির। কঙ্কালটি এক হাতে একটা মশাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তারপাশে দাঁড়িয়েছিল সাগর। সম্পূর্ণ দেহ নগ্ন, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। একহাতে রঙ্কিনী দেবীর স্বর্ণ জিহ্বা ধরা। স্বর্ণ জিহ্বা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে তখনও লাল রক্ত। ঠিক আগেরবারের মতো।

কঙ্কলটি হঠাৎ করে হাতের মশালটি অন্ধকার ইঁদারাতে ফেলে দিতেই ইঁদারার ভেতর থেকে লাল আগুনের আভা ছিটকে বেরিয়ে গুহার চতুর্দিক আলোয় ভাসিয়ে দিল।

ভয়ংকর দেখাচ্ছে সকলকে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে সাগরকে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে বিকশবাহুকে। মনে হচ্ছে নরককুণ্ড থেকে হাজার হাজার প্রেতেরা সারা গুহায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ করেই পাশে দাঁড়ান কঙ্কালটি সাগরের বাম হাত ইঁদারার ওপর টেনে ধরল। ইঁদারার ভেতর থেকে কল্লকেশীর গর্জন ভেসে আসছে। বাকি আছে শেষ ফোঁটা রক্ত। সেটা কল্লকেশীর কাছে উৎসর্গ করলেই ভয়ংকর ঘুম থেকে জেগে উঠবেন কল্লকেশী। কঙ্কালটি একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা দিয়ে সাগরের বাম হাতের চেটো বরাবর কেটে দিল। আর মুহূর্তের মধ্যেই শেষ ফোঁটা রক্ত টুপ করে সেই ইঁদারার মধ্যে পড়তেই একটা প্রবল আলোর বিস্ফোরণ!

ইঁদারার ধার থেকে কঙ্কালটি আর সাগর দু-জনেই ছিটকে পড়ল পাথরের দেওয়ালে। একটা প্রবল হাওয়া দিচ্ছে গোটা গুহা জুড়ে।

আর সেই হাওয়ায় প্রধান বিকশবাহুর কঙ্কালটি ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে। হ্যাঁ! ধীরে ধীরে। সেই হাওয়া তার কঙ্কাল শরীরকে পূর্ণতা দিচ্ছে।

কিন্তু ও কী? কঙ্কালটি এবার ধীরে ধীরে হাত বাড়াচ্ছে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বার দিকে। ওটাই তো শেষ পর্যায়।

সাগর অচেতন। প্রধান বিকশবাহুর শরীর ধীরে ধীরে প্রায় পূর্ণতার দিকে। হাত বাড়ালেই দেবীর জিহ্বা শয়তানের হাতে। আর দেবীর অভিষেক করা

রাজরক্ত নিবেদিত হয়ে গেছে কল্লকেশীর চরণে! বিকশবাহুদের তো আর দেবীর অঙ্গ ধরতে সমস্যা নেই।

কিন্তু তার আগেই... হ্যাঁ তার আগেই গুহার দ্বার থেকে ছিটকে এল বিষাণের কাটা মুণ্ডু। প্রধান বিকাশবাহুর অর্ধনির্মিত কঙ্কাল দেখল গুহার দরজার কাছে ধপ করে পড়ে গেল বিষাণের মুণ্ডুহীন দেহ। আর তারপরেই দেখা গেল অনিকেতকে। অনিকেতের হাতে তখন ও ধরা ছিল বিষাণের রক্ত মাখা রঙ্কিনী দেবীর লোহার খাঁড়া।

বিষাণের দেহ তখনও ছটকাচ্ছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গুহার মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওদিকে তো বিষাণের মন্ত্রপাঠ ও থেমে গিয়েছে। আর থেমে যেতেই বাকি বিকাশবাহুদের দেহ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। যে মন্ত্র ওদের কবর থেকে বের করে এনেছিল সে-ই মন্ত্রের অপূর্ণতা ওদের শেষ করে দিচ্ছে।

একটা নারকীয় চিৎকার ভেসে এল প্রধান বিকাশবাহুর গলা থেকে। অনিকেত চমকে উঠল। প্রধান বিকশবাহুর হাতে দেবী রঙ্কিনীর জিহ্বা। সে উঠে দাঁড়িয়েছে ইঁদারার প্রাচীরের ওপর। লাল আলো পালটে একটা কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে ইঁদারার মধ্যে থেকে।

নবারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "ওর হাতে মায়ের জিব!"

কিন্তু এই চিৎকারটুকু করতেই যতক্ষণ। অনিকেত একটা মরণ লাফ দিয়েছে ইঁদারার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝলসে উঠল রঙ্কিনী দেবীর খাঁড়া।

মায়ের সোনার জিহ্বা সহ শয়তানের হাতটা মাটি ছোঁয়ার আগেই নবারুণ লুফে নিয়েছে সেটা।

একটা মরণ আর্তনাদ! আবার একটা সাদা আলোর বিস্ফোরণ!

আলো কমে যেতেই নবারুণ সহ সকলে চোখ মেলে তাকাল। না ইঁদারার ওপর কেউ নেই। না অনিকেত। না বিকশবাহুর অর্ধ নির্মিত কঙ্কাল। ওরা দু-জনেই সেই প্রবল বিস্ফোরণে ইঁদারার মধ্যে পড়ে কালের গ্রাসে পরিণত হয়েছে।

ততক্ষণে বাতাস থেমে গিয়েছে। মশালের আলোও আবার পূর্ণ শক্তিতে

জ্বলে উঠেছে। গুহার ভেতরটা আলোকিত লাগছে আবার। সব ঠিক হয়ে গেছে।

শুধু এই তালগোলে মাদল বাজানো পাঁচজন লোক কখন যে গুহার পেছনের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে সেটা কেউ খেয়াল করেনি।

রাজাকে বাঁচানো গিয়েছে কিন্তু মহর্ষি শম্ভুপাদের বংশধর নিজেকে শেষ করে দিয়ে অপশক্তিকে নষ্ট করে দিল। এ বলিদান রাঢ়ভূমির ইতিহাসে কোথাও লেখা থাকবে না। কোনোদিন কেউ জানতে পারবে না এক তরুণ যুবকের কী পরিণতি হল আপন কর্তব্য পালনের জন্য। নবারুণের চোখে জল। মা রঙ্কিনী ওর আত্মাকে শান্তি দিক।

নবারুণ বাকীদের নির্দেশ দিল অচেতন সাগরকে তুলে নিয়ে পাঁজাকোলা করে গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে। তার হাতে তখনও ধরা মা রঙ্কিনীর জিহ্বা। মনে মনে ঠিক করল, রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা সে এবার এমন কোন গোপন জায়গায় রেখে দেবে যেখান থেকে কেউ খুঁজে পাবে না আর। কেউ না।

* * * * * * * *

মুম্বাইতে নতুন অফিস জয়েন করেছে সাগর। অনিকেতের মৃত্যুর পর কলকাতায় থাকার আর ইচ্ছে হয়নি সাগরের। এখানে মা-বাবা আছে। কিছুটা মন ভালো থাকে এদের সঙ্গে সময় কাটালে। কিন্তু আজ অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই চমকে উঠল সাগর। পুরোনো ভয়ের একটা শিরশিরে স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড দিয়ে।

এ কী? আয়নায় তো তার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে না সাগর। তার বদলে একটা কালো ধোঁয়া সারা আয়না জুড়ে। আর ওকি? কে যেন, আর কে যেন লালরঙ দিয়ে আয়নার কাচে লিখে দিয়েছে বড় বড় করে,

"রঙ্কিনীর জিহ্বা চাই! রঙ্কিনীর জিহ্বা!"

রুক্মিনীর অষ্টমগর্ভ
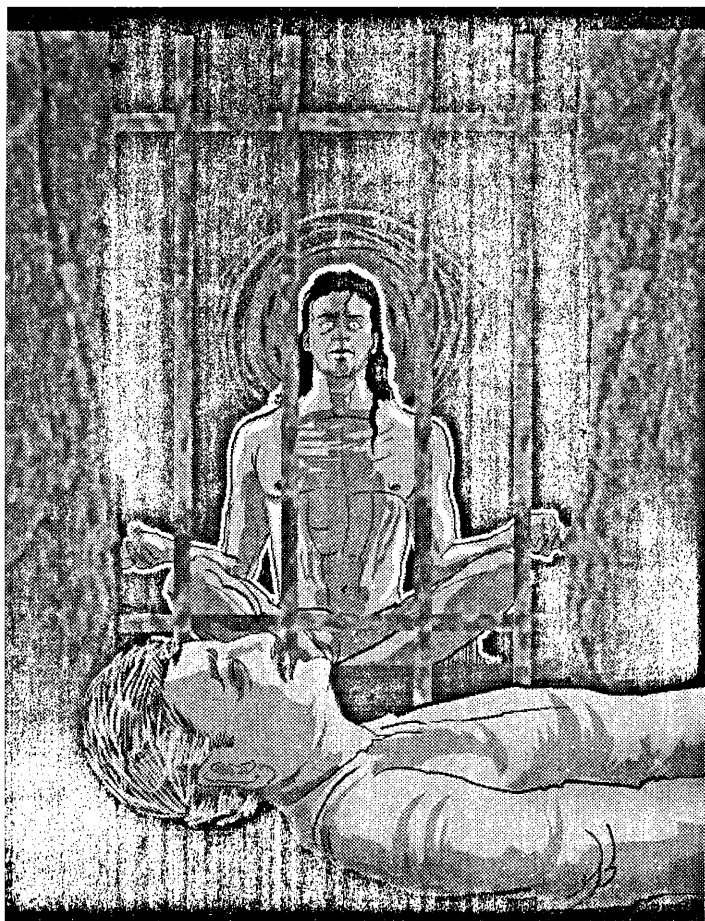
(ইঙ্গিত)

সময় আনুমানিক মধ্যরাত্রি।

মহর্ষি শম্ভুপাদ ধীরে ধীরে, প্রায় কোনো শব্দ না করে, রাজমহলের অলিন্দ বরাবর এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। এক হাতে দেবী রঙ্কিনীর সোনার খড়গ, অন্য হাতে জ্বলন্ত মশাল। মহর্ষির সাবধানী পদক্ষেপ কারণ মহলের মেঝেতে, দেয়ালে চতুর্দিকে রক্তের ছোপ। সেই সঙ্গে নারী, পুরুষ, শিশুর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। কাটা পড়া অঙ্গ, মুণ্ডুহীন ধড় থেকে তখনও ফিনকির আকারে রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে রাজ মহলের মেঝে পিছল করে তুলছিল। মহর্ষি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই মৃতের স্তুপ, সেখানেই রক্তের ধারা। যেখানে অপেক্ষাকৃত নীচু মেঝে সেখানে তো রক্তে গোড়ালিও ডুবে যাচ্ছে। এ এক নারকীয় দৃশ্য!

দেখতে দেখতে তিনি মহলের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এসেছেন। এখানে মৃতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু রক্তের পরিমাণ অব্যাহত। মহলের দক্ষিণ দিকে লম্বা বারান্দা যার একদিকে সাদা পাথরের দেওয়াল। আর আরেকদিকে রঙিন কাচ লাগানো বড় বড় জানালা। পূর্ণিমার রাত্রে এই জানালার পাশে এসে দাঁড়ালে দিগন্তবিস্তৃত ধলভূমগড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায়। মহর্ষি একবার জানালার বাইরের কুয়াশা-ভরা অন্ধকারের দিকে তাকালেন। জানালার রঙিন কাচগুলো আর আস্ত নেই। হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া সেই ভাঙা জানালা বেয়ে বারান্দায় আছাড় মারতেই মশালের আলোটা কেঁপে উঠল। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা বড় দরজা। দরজার দুটো পাল্লাই ভেঙে বারান্দার দিকে ঝুলছে। ওটাই এই রাজপ্রাসাদের কুলদেবী সিংহবাহিনীর ঠাকুরঘর। মহর্ষি শক্ত হাতে খড়গর হাতলখানা চেপে ধরলেন। দেবীগৃহের ভেতরটা অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার দেবীগৃহে প্রবেশ করলেন মহর্ষি। আর ভেতরে ঢুকতেই

তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মশাল উঁচিয়ে দেখলেন দেবীগৃহের দেওয়াল বেয়ে রক্তের ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তারপর তা মেঝেতে এসে জমা হচ্ছে। তারপর সেখান থেকেই বর্ষার জলের মতো রুধিরধারা গড়িয়ে দেবীগৃহের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় তাঁর কানে এলো এক কুলকুল শব্দ।

তরলের ধারা পাথর বেয়ে ওপর থেকে পড়লে যেরকম আওয়াজ হয়, এ-ও খানিকটা তেমনি। শব্দের উৎস লক্ষ করে মশাল উঁচিয়ে ধীর পায়ে দেবীগৃহের বাঁ দিকে এগিয়ে গেলেন রাজগুরু। কিন্তু বেশিদূর এগোতে হল না। দৃশ্যটা তাঁর নজরে এসেছে। ঘরের বাঁ দিকের মেঝেতে একটা আনুমানিক তিন ফুট বাহুর বর্গাকার কালো গহ্বর। রক্তের প্রবহমান ধারার কিছুটা অংশ সেই গহ্বরেই অদৃশ্য হয়েছে। বলাই বাহুল্য শব্দটা সেখান থেকেই আসছে।

আর দেরী না করে অতি দ্রুত সেই গহ্বরের পথ ধরে এগোতে লাগলেন তিনি। পাথুরে সিঁড়ি রক্তে পিছল হয়ে আছে। সাবধানে এগোতে হবে, নইলে বিপদ ঘটতে দেরি লাগবে না। সাবধানে নামছেন মহর্ষি তবে দ্রুততার সঙ্গে। তাঁর অনুমান যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে অনেকটা পথ নীচে নামতে হবে তাঁকে।

কিন্তু মহর্ষিকে অবাক করে দিয়ে যেন আচমকা সিঁড়ির পথ শেষ হয়ে গেল। আশ্চর্য! তাঁর স্মৃতি তো এত দুর্বল নয়। সিঁড়ির শেষপ্রান্ত গিয়ে মিশেছে এক অন্ধকার পাথুরে মেঝেতে।

মশালের আলো তুলে ঘরের চারিদিকে দেখার চেষ্টা করলেন তিনি। নাহ! এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল আর তেমনই পাথরের ছাদ। এটা কোনো ঘর নয়। ঘরের দেওয়াল এমন হয় না। এটা একটা গুহা। আচমকা একটা জিনিস চোখে পড়তেই চমকে উঠলেন শম্ভুপাদ। গুহার একপাশের দেওয়াল জুড়ে পাঁচ-পাঁচখানা বড় বড় গাছ। গুহার এবড়োখেবড়ো দেয়াল বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছাদে উঠে গিয়েছে সেইসব বিটপরাজি। ভেতরটা ভীষণ চেনা লাগছে তাঁর। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেন না কোথায় দেখেছেন এরকম দৃশ্য। তিনি ধীরে ধীরে গাছগুলোর কাছে এগিয়ে এলেন। কী গাছ

এগুলো? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছগুলোকেই দেখছিলেন আর ঠিক এমন সময় জিনিসটা তাঁর নজরে এল। প্রবল আতঙ্কে তিনি ছিটকে পিছিয়ে এলেন দু-পা।

তিনি যা দেখছেন তা কি সত্যি? নাকি তার চোখের ভুল? ওই ওই... গাছেরা যে শ্বাস নিচ্ছে! মানুষেরা শ্বাস নিলে বুকটা যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, গাছেদের কান্ডগুলো শ্বাসের তালে তালে তেমনই ফুলে ফুলে উঠছে। আর তারপরেই সেই জিনিসটা হল যার জন্য মহর্ষি একেবারেই তৈরি ছিলেন না। হঠাৎ একটা পরিচিত অপার্থিব মাদলের বোল গুহার ভেতরে বেজে উঠল...

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

পরিচিত আওয়াজটা বাড়ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে। এ... এ কোথায় এসেছেন তিনি? এ তো সেই গুহা যেখানে...

এমন সময় খসখস করে অন্ধকারের মধ্যেই একটা শব্দ ভেসে উঠতেই আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেল মহর্ষির সারা শরীর দিয়ে। তিনি ছাড়াও আরও কেউ আছে এই গুহার মধ্যে! কে? কোন মানুষ? নাকি...

শব্দটা আসছে গুহার পেছনদিক থেকে। মহর্ষি জানেন গুহার এই দিকেই রয়েছে সেই পরিত্যক্ত কুয়ো। মাদলের বোলটা সারা গুহার মধ্যে ভয়ংকর ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম...
দ্রমি দ্রমি দম।
দ্রিমি দ্রিমি দম দম...
দ্রমি দ্রমি দম।"

উফ! কী ভীষণ অপার্থিব, কী ভয়ংকর এই বোল! কিন্তু তাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে মাদলের বোলকেও ছাপিয়ে যাওয়া এই বিশ্রী খসখসে শব্দ। কীসের শব্দ ওটা?

মশালের আলোয় পাথরের ইঁদারাটা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। কিন্তু তিনি দেখতে পেয়েছেন একটা কালো কিছু নড়ছে ইঁদারার উলটোদিকে। মহর্ষির

বুকের ভেতরটা ভয়ংকর ভাবে ধুকপুক করছে উত্তেজনায়। খড়্গের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে ধীরে ধীরে কুয়োর ডান দিকে সরে এলেন তিনি। এবার মশালের আলোয় জায়গাটা স্পষ্ট। লাল শাড়ি পরা একটি মেয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মুখের ওপর দীঘল চুলের আস্তরণ। তাই মুখ দেখার উপায় নেই। কিন্তু ও কী? মেয়েটির পায়ের ওপরে অর্ধনগ্ন হয়ে বসে আছে একজন পুরুষ, যার পিঠটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। উফ কী ভয়ংকর! মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে পিঠের দিকের মাংস খুবলে হাড় বেরিয়ে এসেছে লোকটির। আর সেই খুবলে যাওয়া অংশে অজস্র পোকা গিজগিজ করে চরছে। কিন্তু লোকটি তো চুপ করে বসে নেই। উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু একটা করছে। কিন্তু কী করছে?

যে মেয়েটা শুয়ে আছে সে কি বেঁচে আছে? না মৃত? ডান দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। পাথরের দেওয়াল পথ আটকাবে। ইঁদারার ধার বরাবর বাঁ দিক দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করতেই জিনিসটা তাঁর নজরে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বমির দমক বেরিয়ে এল শম্ভুপাদের গলার ভেতর থেকে।

লোকটি মেয়েটির গর্ভ বিদীর্ণ করে টেনে বের করে এনেছে গর্ভস্থ সন্তান। শুধু কি সন্তান, নাড়ি ভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে পেটের মধ্যে থেকে। কিন্তু তারপরের দৃশ্যটা যে আরও ভয়ংকর। লোকটি দুটি হাতে করে সেই গর্ভজ সন্তান আর নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর খসখস করে শব্দগুলো সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছে।

আচ্ছা ওগুলো কি রক্ত? নাকি কাদার মতো থকথকে কালো জিনিস! জায়গাটা ভেসে যাচ্ছে সেই কালো কালো থকথকে কাদায়। মহর্ষি খড়্গ তুললেন। এই ভয়ংকর নরপিশাচের মুণ্ডু এখুনি ছিন্ন করতে হবে ধড় থেকে। কী ভয়ংকর শয়তান! নারীর গর্ভ থেকে তার গর্ভের সন্তানকে টেনে বের করে খাচ্ছে এই রাক্ষস! হে মা রঙ্কিনী! এ কী ভয়ংকর দৃশ্য! কে এই অভাগিনী? আর কে এই নরপিশাচ? মুখটা দেখা দরকার। প্রবল রাগে মহর্ষি চোয়াল শক্ত করে খড়্গের ডগা দিয়ে লোকটির হাড় বের করা পিঠে যেই খোঁচা দিলেন লোকটি সাথে সাথে মুখ ফেরাল। মশালের আলো পড়ল সেই

রাক্ষসের মুখের ওপর।

আপাদ মস্তক কেঁপে উঠলেন শম্ভুপাদ! রাজা জগন্নাথদেব! চোখের তারা নেই বললেই চলে। পুরো চোখটা কালো। সারা মুখে কালো কালো কাদা। ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারির ফাঁক থেকে ঝুলছে মৃত শিশুর মাংসের টুকরো! এ কী ভয়ংকর অবস্থা হয়েছে তাঁর? এ কী করছেন উনি? মাদলের বোল আরও আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম!"

হঠাৎ গুহার মধ্যে একটা দমকা হাওয়া দিল। মশালের আলো কেঁপে উঠল ভয়ংকর ভাবে। আর তখনই মৃতা নারীর মুখের ওপর হতে চুলের আস্তরণ সরে যেতেই মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল মশালের আলোয়। এতো সেই... বাচ্চা মেয়েটা! যাকে কিছুদিন আগে সুবর্ণরেখার তটে স্বপ্নে দেখেছিলেন। ওই তো... ওই তো! মেয়েটির নীচের চোয়ালটা নেই!

"মা রঙ্কিনী!..."

শিউরে উঠে যেই দু-পা পিছিয়ে গেলেন ওমনি কী যে হল... রক্তে ভেজা পাথুরে মেঝেতে পা হড়কে গেল মহর্ষির। আর সাথে সাথে পেছনদিকে থাকা কুয়োর ভয়ংকর অন্ধকারে পিছলে পড়ে তলিয়ে গেলেন তিনি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুম ভেঙে গেল মহর্ষির! ধড়ফড় করে নিজের বিছানার উপর উঠে বসলেন তিনি! সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। উফ! আবার... আবার সেই ভয়ংকর স্বপ্ন! বিগত কয়েকমাসে না তাঁকে স্থিরভাবে বসতে দিচ্ছে, না তাঁকে নিশ্চিন্তে ঘুমতে দিচ্ছে এই স্বপ্ন। তিনি ভেবেছিলেন বিকশবাহুদের মৃত্যুর পর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো। কিন্তু কোথায় কী? এই স্বপ্ন তাঁকে মৃত্যুর মতো তাড়া করছে কয়েক মাস। বুঝতে পারছেন আগেরবারের থেকেও কিছু ভয়ানক বিপদ আসতে চলেছে সমগ্র রাঢ়ভূম জুড়ে। আর বারবার তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে এই স্বপ্ন! কিন্তু তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা খুব সীমিত। তিনি কিছুতেই এই স্বপ্নের গূঢ় অর্থ নির্ণয় করতে পারছে না। অথচ এই স্বপ্নের অর্থ বের করা খুব দরকার। খুব!

ঠিক এমন সময় রাজপ্রাসাদের চূড়ার ঘণ্টাটা রাত্রি তিনপ্রহরের ইঙ্গিত দিয়ে বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং করে।

ঘোর ভঙ্গ হল মহর্ষির। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ঘরের দক্ষিণদিকে চলে এলেন। তাঁর ঘরটি আয়তকার, বড়। তিনদিক খোলা বড় বড় জানালা। সদ্য এলাকা হতে শীত বিদায় নিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ি আর পাথুরে অঞ্চলের জন্য এই সময় রাত বাড়লেই ঠান্ডার প্রভাব বাড়ে। সেই সাথে হু হু করে বাতাস বইতে থাকে যা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাই বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে মহর্ষি জানালার বড় বড় পাল্লাগুলো বন্ধই রাখেন।

তিনি দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠান্ডা হাওয়ার কনকনে স্রোত কাঁটার মতো তাঁর চোখে মুখে বিঁধল। কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। তাঁর দৃষ্টি উত্তরের বাগমারী জনপদের দিকে। একাধিক জ্বলন্ত মশাল জনপদের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল মহর্ষির! মহর্ষি জানেন ওই দলের গন্তব্য কোথায়।

নাহ! আর দেরী করা যাবে না। ওরা বেরিয়ে পড়েছে। অমাবস্যার আগের রাত বড় ভয়ংকর রাত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে আস্তাবলের দিকে রওনা হতে হবে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিজের কক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। অনেক।

* * * * * * * *

রাজমাতা সুভাষিণী ধীর পায়ে রাজরানি কঙ্কাবতীর পাশে এসে বসলেন। রানি কঙ্কাবতীর চোখে মুখে তখনও বিধ্বস্ত ভাব। তিনি তখনও হাঁপাচ্ছেন।

রাজমাতা রানির মাথায় হাত রেখে বললেন, "তুমি শান্ত হও কঙ্কাবতী। এই সময়ে উত্তেজনা তোমার শরীরের জন্য বিপজ্জনক।"

এই কথায় কাজ হল কিনা তা বোঝা গেল না।

"আর তুমিই বা এই রাতের বেলা নিজের কক্ষ ছেড়ে মহলের আরেক প্রান্তে আমার ঘরে আসতে গেলে কেন? আমায় খবর পাঠাতে পারতে।

দাসীরা কি ঘুমিয়ে পড়েছিল?”

শেষের কথাটা ছিল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা রানি কঙ্কাবতীর খাস দাসী মদুরার উদ্দেশে। মদুরার এই সময় কাজই হল সবসময় রানি কঙ্কাবতীর কাছে কাছে থাকা। তাঁর সুবিধে-অসুবিধে, শারীরিক যাতনা, পরিস্থিতির খোঁজখবর নেওয়া। রাজমাতা সুভাষিণী সারাদিন ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অত্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন তাঁর। সুযোগ্য পুত্রর হাতে রাজ্যচালনার ভার বহুকাল আগেই ন্যস্ত হয়েছে। ইদানীং সে কিছুটা অসুস্থ। কিছুদিন আগে অপশক্তির প্রভাবে এক ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল গোটা রাজপরিবার সহ সমস্ত রাজ্য। কিন্তু এখন তো সবকিছুই শান্ত। যদিও একটা চোরা উত্তেজনা রয়েছে সকলের মনেই। রাজরানি সন্তানসম্ভবা। এই সপ্তাহের যে কোনোদিন রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হতে পারে। রাজমাতা নিজেও সেই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। অনেক রাতে ঘুম আসে নানান চিন্তায়। সদ্য ঘুমটা ধরেছিল এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। অবাক চোখে নিজের বিছানায় উঠে বসলেন রাজমাতা। এত রাতে তাঁর দরজায় কে? প্রহরীরা এমনি এমনি দরজায় তো ধাক্কা দেবে না। তাহলে কী কঙ্কাবতীর কিছু হল?

চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে ধড়ফড় করে বিছানা ত্যাগ করে দ্বারের আগল খুললেন রাজমাতা। আর খুলেই অবাক... দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং রানি কঙ্কাবতী! খাস দাসী মাদুরার কাঁধে ভর দিয়ে প্রবলভাবে হাঁপাচ্ছেন। বোঝাই যায় অল্প পথশ্রমেই ক্লান্ত। আতঙ্কিত রাজমাতা তাঁকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বসালেন। বোঝাই যাচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে প্রবল ভয় পেয়েছেন কঙ্কাবতী। অবচেতনে কয়েকমাস পূর্বের স্মৃতিটা মনে পড়তেই রাজমাতা কেঁপে উঠলেন মনে মনে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাস-দাসীকে পাঠিয়ে দিলেন রাজগুরু শম্ভুপাদকে ডেকে আনতে।

মাদুরা রাজমাতার কথা শুনে মাথা নীচু করে বিড়বিড় করে বলে উঠল, “আমি রাজরানিকে অনেক করে বারণ করেছিলাম রাজমাতা। কিন্তু উনি শোনেননি।”

— "কী হয়েছে কঙ্কাবতী? এতো ভয় পেয়েছ কেন?" রাজমাতার কণ্ঠে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

— "মা!" রানি কঙ্কাবতীর চোখে জল, "আমি এই মুহূর্তেই দেবী রঙ্কিনীর মন্দিরে যেতে চাই। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।"

— "কী বলছ এসব বউমা? এই অবস্থায়? এতো রাতে? এতটা পথ? তুমি কি ভুলে গিয়েছ মহর্ষির বিধান? কৃষ্ণাচতুর্দশীতে তোমার প্রাসাদের বাইরে পা রাখা বিপদজনক!"

— "আপনি বুঝতে পারছেন না মা। আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। একটি অন্ধকার গুহার মেঝেতে আমি মরে পড়ে আছি... আর!" থমকে গেলেন রাজরানি। সুভাষিণী দেবী প্রশ্ন করলেন, "আর কী বউমা?"

রাজমাতার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বিড়বিড় করে উঠলেন রাজরানি। "আর কেউ একজন আমার গর্ভ থেকে আমার সন্তানকে বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!" কথাটা বলতে বলতে এমনভাবে ভয়ে কেঁপে উঠলেন কঙ্কাবতী যে রাজমাতা সুভাষিণীও ভয় পেলেন। এসব কী অলুক্ষুণে স্বপ্ন! মনে মনে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমা হচ্ছে তাঁর।

— "জগন্নাথ কোথায়?"

— "উনি ঘুমোচ্ছেন।"

— "এ কী? ওকে না ডেকে তুমি একলা একলা চলে এলে? এটা ঠিক করলে না কঙ্কাবতী। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এভাবে..." রাজমাতার গলায় উষ্মা। "আমি এখনই প্রহরীদের পাঠাচ্ছি তাকে এখানে ডেকে আনার জন্য! তুমি শান্ত হও!"

কথাটা শুনেই আরও ভয় পেলেন রানি।

— "মা, উনি সারাদিনের পর এইটুকুই তো সময় পান বিশ্রামের জন্য। আমি আর তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। থাক, বরং আপনি পালকির ব্যবস্থা করতে বলুন। দেবীর দর্শন না করা পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না।"

অধর চেপে কী যেন ভাবলেন রাজমাতা। তারপর বললেন, "বেশ,

জগন্নাথকে ডাকবার প্রয়োজন নেই। তবে তোমায় মহর্ষির আসা পর্যন্ত অপেক্ষা...”

— “দেবী রঙ্কিনীর জয় হউক! রাজমাতার জয় হউক!” রাজামাতার কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্বারের প্রান্তে সেই দাসী এসে উপস্থিত হল যাকে সুভাষিণী দেবী পাঠিয়েছিলেন মহর্ষিকে ডেকে আনার জন্য।

— “মহর্ষি কই সুবলা? উনি কী পরে আসছেন?” রাজমাতা দাসীকে একলা দেখে অবাক হলেন।

— “ক্ষমা করবেন রাজমাতা। মহর্ষি শম্ভুপাদ মহলে নেই। উনি আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে একটু আগেই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছেন।”

(রাঢ় পিশাচিনী)

পনেরো জনের একটি দল গ্রাম থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটছে। তারা এত দ্রুত হাঁটছে যে দেখলে মনে হবে তারা ছুটছে। প্রত্যেকের শরীর কালো কাপড়ে ঢাকা। দলটির সামনের দিকেই যিনি আছেন তাঁর মুখে গাল ভর্তি পাকা দাড়ি। দলের মধ্যে সকলের থেকে বয়স্ক উনি। ওনার নাম সর্বেশ্বর রানা। বাগমারী জনপদের প্রধান উনি। তাঁর দুই হাতে কাপড়ের একটি পুঁটুলি। তিনি সেটা বুকের মধ্যে চেপে যত দ্রুত হাঁটা যায় ততো দ্রুত সামনের দিকে হেঁটে চলেছেন। দলের তিনজন হাতে মশাল নিয়ে ওঁর পিছন পিছন হাঁটছে। বাদবাকি জন কিছু অবোধ্য ভাষায় মন্ত্রপাঠ করার মত বিড়বিড় করে শব্দ উচ্চারণ করে চলেছে। ওদের গতিবিধি এই রাতের আঁধারে বড় রহস্যময়।

ওরা গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকক্ষণ আগে পূর্বদিকে রওনা হয়েছে। শালবনের ভেতর দিয়ে ওরা দ্রুত এগোচ্ছে সামনের দিকে। বনের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদের ভয় আছে কিন্তু সেই নিয়ে ওরা ভীত নয়। ওরা ভয় পাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। অমাবস্যার আগের রাত্রি বড় ভয়ংকর রাত্রি। এই রাত্রে সেই সব অপশক্তিরাও নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পায় যারা দেবী রঙ্কিনীর প্রভাবে

ক্ষমতাশূন্য। তার মধ্যে আবার আজকের দিনেই এমন একটা অঘটন ঘটল? এসবই ভাবছিলেন সর্বেশ্বর, ঠিক এমন সময় তারা একটা উঁচু ন্যাড়া টিলার পাদদেশে এসে পৌঁছোল। টিলার নীচে পৌঁছতেই ওদের চোখে মুখে এক অপার্থিব ভয় ফুটে উঠল। এমন সময় ওই পনেরো জনের দলের মধ্য হতে একটা কালো কাপড় ঢাকা শরীর অতি সন্তর্পণে ওই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। গোটা ব্যাপারটা এত সন্তর্পণে ঘটল যে দলের বাকি লোকজন বুঝতেই পারল না কখন তাদের দলের একজন সদস্য সরে পড়েছে। অথবা এমনও হতে পারে পরিবেশের ভয়াবহতায় ওরা সকলে এতোটাই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে এই সব ভাবনার কথা তাদের মাথাতেই আসেনি।

দলপতির নির্দেশে সেই দল ধীরে ধীরে টিলার ওপরে উঠতে লাগল। মশালের আলোগুলো যত উপরে উঠতে লাগল ততোই তাদের অবয়ব ছোট হয়ে আসতে লাগল।

ছয়াশরীরটির দৃষ্টি ওদের ওপর নিবন্ধ। দলটি ন্যাড়া টিলা বেয়ে ওপরে একটি নিরাপদ দূরত্বে উঠে গেলে ছায়াশরীরটি দ্রুত বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছায়াশরীর খুব তাড়াতাড়ি অথচ খুব সন্তর্পণে টিলাটির পাদদেশ বরাবর এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। পাদদেশের ভূমি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে ঢালু হয়ে এক গভীর গহ্বরের সৃষ্টি করেছে। টিলার একদম মাথায় উঠে নীচের দিকে তাকালে ওই গভীর অংশটাই নীচে থাকবে। কিন্তু নীচে কী আছে, তা প্রখর দিবালোকেও ওপর থেকে দেখা যায় না। এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কুজ্মটিকা সব সময় নীচের গভীর অংশে ঘূর্ণাবর্তের মতো পাক খেতে থাকে। দক্ষিণ দিকে যত এগিয়ে যায়, জমি তত অসমতল ও বন্ধুর। ছোট বড় এবড়ো-খেবড়ো পাথরে জায়গাটা ভয়ংকর। তারপরে আজ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আর সেই সঙ্গে কুয়াশার হালকা আস্তরণ। কুমিরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে থাকা পাথরের ওপরে পা হড়কে পরলেই হাড় ভেঙে চৌচির হবে। ছায়াশরীর অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে। মশালের আলো জ্বালানো যাবে না, জ্বালালেই মশালের আগুন ওপরের দলটির নজরে আসবে। অন্ধকারে

অন্য কেউ হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই দু'তিন বার আছাড় খেত কিন্তু ছায়াশরীর এই অন্ধকারেও এতো সুনিপুণভাবে একটার পর একটা তীক্ষ্ণ পাথরের ওপরে পা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলছে যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন নিশাচর শ্বাপদের মতো তার চোখ জ্বলছে। একটানা অনেকটা পথ নেমে এসেছে সে। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। একটু দাঁড়িয়ে শ্বাস নিলে বেশ হয়। কিন্তু এতো সময় কই? দলটি ইতিমধ্যেই টিলার চুড়োর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তাকে সময়ের আগেই নিজের জায়গাতে পৌঁছতে হবে নাহলে আজকের পুরো আয়োজন বৃথা হবে। দ্রুত পা চালাল সে। নিজের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করে সামনে এগোতে লাগল। যত নীচে নামছে ততো কুয়াশার আস্তরণ গাঢ় হয়ে পাথরের ওপরে চেপে বসছে যেন। প্রায় পৌঁছেই গিয়েছে। ঘাড় তুলে একবার ওপরের দিকে তাকাল ছায়াশরীর। ওই তো, ওই তো ওই দলটিও টিলার ওপরে পৌঁছে গিয়েছে। আর ঠিক এমন সময় পায়ের নীচে কী একটা জিনিস মড়মড় করে ভেঙে উঠল যেন তার।

চমকে উঠল ছায়াশরীর। ঝটপট ঝুঁকে জিনিসটা পায়ের তলা থেকে টেনে বের করে আনল সে। অন্ধকারে অনেকক্ষণ থাকলে চোখ সয়ে আসে আপনা থেকেই। এক্ষেত্রেও তাই হল। অন্ধকার ভেদ করে ছায়াশরীর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হাতে ধরা জিনিসটা আর কিছুই নয় একটা ছোট শিশুর মুন্ডুহীন কঙ্কাল। তার মধ্যে তখন মাংসরস লেগে জিনিসটা চটচটে হয়ে ছিল। চমকে উঠে জিনিসটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিল ছায়াশরীর। এই জায়গায় কোনো জীবিত মানুষের আশা একেবারেই নিষেধ। ভয়ংকর শাপিতভূমি এই জায়গাটি। নিষিদ্ধ বলেই এই জায়গায় কী আছে কেউ কখনও জানে না। ছায়াশরীরও আজ প্রথমবার এল। সেও এই জায়গার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

জিনিসটা যেই মুহূর্তে ছায়াশরীরটি দূরে ছুঁড়ে ফেলল সেই মুহূর্তেই কুয়াশার ঘন আস্তরণ ভেদ করে সমস্ত গভীর অংশটা কোনো এক অদৃশ্য মায়া বলে চোখের সামনে ফুটে উঠল। আর তা দেখার পরেই আতঙ্কের একটা শিহরণ খেলে গেল তার সমস্ত শরীর জুড়ে। পুরো উপত্যকা জুড়ে একাধিক নরকঙ্কালের স্তূপ। সাদা সাদা নরকঙ্কাল পাহাড়ের মতো কেউ স্তূপ করে

সাজিয়ে রেখেছে একাধিক জায়গায়। বলাই বাহুল্য, সব ক-টা কঙ্কাল মুণ্ডুবিহীন নবজাতকের।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

টিলার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আছেন সর্বেশ্বর রানা।

হু হু করে বইছে ঠান্ডা বাতাস। সর্বেশ্বরের লম্বা লম্বা দাড়ি-গোঁফ তাঁর গায়ে ঢাকা কালো চাদরের মতো পতপত করে উড়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মশালের আলো যে-কোনো মুহূর্তে নিবে যেতে পারে এমনই ভয়ংকর কনকনে হাওয়ার স্রোত। কিছুজন তখনও কাঁপতে কাঁপতে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে। কিন্তু তাদের ভয়ার্ত চোখের দৃষ্টি স্থির নয়। মাঝে মাঝেই তারা ইতিউতি তাকাচ্ছে। যেন তারা ভয় পাচ্ছে। কোনো ভয়ংকর কিছু যে-কোনো দিক হতে, যে-কোনও মুহূর্তে তাদের ওপরে যেন লাফিয়ে পড়তে পারে।

মন্ত্র পাঠ করতে করতেই আরেকজন বৃদ্ধ বর্গীয় ব্যক্তি সর্বেশ্বরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, "এই ভয়ংকর রাতে কীসের অপেক্ষা করছেন আপনি? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে চলুন। তাকে ক্ষুধার্ত রাখতে নেই।"

সর্বেশ্বর একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালেন। ভালো করে তাকাতে পারছেন না। ঠান্ডা হাওয়া চোখে সূঁচ ফোটাচ্ছে যেন। তিনি সম্মতির সুরে মাথা নাড়িয়ে বুকে চেপে ধরা কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলতে লাগলেন ধীরে ধীরে। কী আছে ওর মধ্যে? একটার পর একটা কাপড়ের ভাঁজ খুলে যাচ্ছে। যত ভাঁজ খুলছে, তত বেরিয়ে আসছে এক আঁশটে গন্ধ। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁপতে-থাকা মশালের আলোয় দেখা গেল কাপড়ের ভাঁজের আড়ালে রয়েছে সদ্য মৃত নবজাতকের দেহ। চোখ বন্ধ, মুখ হাঁ হয়ে আছে।

এ শিশুর মৃত্যু জন্মের পূর্বে মায়ের গর্ভে, সূর্যাস্তের পরে হয়েছে। তাই এই শিশু শাপগ্রস্ত। সাধারনভাবে এই শিশুকে কবর দেওয়া যাবে না। এই শিশু মড়ন্তিকার খাদ্য। মড়ন্তিকার উদ্দেশেই উৎসর্গ করতে হবে একে। প্রাচীন

রীতি হিসেবে এটাই নিয়ম। মড়ন্তিকা রাঢ়ভূমের প্রাচীন পিশাচিনী ও কল্লকেশীর অনুগামিনী। অসম্ভব শক্তিশালী কুহকিনী, মায়াবিনী সেই পিশাচিনীর অধিকার স্বয়ং দেবী রঙ্কিনীও খর্ব করতে পারেননি। দিনরাত্রির মতো চির সত্য হিসেবে তার অশুভ উপস্থিতি আঁকা রয়ে গিয়েছে সমগ্র ধলভূমগড় সাম্রাজ্যের ললাটে।

আজ ভয়ংকর শীতের রাত্রে তাই একদল প্রজা 'মরণমস্তক' টিলার শীর্ষে হাজির হয়েছে। সর্বেশ্বর রানা টিলার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে দুই হাতে করে মাথার ওপরে তুললেন। তারপর কী মনে হতেই একবার ঘুরে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালেন...

পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা বৃদ্ধটি তা দেখে সকলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠল, "মাথায় রেখো, উৎসর্গের পরেই আমরা ছুটে এই টিলা থেকে নেমে যাব। আর যা-ই হয়ে যাক, আমরা কেউই পিছন ফিরে তাকাব না।"

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না সর্বেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে দেবী রঙ্কিনীর নাম স্মরণ করেই মৃত শিশুটির দেহ টিলার ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলেই সকলের সাথে ছুট লাগালেন নীচের দিকে। তাঁর পেছনে পুরো দলটা। সেই ভয়ংকরী আসার আগেই তাঁদের এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। এটাই নিয়ম।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য দলপতির মনে হল টিলার ওপর থেকে শক্ত ভূমিতে আছাড় খাওয়ার কোনো শব্দ তো পাওয়া গেল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে তা তদন্ত করার সময় কই? পালাতে হবে... পালাতে।

ওদিকে টিলার নীচে ততক্ষণে ছায়াশরীরটি হাঁপাচ্ছে। তার দুই হাতের মধ্যে ধরা সেই ছোট্ট মৃত শরীরটি। অন্ধকারের মধ্যেও সে অসীম দক্ষতায় লুফে নিয়েছে সেই ছোট্ট নবজাতকের শরীর। না শরীরটিতে সে কোনো আঘাত লাগতে দেয়নি। আঘাত লাগলে যে এই মৃতদেহ বাতিল হয়ে যেত। পণ্ড হত আজকের পুরো শ্রম। কাজটা ভয়ংকর আর ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এইরকম ভয়ংকর কাজের জন্যই তো তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ছোটবেলা থেকেই।

পায়ের নীচে মচমচ করে উঠছে নবজাতকের হাড়গুলো। নাহ! আর

একমুহূর্ত এখানে না। প্রবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে সেই ভয়ংকরী যে-কোনো মুহূর্তে হাজির হবে এখানে। তার আগেই এই মৃত নবজাতকের অক্ষত দেহ নিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে। কিন্তু তার আগে আলোর দরকার। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সেই দলটিকে দেখল ছায়াশরীর। তারা অনেকটা দূরত্বে চলে গিয়েছে। এবার সে আলো জ্বলাতে পারে। পিঠে রাখা ঝোলা থেকে একটা লম্বা মশাল বের করে তাতে ঝটপট পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতেই জায়গাটা হলদে আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠল।

পিছু ঘুরল সেই ছায়াশরীর। কিন্তু ওটা কী? সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। অন্ধকার ফুঁড়ে জেগে উঠেছে তিন জোড়া জ্বলন্ত চোখ আর দু'পাটি করে ঝকঝকে দাঁতের সারি। এই তিন জোড়া চোখে যেন নরকের লকলকে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। ছায়াশরীর এদের ব্যাপারে শুনেছে। প্রত্যেক কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে কালগর্ভ থেকে এদের জাগিয়ে তোলে স্বয়ং মড়ন্তিকা। তিন নরমাংসলোভী অবিনাশী হায়না। একটা বিকট মাংসপচা বোঁটকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। এর অর্থ সে জানে। এদের পিছু পিছু মড়ন্তিকা আসছে। কিন্তু এসব নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই... তিনটি হায়না গনগনে চোখ আর ঝকঝকে দাঁতের সারি নিয়ে খুব সুনিপুণভাবে তিনদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে।

ছায়াশরীর দেরি না করে নবজাতকের শরীরখানা পিঠের সঙ্গে বাঁধা ঝোলার ভেতরে চালান করে দিল। এই দেহ তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। তারপর সে যেটা করল তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একটা লম্বা তীক্ষ্ণ বল্লম সে চাদরের আড়ালে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে, চোখের নিমেষে তা বের করে আনল। আর হাতের জ্বলতে-থাকা মশালটিকে পাথরে খাঁজে গুঁজে দু-হাতে বল্লমখানা চেপে ধরে টানটান সোজা হয়ে দাঁড়াল। তিনটে হায়না তাকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে বৃত্ত ছোট করছে ধীরে ধীরে। শিকারের লোভে ওদের মুখ থেকে নাল ঝরে পড়ছে।

ছায়া শরীর নিঃশ্বাস বন্ধ করে শক্ত হাতে বল্লমখানা চেপে ধরল। বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে তার। আর এমন সময় একটা হায়না লাফ

দিল তাকে লক্ষ্য করে। এক মুহূর্তে হাতে ধরা বল্লমের ওপরে শরীরের সমস্ত ভর রেখে দু-পা শূন্যে তুলে সেই হায়নার চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে এক লাথি চালাল সে। আচমকা জোর আঘাতে হায়নাটি ছিটকে পড়ল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলি ফেটে ফাঁক হয়ে গেল তার। সঙ্গীর এরকম করুণ পরিণতি দেখে আরেকটা হায়না যেই লাফ দিল ছায়াশরীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসতেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল হায়নাটার শরীর কিন্তু ততক্ষণে ছায়াশরীর হাতে ধরা বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলাটা তুলে ধরতেই লম্বালম্বি ফালাফালা হয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে গেল তার। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে মেঝের ওপর দ্বিতীয় হায়নাটির নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ল।

মশালের আলোটা প্রচণ্ড হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই ছায়াশরীরটা মশালের আলোয় অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালো কাপড়ে মুখ মাথা ঢাকা এক শরীর, যা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই সে নারী না পুরুষ। তবে পরনে রাজসৈনিকের পোশাক। সেই পোশাকও হায়নার রক্তে ভিজে সপসপ করছে।

এবার সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তৃতীয় হায়নার। সঙ্গীদের এমন পরিণতি দেখে রাগে আকাশ পানে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল সে। ভয়ংকর সেই চিৎকার শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। যোদ্ধা শক্ত হাতে বল্লমটা চেপে শেষ হায়নার মুখোমুখি দাঁড়াল। শেষ অবিনাশী হায়না! ঠোঁটের কোলে অল্প হাসি দেখা গেল কি সেই যোদ্ধার? যোদ্ধার বল্লমের তীক্ষ্ণ ফলার সামনে সকল জীবই মরণশীল।

আর ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটল। হঠাৎ মশালের হলদেটে আলোটা ধীরে ধীরে নীলচে হয়ে উঠতেই চমকে উঠল সেই যোদ্ধা। বিকট মাংস পচা গন্ধটা বাতাস ভারী করে তুলছে। একটা শিসের সুরের মতো সুর ভেসে আসছে দূরের অন্ধকার থেকে। ভারী অদ্ভুত এই শিসের সুর। দু'চোখের পাতা যেন আপনা থেকেই ভারী হয়ে আসছে যোদ্ধার। এ কি কোনো বশীকরণ মন্ত্র! নীলচে আলোয় সেই মুহূর্তেই যোদ্ধা দেখতে পেল নিথর দুটি

হায়নার দেহ আপনা থেকেই কেঁপে উঠছে।

এ কী? অবিশ্বাস্য! যোদ্ধা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দেখতে দেখতে সেই অকল্পনীয় ব্যাপারটা ঘটল যার জন্য সে একেবারেই তৈরি ছিল না। মৃত হায়না দুটো আবার বেঁচে উঠেছে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা। শুধু তাই নয় ফাটা খুলি আর ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়েই তারা পুনরায় আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে।

এবার? এবার কী করবে সে?

নীলচে মশালের আলোটা ধীরে ধীরে কেঁপে উঠল। আর সেই কাঁপতে-থাকা আলোর ভয়ংকর ভৌতিক পরিবেশে দেখা গেল কালো ধোঁয়ার আস্তরণ শরীরে জড়িয়ে এক ভয়ংকরী নারীশরীর তার আর হায়নাগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে।

এতো ভয়ংকর কাউকে ইতিপূর্বে দেখেনি যোদ্ধা। অচিরেই যেন তার পা-জোড়া কেঁপে উঠল। সেই ভয়ংকরীর শরীর বেশ লম্বা। মাথার চুলগুলো জটা পড়ে গিয়েছে। আর সেগুলো চুড়ো করে বাঁধা। দুই কান হায়নার কানের মত খাড়া। আধো-অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও তার হাত আর পা থেকে কালো কালো কাদার মতো থকথকে কিছু গড়িয়ে পড়ছিল। যোদ্ধা দেখল নারীর চোখ দুটোয় যেন সবুজ আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি করে। আর ঠোঁটের ফাঁকে জগতের যাবতীয় ক্রুরতা শঠতা এসে জড়ো হয়েছে একসাথে। এই হল ভয়ংকর পিশাচিনী মড়ন্তিকা!

সে যোদ্ধার দিকে বাম হাতটা বাড়িয়ে সাপের মতো হিসহিসে কণ্ঠে বলে উঠল, "তুমি আমার জিনিস নিয়ে কোথায় যাচ্ছ যোদ্ধা? জানো না, না বলে অন্যের জিনিস নেওয়াকে চুরি করা বলা হয়!"

যোদ্ধা কিছু না বলে ভয়ে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতেই মড়ন্তিকার চোখে মুখের ছদ্মভাবটা বদলে গেল প্রবল আক্রোশে, সে করাতের পাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি বের করে চিৎকার করে উঠল,

— "আমার জিনিস ফেরত দাও!..."

আর ঠিক তখনই জায়গাটা জুড়ে যেন একটা বজ্রনাদ হল, "তোমার

জিনিস? কোনটা তোমার জিনিস?...”

চমকে উঠল যোদ্ধা। চমকে উঠল ডাকিনী মড়ন্তিকা।

মহর্ষি শম্ভুপাদ! নীলচে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল কালো চাদর শরীরে জড়িয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো যোদ্ধার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মহর্ষি। কখন এলেন উনি?

— “শম্ভুপাদ!” মড়ন্তিকার দাঁতের ফাঁকে রাজগুরুর নাম প্রবল আক্রোশের সাথে উচ্চারিত হল। “ওই যে ওর পিঠের ঝোলায়। প্রাচীন সন্ধির নিয়ম অনুসারে টিলার ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটা নবজাতকের শরীর আমার খাদ্য! আশা করি সেটা ভুলে যাওনি!”

রাজগুরু এগিয়ে এসে যোদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন, “না। আমি কিছুই ভুলে যাইনি। তোমার স্মরণ করার জন্য পুরোটা বলি, কৃষ্ণপক্ষ তিথিতে কোনো শিশু যদি মায়ের গর্ভে মারা যায় তাহলে তাকে মরণমস্তক টিলার ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত করতে হবে। নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর তোমার অধিকার। কিন্তু নিয়মে এটাও স্পষ্ট লেখা আছে টিলার ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত নবজাতকের ভগ্ন বা থেঁতলে-যাওয়া দেহর উপরে মড়ন্তিকার অধিকার। কোনো অক্ষত দেহের ওপরে নয়।”

— “এবার বলতো, এই দেহ কি কোনোরকম ভাবেই ক্ষতপ্রাপ্ত হয়েছে?”

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোদ্ধার পিঠের পুঁটুলির ভেতর থেকে বের করে এনেছেন সেই নবজাতকের মৃতদেহ।

নীলচে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল মড়ন্তিকার বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ভয়ংকর মুখ। সে অবাক! কী করে সম্ভব! এত উঁচু থেকে পড়লে এর তো মাথা থেঁতলে গুড়িয়ে যাওয়ার কথা।

শম্ভুপাদের ঠোঁটের কোলে চতুর হাসি, “আমি জানি তুমি কী ভাবছ। কীভাবে সম্ভব! তাই তো? তাহলে শোনো, মাটিতে পড়বার আগেই একে লুফে নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তোমার গ্রাস থেকে বাঁচাতেই। এখন বলো তো, তুমি কি এই জিনিসের ওপরে আর দাবী করতে পারো?”

শেষের কথাটা শুনে প্রবল আক্রোশে চিৎকার করে উঠল মড়ন্তিকা,

"তোদের দুটোকে আমি শেষ করে ফেলব। খল ব্রাহ্মণ!"

কথাটা বলেই আবার করাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত আর ভয়ংকর বাঁকা নখ বের করে যেই তেড়ে এল মড়ন্তিকা, ওমনি গায়ের কালো চাদর মাটিতে ফেলে কোমরবন্ধ থেকে দেবী রঙ্কিনীর খড়গ বের করে গগণবিদারী শব্দে চিৎকার করে উঠলেন শম্ভুপাদ, "জয় দেবী রঙ্কিনীর জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল সাদা আলোর বিস্ফোরণ আর শোঁ শোঁ করে গরম হাওয়ার স্রোত বয়ে গেল জায়গাটা জুড়ে। আর বহুদূরে ছিটকে পড়ল মড়ন্তিকা। গোটা ব্যাপারটাই এত দ্রুত ঘটল যে যোদ্ধা পুরো বিহ্বল হয়ে গেল। গর্জে উঠল মড়ন্তিকার হায়নারা। কিন্তু রঙ্কিনীর খড়গ দেখে কেউ আর এগোনোর সাহস পেল না। দাঁতের ফাঁক দিয়ে এক চাপা গর্জন বেরিয়ে আসছে তার।

— "দেবী রঙ্কিনী তোর অধিকারে বাধা দেননি। কিন্তু তার বেশি এগোনোর চেষ্টাও করিস না। নাহলে দেবীর প্রকোপে সমূলে বিনাশ হবে তোর।" গর্জে উঠলেন শম্ভুপাদ।

উঠে দাঁড়াল মড়ন্তিকা, চোখে মুখে প্রবল জিঘাংসা। নারকীয় হাসি হেসে বলল সে, "দেবীর প্রকোপ? দেবীর প্রকোপ? সেটা আর কতদিন থাকে দেখা যাক। তুই ভুলে যাচ্ছিস তোর রাজা নিজের হাতে দেবীর অঙ্গচ্ছেদ করেছেন।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কুটিল হাসিতে ভরে উঠল জায়গাটা। আর তারপরের যেমন মুহূর্তে সেখানে হাজির হয়েছিল তেমন মুহূর্তেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মড়ন্তিকার কালো অবয়ব।

মশালের আলো ফের হলুদ হয়ে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে লাগল। শম্ভুপাদের একহাতে তখন দেবী রঙ্কিনীর খড়গ আর অন্যহাতে মৃত নবজাতকের অক্ষত শরীর ধরা ছিল। কিন্তু কপালের ভাঁজ বারবার এটা বোঝাচ্ছিল শম্ভুপাদ কিছু নিয়ে চিন্তায় আছেন। ভয়ংকর চিন্তায়।

মড়ন্তিকা আর তাঁর অবিনাশী কালগর্ভ থেকে জেগে-ওঠা হায়নারা বিদায় নিতেই যোদ্ধা মাথার উড়নিটা টান মেরে খুলে দিল। আর খুলে দিতেই এক অতীব সুন্দরী রমণীর মুখ ভেসে উঠল আধো অন্ধকার প্রেক্ষাপটে, "কী

হয়েছে বাবা? কী ভাবছেন?"

হ্যাঁ, এই মেয়ে যে এতক্ষণ এই ভয়ংকর দুঃসাধ্য কাজে নিজেকে অর্পণ করেছিল সে আর কেউ নয় সময় মহর্ষি শম্ভুপাদের পালিতা কন্যা, লল্লটা। অসীম সাহসী আর অত্যন্ত পরাক্রমী এই কন্যা সমগ্র ধলভূমগড়ের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের একজন। মেয়ের কথায় মহর্ষির ঘোর ভাঙল, সত্যি তাঁর চোখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমা হচ্ছে ধীরে ধীরে, তিনি মেয়ের হাতে রঙ্কিনী দেবীর খড়গ তুলে দিয়ে বললেন, "এটা কুলদেবীর সিংহাসনে রেখে দিও।"

— "আপনি এত রাতে কোথায় যাবেন? প্রাসাদে ফিরবেন না?" লল্লটার দুই চোখে দুশ্চিন্তা।

"আমায় এই মৃত অক্ষত শিশু নিয়ে প্রেতপর্বতে যেতে হবে। এর বিনিময়ে আমার ওদের থেকে কিছু জানাটা ভীষণ দরকার। ভীষণ!"

লল্লটা কিছু বলতে চাইল কিন্তু মহর্ষি তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "এখন কোনো প্রশ্ন নয়। এই মুহূর্তেই আমরা এই স্থান ত্যাগ করব। তুমি প্রাসাদে ফিরবে আর আমি ওদের কাছে যাব। ভয়ংকর কিছু আসতে চলেছে লল্লটা। খুব ভয়ংকর কিছু। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের তৈরি থাকতে হবে। নাহলে ভয়ংকর বিপদ!"

(নিদ্রাকাল)

অন্ধকার রাত্রে মহর্ষি শম্ভুপাদের কালো ঘোড়া যেখানে এসে থামল সেটাকে একটা উঁচু টিলার পাদদেশ বলা চলে। অন্ধকারে বেশিদূর চোখ চলে না তাই মহর্ষি একহাতে ঘোড়ার লাগাম, আর অন্যহাতে জ্বলন্ত মশাল ধরে এনেছেন। পিঠের পুঁটুলিতে আছে সেই অক্ষত নবজাতকের মৃতদেহ। একদিকে সুবর্ণরেখা বয়ে চলছে। এই দিকে জনবসতি একেবারেই শূন্য কারণ রাজ্যের পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলির অন্যতম হল এই জায়গাটা। এখানে সাধারণের প্রবেশ বহু আগে থেকেই নিষিদ্ধ।

ঘোড়ার লাগামটা কাছাকাছি একটি বাবলা গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে চারিদিকে চোখ ফেরালেন মহর্ষি। অন্ধকারে বেশিদূর দেখা যায় না। নইলে চতুর্দিকে ধু ধু বিস্তীর্ণ রুক্ষ জমি। দু-একটা বাবলা গোত্রীয় কাঁটা গাছ চোখে পড়লেও তা সংখ্যায় খুব কম।

সামনের উঁচু পাথুরে টিলার চূড়ার দিকে তাকালেন মহর্ষি। এটাই প্রেতপর্বত। নামে পর্বত হলেও এটা আদতে পাথুরে টিলা। এই টিলার চূড়ায় এক ভাঙা আশ্রম আছে যেখানে শতবর্ষ ধরে প্রেতসাধক গুণীনেরা বসবাস করছে। ক্রুর, শঠ, লোভী এই গুণীনরা নরকের জীবের থেকেও ঘৃণ্য। এরা জ্যোতিষ গণনায় অমোঘ, কিন্তু তার বিনিময়ে এদের তুষ্ট করতে হয় খুব দামি কোনো উপহার দিয়ে।

এরা ভয়ংকর পাপী, স্বার্থান্বেষী। কিন্তু শম্ভুপাদের আজ এদের ভীষণভাবে দরকার। যে স্বপ্ন তাঁকে বিগত কয়েকমাস ঘুমোতে পর্যন্ত দেয়নি, সেই স্বপ্ন, যা বারবার ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত বারবার দিচ্ছে তাঁকে, সেই স্বপ্নের অর্থ একমাত্র এরা নিরূপণ করতে পারে।

একপাশে আলগা পাথর দিয়ে পাকদণ্ডীর আকারে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। এই পথ বেয়েই ওপরে উঠতে হবে। পিঠে ঝোলাটা ভালো করে এঁটে একহাতে মশাল নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে লাগলেন তিনি। বেশ অনেকক্ষণ পরে আশ্রমের ভগ্ন সদর দরজার কাছে আসতেই হাঁপাতে লাগলেন উনি। বয়স শরীরে থাবা মারছে। শুধুমাত্র অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তা তিনি বুঝতে দেন না।

ঠিক এমন সময় আশ্রমের ভাঙা দরজার ওপারে ঘড়ঘড় একটা শব্দ হতেই শম্ভুপাদ মুখ তুলে তাকালেন। দরজা খুলছে ধীরে ধীরে।

এই টিলা প্রেত সাধকদের বাসভূমি। আর এই টিলায় কেউ পা রাখলেই ওরা আগে থেকে বুঝতে পেরে যায়। এতই ক্ষমতা ওদের।

দরজাটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে। সেই ফাঁকে মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো উলঙ্গ শরীর। চোখে তাদের নরকের ক্রুরতা। সারা শরীরে ঘা, পুঁজ, খোস পাঁচড়া। দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ, মাড়ি কালো। নখগুলো এতো বড় যে বেঁকে

গিয়েছে।

তাদের মধ্যে একজন খনখনে গলায় বলে উঠল, ‘‘এসো, শম্ভুপাদ। আমরা তোমারই অপেক্ষা করছি। কিন্তু দ্বারপ্রবেশের মূল্য কী?’’

শম্ভুপাদের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। লোভী পিশাচের দল! পিঠের ঝোলা থেকে নবজাতক শিশুর মৃতদেহ বের করে ওদের সামনে তুলে ধরলেন মহর্ষি।

‘‘জগতের সব থেকে দুর্মূল্য জিনিস। মড়ন্তিকার মুখের গ্রাস!’’

কিছুক্ষণ পরে আশ্রমের ভাঙা উঠোনে মহর্ষিকে দেখা গেল হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে। চারদিকে মশালের ক্ষীণ আলো জ্বলছে। মহর্ষির হাত সামনের দিকে বিন্যস্ত। সেই হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে একটি মাটির সরায়। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গোটা তিরিশের প্রেতসাধক গুণীন। প্রত্যেকের চোখ লোভে চকচক করছে। প্রত্যেকের শরীর থেকেই শয়তানের গন্ধ।

শম্ভুপাদ চিৎকার করে উঠলেন, ‘‘মড়ন্তিকা কেন বলল দেবীর ক্ষমতা আর কিছুদিনের? কী হতে চলেছে?’’

শম্ভুপাদ প্রশ্ন করলেন বটে। কিন্তু তিনি জানেন এরা এখন কোনো উত্তর দেবে না।

দেখতে দেখতে মহর্ষির রক্তে সরাটা কিছু ভরতি হলে একজন প্রেতসাধক এসে কাঁপা-কাঁপা হাতে সরাটা তুলে নিলো। তারপর সেই সরাটা পরপর হাতবদল হতে লাগল। ওরা সকলেই শম্ভুপাদের রক্তটা একে একে এক চুমুক করে খাচ্ছে।

সকলের খাওয়া শেষ হলে সেই প্রেত সাধকদের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল নরকের ক্রুরতা।

শম্ভুপাদ ফের চিৎকার করে উঠলেন, ‘‘বলো, কী বিপদ আসতে চলেছে রাঢ়ভূম জুড়ে। বলো। চুপ থেকো না।’’

শম্ভুপাদের প্রশ্ন শুনে তাদের মধ্যে একজন ভয়ংকর চিৎকার করে বলে উঠল, ‘‘রঙ্কিনীর অঙ্গহানি হয়েছে রাজরক্ত দ্বারা। দেবীর জিহ্বা ছিন্ন হয়েছে মূর্তি থেকে। দেবীমূর্তি শক্তিহীন হয়ে পড়বে আগত পূর্ণিমাতেই। পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিচ্ছবি সুবর্ণরেখার বুকে ফুটে উঠলেই দেবী শক্তি সংগ্রহের জন্য

নিদ্রাকালে নিযুক্ত হবেন। শক্তিহীন হয়ে পড়বে রাজ্যের নিরাপত্তাবলয়। জেগে উঠবে সমস্ত অশুভ শক্তি। তারা দেবীর জিহ্বা নিবেদন করবে শয়তানের পায়ে। জেগে উঠবে কল্লকেশী। বিনাশ হবে ধলভূমগড়ের। বিনষ্ট হবে সৃষ্টি।"

আতঙ্কে শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠলেন শম্ভুপাদ, "উপায়? উপায় কী? উপায় বলো তোমরা!"

আবার সেই দশজন প্রেতসাধকের সমস্বর গর্জনে কেঁপে উঠল মন্দির প্রাঙ্গণ।

— "শক্তি অঙ্গকে বাঁচাতে হলে নিদ্রাকালের আগেই গর্ভপ্রাচীরের বেষ্টনী বানা। যত বেশি গর্ভ বেষ্টনী তত বেশি সুরক্ষা। তবেই বাঁচবি তোরা।"

— "আর স্বপ্নে যে দেখি রাজা দেবীর গর্ভ বিদীর্ণ করছেন। তা কেন?"

— "দু-ফোঁটা রক্তের বন্ধনে শয়তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজা। এর অর্থ তুইও জানিস শম্ভুপাদ। রঙ্কিনী হলেন স্বয়ং প্রকৃতিশক্তি। আর তাঁর গর্ভজ সন্তান হলি তোরা। প্রসবের আগেই গর্ভ বিদীর্ণ করার অর্থ সময়ের আগেই তোদের গিলে খাবে সে। এই স্বপ্ন তোদের বিনাশের ইঙ্গিত। দেবী তোদের বিনাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

— "সে? সে মানে কে?" ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল শম্ভুপাদের চোখ জোড়া।

শভুপাদের প্রশ্ন শুনে কুটিল হাসি খেলে গেল তাদের মুখে। তারা গলার স্বর পালটে ফিসফিস করে বলে উঠল,

— "রাজার বুকের ক্ষতর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে যে।
নিদ্রাকালের আসলে সময় উঠবে জেগে সে।। "

* * * * * * * *

ধলভূমগড় রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কালো মেঘটা। এমন সময়ে মেঘের ঘনঘটা এই অঞ্চলে বড়ই বিসদৃশ। রাজকন্যা শিবদ্যুতি নরম বিছানায় দেবশিশুর মতো শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। রাণী

কঙ্কাবতী সদ্যস্নান সেরে ঘরের পশ্চিম দিকের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের দৃষ্টি সুদূরের পাহাড়ের সারির ওপরে ন্যস্ত হলেও দুই চোখে তাঁর দুশ্চিন্তার ঘনঘটা।

এই ঘরটি সম্পূর্ণ নতুন। মহর্ষির বিধান, নয় দিনের জন্ম অশৌচ পালনের পর রাজকন্যার সাত মাস বয়স না হওয়া অবধি কঙ্কাবতী এই নতুন ঘরেই থাকবেন। রাজমাতা সহ রাজরানি নিজে পুরো ব্যাপারে অবাক হয়েছেন কিন্তু মহর্ষির বিধানের ওপরে কেউ কথা বলেননি। রাজা জগন্নাথদেব মেয়েকে চাইলে দর্শন করতে পারেন কিন্তু এই ঘরে থাকতে পারবেন না। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছেন রানি কঙ্কাবতী। মহর্ষি নিজের আসার সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন মদুরাকে দিয়ে। তাঁর নিজেরও অনেক কিছু বলবার আছে মহর্ষিকে। আঁতুড়ে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ। তাই মহর্ষি চাইলেও কঙ্কাবতীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। কিন্তু আজ অশৌচমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষি দেখা করতে চেয়েছেন। কী বলবেন উনি? এই সবই সাত-পাঁচ ভাবছিলেন কঙ্কাবতী, এমন সময় দরজার প্রান্ত হতে ভেসে এল মহর্ষির জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর,

— "মা রঙ্কিনীর জয় হোক!"

মহর্ষি এসেছেন। রানি কঙ্কাবতী নিজের বিহ্বলভাব ত্যাগ করে মহর্ষির দিকে ফিরতেই চমকে উঠলেন। এ কাকে দেখছেন কঙ্কাবতী, মহর্ষিকে যে চেনা যাচ্ছে না!

শরীর ভেঙে গিয়েছে তাঁর। চোখের নীচে কালি, চোয়ালের, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন অনিদ্রা আর অভুক্ত থাকার ফল।

রানি বিস্মিতভাবে নতজানু হয়ে মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। "আয়ুষ্মতী ভব! দেবীর করুণা সর্বদা আপনার ওপরে পড়তে থাকুক মহারানি।"

— "এ আপনার কী অবস্থা হয়েছে গুরুদেব?" শঙ্কা ঝরে পড়ল রানি কঙ্কাবতীর কণ্ঠে। "আপনি কি অসুস্থ? তাহলে মদুরাকে দিয়ে একবার খবর পাঠালে আমিই পৌঁছে যেতাম আপনার কাছে।"

— "চিন্তা করবেন না দেবী!" শম্ভুপাদের ঠোঁটের কোলে স্মিত হাসি,

"আমি ঠিক আছি। কিন্তু রাজকন্যা কই?"

দুশ্চিন্তার মেঘ সরল না কঙ্কাবতীর দু'চোখ হতে, বিছানার ওপর ঘুমিয়ে থাকা শিশুকন্যাকে ইঙ্গিত করতেই মহর্ষি সরে এলেন রাজকন্যার দিকে। কন্যার কপালে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে দেবীমন্ত্র পাঠ করলেন মহর্ষি।

— "আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, ও যাতে সুস্থ থাকে।"

— "আপনার কন্যা স্বয়ং মা রঙ্কিনীর আশীর্বাদধন্যা। তাঁকে আশীর্বাদ করি আমার সে সাধ্য কই! তবে ওকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য! এবার বলুন তো, সেদিন রাতে আপনি স্বপ্নে কী এমন দেখেছিলেন, যার জন্য আপনাকে এত ঝুঁকি নিয়ে সেই রাত্রেই মহল ত্যাগ করে রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরে যেতে হয়েছিল?"

কঙ্কাবতী একবার দরজার দিকে তাকালেন। শম্ভুপাদ স্পষ্ট দেখলেন, কঙ্কাবতীর চোখে মুখে এক ভয় ফুটে উঠল।

— "আপনাকে আমার অনেক কথা বলার আছে মহর্ষি।" কিছুক্ষণ থামলেন রানি। হয়তো মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছেন কীভাবে কথাটা বলবেন, "ইদানীং আপনি রাজামশাইয়ের হাবভাব লক্ষ করেছেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন মহারাজ আর আগের মহারাজ নেই। ওনার হাবেভাবে এক ক্রূরতা, হিংস্র মনোভাব সব সময় ফুটে ওঠে। যে মহারাজের চোখে সবসময় সকলের জন্য বাৎসল্য ও প্রেম থাকত তাঁর চোখে আমি যেন শয়তানের আভাস দেখতে পাই আজকাল। বড় অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। আজকাল আমার বড় ভয় হয় ওঁর সঙ্গে থাকতে। এই পৃথক ঘরে আমায় রেখে আপনি আমার বড় উপকার করলেন মহর্ষি।"

— "যে মানুষটা সারাদিন প্রজার মঙ্গলের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন, কিছুদিন আগেও দেখেছি সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, আর সারারাত্রি চাপা হুঙ্কার দিতে দিতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অশরীরী প্রেতাত্মার মতো। তারপর মাঝে মাঝেই রাত বিরেতে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছেন। ফিরছেন ভোর রাতে সারা পোশাকে কাঁচা রক্ত মেখে। দিনদিন

এগুলো তো আরও প্রকট হচ্ছে।” একটানা কথা বলে চলছেন রানি কঙ্কাবতী।

— “দাসীদের মুখে খবর পেয়েছি উনি আজকাল নাকি স্নান করেন না। কাপড় ছাড়েন না। বাসি, নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার দিতে বলেন পরিচারিকা, দাসীদের...। আর যেখানেই পারছেন ঘরের দেওয়াল মেঝে পালঙ্কর সব জায়গায় একটাই নকশা আঁক কেটে চলছেন প্রতিক্ষণ। সেই নকশা যা তাঁর বুকে আঁকা আছে। একটা চতুর্ভুজ, একটা ত্রিভুজ, আর তার মাঝে একটা বৃত্ত। আমার ভীষণ ভয় লাগছে মহর্ষি। আচ্ছা! এগুলো কি কোনো মানসিক ব্যাধি, নাকি অন্য ভয়ংকর কিছু?”

শম্ভুপাদ দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকটা ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারেননি। স্নান না করা, দিনের আলোয় না বেরোনো, কেশহীন হওয়া, বাসি খাবারের প্রতি আসক্তি, আর সারাদিন একটি বিশেষ নকশা এঁকে চলা। সব ইঙ্গিত একটি নির্দিষ্ট দিকেই ইঙ্গিত করছে... সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল প্রেত সাধকদের বলা শেষ কথা,

'রাজার বুকের ক্ষতের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে যে।
নিদ্রাকালের আসলে সময় উঠবে জেগে সে।।'

মনে মনে কেঁপে উঠলেন শম্ভুপাদ! সর্বনাশ!

নিজের গলা যথাসম্ভব স্থির করে তিনি বলে উঠলেন, “আপনি বললেন না, সেদিন স্বপ্নে কী দেখেছিলেন যে আপনি আমার বারণ সত্ত্বেও সেই রাত্রেই রঙ্কিনী মাতার মন্দিরে ছুটে গিয়েছিলেন?”

— “আমি পুরোটা রাজমাতাকে বলিনি কারণ জানি উনি বিশ্বাস করবেন না। উনি পুত্রস্নেহে অন্ধ। আমায় ভুল বুঝতে পারেন। সেদিন আমি দেখেছিলাম আমি একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছি। আর রাজামশাই আমার গর্ভ বিদীর্ণ করে আমার গর্ভজ সন্তানকে টেনে বের খাচ্ছেন... তাঁর সারা মুখে কালো রক্ত আর কাঁচা মাংস।” কথাটা বলতে বলতে শিউরে উঠলেন কঙ্কাবতী।

— “কিন্তু তাই বলে রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরেই কেন?”

— "ঠিক মনে নেই, তবে আমি বোধ হয় স্বপ্নে একজন কাউকে দেখেছিলাম যিনি এক হাতে রঙ্কিনী দেবীর খড়গ আর আর এক হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সেই গুহায় আমায় রক্ষা করতে এসেছিলেন। কে এসেছিলেন মুখটা মনে ছিল না। শুধু মনে ছিল মশালের আলোয় চকচক করতে থাকা মায়ের সোনার খড়গ। তাই সেই রাত্রেই আমি রাজমাতাকে রাজি করিয়ে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিই। কেন জানি না আমার বারবার মনে হচ্ছিল দেবী বোধ হয় ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন এই মহলে আমি, আমার সন্তান কেউই সুরক্ষিত নই। বারবার মনে হচ্ছিল মা যেন আমায় নিজের কাছে ডাকছেন। আর দেখুন কী আশ্চর্যের ঘটনা! এত দুর্গম পথ পার হয়ে যা হল না মন্দির গর্ভে পা দেওয়া মাত্রই তাই হল। আমি প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলাম আর সেখানেই আমি রাজকন্যার জন্ম দিলাম।"

মহর্ষি শম্ভুপাদের চোখের ভ্রূকুটি আরও দৃঢ় হল। কী আশ্চর্য সমাপতন তাই না? যেই স্বপ্ন তিনি দীর্ঘ কয়েক মাস দেখে আসছেন সেই একই স্বপ্ন রানি কঙ্কাবতীও দেখেলেন সেই রাত্রে। এটা কি কোনো যোগসূত্র দিচ্ছেন মা রঙ্কিনী? মা কি চাইছেন যে ভয়ংকর বিপদ আসতে চলেছে সমস্ত ধলভূমগড় জুড়ে তা প্রতিরোধ করতে রানি কঙ্কাবতীও তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিক?

বেশ মায়ের যদি তাই ইচ্ছে হয় তাহলে তাই হবে।

রানি কঙ্কাবতী বলে উঠলেন, "আমার মনে শুধু আক্ষেপ একটাই, আমার জন্য মাতৃমন্দির অশুচি হল।"

মহর্ষি শম্ভুপাদ স্মিত হেসে বলে উঠলেন, "মহারানি, জাগতিক যা কিছু ভালো কাজ, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সন্তানের জন্ম দেওয়া। স্বয়ং দেবী সকলের আদিমাতা। আর এই পৃথিবী তাঁর গর্ভ। এই পৃথিবীতে যা কিছু উৎপন্ন হয় সবই দেবীর গর্ভজাত। তেমন ভাবে দেখতে গেলে সমস্ত পৃথিবীই আদিকাল থেকে অশুচি ছিল আর সময়ের শেষ পর্যন্ত অশুচি থাকবে। আপনি সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণের। জন্ম দিয়েছেন একটি জীবনকে। এ যে বড় পূণ্য শক্তি মহারানি! এই শক্তি শত শত অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। আর দেবী তো নিজেই একজন মাতা। মায়ের কোল তো কখনওই

অশুচি হয় না তাঁর সন্তানের জন্য।”

কিছুক্ষণ থামলেন শম্ভুপাদ, একটা অস্থিরতা চলছে তাঁর মনের গহীনে। তিনি গলার স্বর শান্ত করে বলে উঠলেন, “মহারানি আপনার সন্দেহ একদম ঠিক। মহারাজ জগন্নাথদেব আর আগের জগন্নাথদেব নেই। কয়েকমাস আগে ঘটে যাওয়া সেই ভয়ংকর ঘটনায় রাজামশাই দু-ফোঁটা রক্তবন্ধনে যুক্ত হয়েছেন শয়তান প্রভু কল্লকেশীর সঙ্গে। আর না চেয়েও শয়তান প্রভুর কিছু আসুরিক অংশ সেই রক্তবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে গিয়েছে রাজামশায়ের সাথে। উনি এখন যা করছেন তা সেই আসুরিক অপশক্তির প্রভাবেই করছেন। আর যদি খুব তাড়াতাড়ি কোনো পদক্ষেপ আমরা না নিই, তাহলে সমগ্র রাজ্য জুড়ে প্রলয় নেমে আসবে। কারণ আসছে পূর্ণিমাতেই দেবী রঙ্কিনী এক পক্ষকালের জন্য নিদ্রাযোগে চলে যাবেন। শক্তিহীন হয়ে যাবে রাজ্যের ওপরে-থাকা দেবীর আশীর্বাদ। এতদিনকার ঘুমিয়ে-থাকা ভয়ংকর অপশক্তিরা এক এক করে জেগে উঠবে। আর একবার সেই অপশক্তিরা জেগে উঠলে ছলে-বলে-কৌশলে ওরা রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা নিয়ে জাগিয়ে তুলবে শয়তান প্রভু কল্লকেশীকে। আর বলতে দ্বিধা নেই এসব অপকর্মে হয়তো নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং রাজা জগন্নাথদেব।”

রানি কঙ্কাবতীর ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না উনি। কিন্তু মহর্ষি তো মিথ্যে বলবেন না। আর তিনি নিজেও তো বারবার বুঝেছেন জগন্নাথদেবের মধ্যে কিছু জিনিস আলাদা আছেই। সব কিছু তো মিথ্যে হতে পারে না একসঙ্গে।

মহারানি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “তাহলে উপায়? কী করলে এই মহাপ্রলয় আটকানো...”

— “একটা উপায় পেয়েছি। তার প্রচেষ্টাতেই এতদিন নাওয়া খাওয়া ভুলে লেগেছিলাম। আমাদের হাতে সময় একদম নেই মহারানি। আজ মধ্যরাত্রে ঠাকুরঘরের সামনে আমি আপনার অপেক্ষা করব। তবে দেখবেন ভুলেও এ খবর রাজামশায়ের কানে না ওঠে।”

মহারানির চোখে জল। তিনি মৃদু স্বরে বলে উঠলেন, “আমার মতো

অভাগী পত্নী, অভাগী মা বোধ হয় জগতে আর কেউ নেই, তাই নির্লজ্জের মতো একটা প্রশ্ন করছি আপনাকে, রাজামশাই আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করবেন না তো?"

— "জানি না দেবী।" মহর্ষির চোখের দৃষ্টি দূরের বনভূমির ওপারে চলে গিয়েছে। তিনি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "মা রঙ্কিনীর কী ইচ্ছা, আমার জানা নেই। তবে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। রাজামশাইয়ের থেকে বিপদ জেনেই এই ঘরের চৌকাঠে মায়ের আশীর্বাদী সিঁদুরের প্রলেপ দেওয়া আছে। খেয়াল রাখবেন রাজকন্যা কোনভাবেই যেন এই ঘরের বাইরে না বের হন।"

(গর্ভপ্রাচীর)

দক্ষিণদিকের বারান্দাটা মোটামুটি অন্ধকার। আকাশ মেঘলা তাই চাঁদের দেখা নেই।

অগ্নিকুণ্ডের দেওয়ালের গায়ে মশালের আলো বারান্দার মেঝের ওপর একটা হলদেটে আভা তৈরি করছে।

মহর্ষি শম্ভুপাদ এই দিকের সমস্ত প্রহরীদের চলে যেতে নির্দেশ দেওয়ায় বারান্দা এই মুহূর্তে খালিই বলা চলে। ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মহর্ষি শম্ভুপাদ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বারান্দা শেষ প্রান্তের দিকে বারবার দেখছেন। রানি কঙ্কাবতী এত দেরি করছেন কেন? দেবীগৃহের দ্বার রুদ্ধ। হিসেব অনুযায়ী রানির এতক্ষণে চলে আসার কথা। কিন্তু...

ঠিক এমন সময় বারান্দার শেষ প্রান্তে নূপুরের ধ্বনি বেজে উঠতেই চমকে উঠলেন মহর্ষি। বারান্দার শেষ প্রান্তে আলো জ্বলছে না। অন্ধকার। কিন্তু মহর্ষি বুঝতে পারছেন অন্ধকার গায়ে মেখে একটা ছায়াশরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন ওনার দিকে।

— "প্রণাম মহর্ষি।" রানি কঙ্কাবতীর রিনরিনে স্বর ছড়িয়ে পড়তেই মহর্ষি বলে উঠলেন, "আয়ুষ্মতী ভব! কী ব্যাপার দেবী দেরী হল? সব কিছু ঠিক আছে তো?"

— "রাজকন্যা ঘুমোতে দেরি করছিল। শেষে বাধ্য হয়ে মদুরাকে ওর কাছে রেখে আসতে হল।"

মহর্ষির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল। "আপনি যে এখানে আসছেন তা দাসী জানে?" শম্ভুপাদের কণ্ঠে উষ্মা। তিনি কঙ্কাবতীকে বারণ করেছিলেন এই কথা তৃতীয় ব্যক্তির কানে যেন না যায়।

— "না। মদুরা জানে আমি রাজমাতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি..."

কথা শেষ হল না তার আগেই চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল বন্ধ দ্বারের ওপার থেকে। চমকে উঠলেন মহারানি কঙ্কাবতী।

— "এ কোনো মহিলার স্বর না? এতো রাত্রে ঠাকুর ঘরে কে আছে?" ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক রানির মুখ দিয়ে যেন কথা সরছে না।

— "আপনি শান্ত হন মহারানি।" মহর্ষি শম্ভুপাদের কণ্ঠে আশ্চর্য শীতলতা, "আপনাকে সকালেই বলেছি এক মহাপ্রলয় সমগ্র ধলভূমগড় জুড়ে নামতে চলেছে। তাকে আটকানোর একটা উপায় পেয়েছি অনেক সাধ্যসাধনাতে।"

— "কী সেই উপায় মহর্ষি?" অজানা উত্তেজনায় রানির বুকের ভেতরটা ওঠা-নামা করছে।

— "মহারাজ নিজের হাতে দেবীর শক্তিঅঙ্গ ছেদ করেছিলেন। বিগ্রহ থেকে শক্তিঅঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু না হলেও দেবীর ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় হতে শুরু হয়। দেবী তাই নিজের পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসবার জন্য এক পক্ষের জন্য নিদ্রাকালে শায়িত হবেন আগামী পূর্ণিমায়। পূর্ণিমার মধ্যরাত্রি একটি বিরল ক্ষণ যা একশ বছরে একবার আসে। এই সময় পূর্ণিমা আর ফাল্গুনী নক্ষত্রকে উত্তর কোণে রেখে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে। এই নিদ্রাকাল শুরু হতেই দেবীর বিগ্রহ শক্তিশূন্য হবে। শূন্য হবে শক্তিঅঙ্গের ক্ষমতাও। শক্তিঅঙ্গের ক্ষমতা শূন্য হওয়ার থেকে আটকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই, তবে তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। আর তা রক্ষা করতে

যা প্রয়োজনীয়, তা হল দেবীর জিহ্বাকে গর্ভপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করা।"

— "কী! গর্ভপ্রাচীর?"

— "হ্যাঁ! এটা প্রাচীন যুগের অত্যন্ত গূঢ় আর গুপ্ত শাক্ততন্ত্রের একটি শক্তিশালী ক্রিয়া। এই জিনিসটি কী আর কীভাবে কাজ করবে তা জানার জন্য আমায় বিস্তর কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। গর্ভের প্রাচীর দ্বারা যে জিনিসকে আমরা বেষ্টন করতে চাই, তাঁকে মাঝে রেখে একাধিক গর্ভবতী নারী একসঙ্গে সন্তান প্রসব করবেন। সকালেই আপনাকে বলেছি সন্তানের জন্মদান জাগতিক সমস্ত শুভ শক্তির উৎস। স্বয়ং আদিশক্তি প্রতি মুহূর্তে নানান শক্তির সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করছেন। একাধিক প্রসূতির একই লগ্নে সন্তান প্রসবের ফলে এক অখণ্ড অভেদ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হবে যা রক্ষা করবে সেই বস্তুটিকে।"

— "সর্বোপরি কতজন প্রসূতির দরকার মহর্ষি?"

— "শাক্ততন্ত্রে অষ্ট প্রসূতির কথাই বার বার বলা হয়েছে। তাই নাকি সবচেয়ে অভেদ্য!" মহর্ষি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন।

— "তার মানে... এই মুহূর্তে ঠাকুর ঘরে আটজন প্রসূতি অপেক্ষারত। যারা দেবীর জিহ্বাকে রক্ষা করবেন।" রানি কঙ্কাবতী ঠাকুরঘরের বদ্ধ দরজার দিকে তাকালেন।

— "এখানে একটা সমস্যা হয়েছে।" বৃদ্ধ শম্ভুপাদের গলায় চিন্তার সুর। "এই মুহূর্তে দেবীগৃহে মাত্র সাতজন প্রসূতি আছেন। আমি গত নয় দিন অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই আর একজন প্রসূতির সন্ধান পাইনি।"

— "এতে অসুবিধে হবে না?" মহারানির স্বরে উৎকণ্ঠা।

— "জানি না মহারানি। পরিণতি সম্পর্কে আমিও অজ্ঞ। তবে আমি দৈবে বিশ্বাসী। মায়ের যদি এটাই ইচ্ছে হয় তাহলে তাই হবে।"

— "মহর্ষি এই গর্ভপ্রাচীর কি সত্যি অখণ্ড অভেদ্য?"

— "মাতার সৃষ্টির সার্থকতা তাঁর সন্তানের কারণে। বলা যেতে পারে সন্তানই সৃষ্টিশক্তির উৎস। একজন মাতা তাঁর সন্তানের জন্ম দিতেই পারেন কিন্তু তিনি তাঁর সন্তান ছাড়া অসম্পূর্ণ। এখানে যে শক্তি প্রাচীর দেবীর

জিহ্বাকে বেষ্টন করে রাখবে তারও উৎস হবে সেই সব সন্তানেরা যারা আজ জন্ম নেবে। অর্থাৎ এই সন্তানদের প্রাণই হল গর্ভপ্রাচীরের শক্তি।"

ঠিক এমন সময় আবার সম্মিলিত আর্তনাদ ভেসে এল ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার ওপার থেকে। মহারানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার এখন কী করণীয় মহর্ষি?"

— "আমি পুরুষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আমার ওপরেও বর্তায়। আমার ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। আপনি ভেতরে যান। ভেতরে একাধিক ধাইমা আর প্রসবের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম মজুত আছে। আমি চাই আপনি পুরোটা পরিচালনা করবেন। কুলদেবীর সিংহাসনে আগে থেকেই দেবীর জিহ্বা রাখা হয়েছে। মাথায় রাখবেন, সাত জন প্রসূতির অবস্থান যেন বৃত্তের মতো হয়। আর দেবীর সিংহাসন যেন সেই বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে। এবার ভেতরে যান। হাতে সময় বড় কম।"

কঙ্কাবতী মহর্ষিকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন।

— "দেবী রঙ্কিনী আপনাকে শক্তি দিন।"

মহারানি কঙ্কাবতী আর এক মুহূর্ত সময় ব্যয় করলেন না। দেবী রঙ্কিনীকে মনে মনে স্মরণ করে দেবীগৃহে প্রবেশ করলেন।

কথায় বলে, অতি বিচক্ষণ মানুষ মানসিকভাবে অস্থির হলে একই ভুল একাধিকবার করেন। এত গূঢ় আর গুরুত্বপূর্ণ কথা লোকে সাধারণত সঙ্গোপনেই আলোচনা করে। কিন্তু মহর্ষি তা আলোচনা করলেন অন্ধকার বারান্দার একপ্রান্তে থাকা ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে। বৃদ্ধের চোখ খেয়াল করল না প্রবল আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে একটা ছায়াশরীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাঁদের পুরো কথাটা শুনল। তারপর সেই অন্ধকার গায়ে মেখেই একটা সময় পর সেই স্থান ত্যাগ করল।

* * * * * * * *

সাদা চামরখানা পুষ্পপাত্রের ওপরে নামিয়ে রাখলেন শম্ভুপাদ। আজ

পূর্ণিমা। ঘণ্টা, কাঁঝর, খঞ্জনী, শঙ্খ, ঢাকবাদ্যে মুখরিত দেবীগৃহে সদ্য সমাপ্ত হল দেবী সিংহবাহিনীর সন্ধ্যারতি। সকলে দণ্ডবৎ হয়ে মা সিংহবাহিনীকে করজোড়ে প্রণাম করছেন। সেবাদাসী, দাসী, ভৃত্য, রাজমাতা, প্রধান পুরোহিত সকলেই ধীরে ধীরে পর পর ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও সেখানে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন শম্ভুপাদ।

সূর্যের আলো বহুক্ষণ আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। সমগ্র ধলভূমগড় রাজ্যের আকাশে রুপোলি জ্যোৎস্না। মহর্ষি শম্ভুপাদ সরে এলেন পশ্চিমদিকের কাচের সার্শী লাগানো জানালার এক পাশে।

আর কিছুক্ষণ সময় হাতে আছে। নিদ্রাকালের সময় চলেই এসেছে প্রায়। এক ভয়ংকর সঙ্কট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে তিনি। আর তাঁর কাঁধে সমগ্র রাজ্যের সুরক্ষার ভার।

কিন্তু তিনি কি পারবেন সবটা সামলাতে? তিনি কি পারবেন কল্লকেশীর গ্রাস থেকে সমগ্র ধলভূমগড়কে রক্ষা করতে? যে ভয়ংকর বিধ্বংসী পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন এতদিন ধরে আজ তার শেষ দিন। এতটা ঝুঁকি নেওয়া কি সত্যি তাঁর উচিত হয়েছে? মা রঙ্কিনী তাঁর সমস্ত পাপের জন্য যা দণ্ড দিতে চান, তিনি মাথা পেতে নেবেন কিন্তু এ ছাড়া যে অন্য কোনো পথ তাঁর জানা ছিল না। রাজরক্তকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। আর তিনি তা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন।

— "প্রণাম গুরুদেব!"

দরজার প্রান্ত থেকে মহারানি কঙ্কাবতীর কণ্ঠস্বর শুনে ঘোর ভাঙল মহর্ষির। কিন্তু এ কী? রানি কঙ্কাবতীর সারা মুখমণ্ডলে এ কীসের ছায়া! এক অবর্ণনীয় হতাশা আর আক্রোশ মিশে রয়েছে কঙ্কাবতীর চোখে মুখে।

— "কী হয়েছে মহারানি? আপনাকে এমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?"

— "আমার আপনার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করবার আছে।" মহারানির কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য শীতলতা।

— "আপনি কি জানেন সেই দিন এই ঘরে জন্ম নেওয়া সাত জন শিশু কন্যাসন্তানের মধ্যে ছয় জন মারা গিয়েছে ইতোমধ্যে?" কথা বলতে বলতে

মহারানির চোখের পাতাগুলো ভিজে উঠল হঠাৎ করে।

— "কে জানাল আপনাকে এসব কথা?" মহর্ষির চোখে ভ্রূকুটি।

— "সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় মহর্ষি। আপনি বলুন, আপনি কি জানেন এসব?"

— "জানি।" মহর্ষির কণ্ঠ হিমের মতো শীতল। সত্যিই তো তিনি জানতেন সবটা। এখন মিথ্যে কী করে বলবেন?

— "জানেন? আর তারপরেও কোনো ব্যবস্থা নেননি?" কঙ্কাবতী প্রবল বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। "আপনিই তো বলেছিলেন, রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বাকে রক্ষা করতে হলে সেই সাত জন শিশুকন্যাকেও রক্ষা করতেই হবে। নইলে গর্ভপ্রাচীর ভেঙে যাবে।"

— "হ্যাঁ মহারানি, গর্ভপ্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

— "আর তারপরেও আপনি এটা হতে দিলেন? খবর পেলাম তাদেরকে নাকি মেরে ফেলা হচ্ছে! কে করছে এই নৃশংস কাজ? আমি নিশ্চিত আপনি জানেন কে করছে এই কাজ।"

— "এই কাজ মহারাজ জগন্নাথদেব করছেন। বলা ভালো তাঁর ভেতরের আসুরিক শক্তি করছে এই কাজ।"

— "আর আপনি এসব জেনেও কোনো প্রতিরোধ করছেন না?"

মহর্ষি সরাসরি তাকালেন কঙ্কাবতীর দিকে। কিন্তু এ কী, মহর্ষির চোখ থেকে অশ্রুধারা গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। মহর্ষি কাঁদছেন? কিন্তু কেন?

— "আমি জানি না কীভাবে মহারাজ এই গর্ভ প্রাচীরের খবর পেলেন। কিন্তু দেখলাম উনি জেনে গিয়েছেন। কিন্তু আমি এটা জানতাম মহারাজ একবার যখন জানতে পেরেছেন তিনি কখনোই চাইবেন না নিদ্রাকালের আগে সেই সাত জনের একজনও জীবিত থাকুক। থাকলে তিনি নিজের হাতে কখনওই সেই জিহ্বা ধরতেও পারবেন না। আর তা কল্লকেশীকে উৎসর্গ করতেও পারবেন না। কারণ এক গর্ভ প্রাচীরও অবশিষ্ট থাকাকালীন কোনো অপশক্তি যদি সেই জিহ্বা ভুল করেও ছুঁয়ে ফেলে তাহলে মুহূর্তে তা জড়ে পরিণত হবে।"

— "তার সঙ্গে আপনার গোটা ব্যাপারটিকে মেনে নেওয়ার কী আছে

মহর্ষি?" কঙ্কাবতী সত্যি কিছু বুঝতে পারছেন না।

শম্ভুপাদ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "আমি এই ব্যাপারে কোনো প্রতিরোধ করিনি, কারণ আমি চেয়েছিলাম মহারাজ নিজের হাতে ওদের সকলকে হত্যা করুন।"

— "কী!" বিস্ময়ে হতবাক মহারানি কঙ্কাবতী। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কী বলছেন মহর্ষি?

— "জানি আপনার শুনতে ভীষণ অবাক লাগছে মহারানি কিন্তু এর পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। পরপর সাতজনকে নিজের হাতে হত্যা করার অর্থ মহারাজের ভেতরকার আসুরিক শক্তির ক্ষয়। তিনি রোজ একজনকে হত্যা করছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না ভেতরে ভেতরে তাঁর আসুরিক শক্তি ধীরে ধীরে কতটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর এই করতে করতে যদি কোনোভাবে মহারাজের ভেতরে ঘুমিয়ে-থাকা কল্লকেশীর ক্ষমতাগুলো নিদ্রাকালের আগেই শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে আমরা মহারাজকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারি।"

মেঝের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন মহারানি।

মহর্ষি বললেন, "জানি এই মুহূর্তে আপনার আমাকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে হচ্ছে কিন্তু সিংহাসনের প্রতিও আমার কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে মহারানি। আমি সেই দায় থেকে আমি কিছুতেই মুখ ফেরাতে পারব না।"

— "আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি মহর্ষি।" কঙ্কাবতীর কণ্ঠস্বর আশ্চর্য শীতল।

— "কিন্তু কোনো কিছুর প্রতি দায়বদ্ধতা কোনোদিন মানবিক গুণাবলীর ঊর্ধ্বে হতে পারে না। একজন মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ বুকে বড় বাজে গুরুদেব। সেখানে সাত জন সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ শুনেও শুধুমাত্র নিজের সিঁদুর রক্ষার জন্য আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব না। কিছুতেই না।"

— "কিন্তু মহারানি..."

— "আমি এই রাজ্যের মহারানি... আপনাকে আদেশ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনি আপনার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মহামন্ত্রীকেও সঙ্গে নিন।

সেনাদল সাথে নিন। অন্তিম কন্যাকে প্রাণে বাঁচান। আর নিতান্তই খুব দেরি হয়ে গেলে যদি তাকে বাঁচাতে নাও পারেন অন্তত সেই অপরাধী যেই হোক, তাকে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করুন।"

"একী বলছেন মহারানি? এ যে রাজদ্রোহ!" মহর্ষি বিস্মিত।

মহর্ষির অবাক হয়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন কঙ্কাবতী, "সেই অভিযোগ আসলে তার দায় আমি নেব মহর্ষি। আমি।"

(কালো রাক্ষসের চর)

ভীমনগর গ্রামটি আদপে ছোট। বাড়িগুলি একতলা আর মাটির। দেখলেই মালুম হয় গ্রামবাসীদের অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়। দিনের বেলায় এই গ্রামটি দেখতে যেন ঠিক পটে আঁকা ছবি। পশ্চিমের বন আর পাহাড়ের কোলে এই আদিবাসী গ্রামটিতে সাকুল্যে ঘর বলতে তিরিশটি।

আজ পূর্ণিমা। রুপোলি চাঁদের আলোয় আজকে রাতে যেন আরও মায়াময় হয়ে উঠছে ছোট গ্রামটি।

রাত গভীর নয়। তবে ইতিমধ্যেই গ্রামটি নিঝুম হয়ে গিয়েছে। সব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে কিনা তা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। আজ মধ্যরাত্রে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। হিসেব মতো আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে দেবীর ক্ষমতা। সেই কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই যেন সমগ্র জনপদ ভয়ংকর আতঙ্কের প্রহর গুণছে। গ্রামের সব থেকে শেষ বাড়িটির মালিক রামলাল সরেন। আমরা গ্রহণের রাতে এদের ব্যাপারেই কথা বলব।

রামলাল সরেনের বয়স পঁয়তাল্লিশ। মূলত জঙ্গল থেকে মধু আর কাঠ সংগ্রহ করে আর নদী থেকে মাছ আহরণ আর রুক্ষ জমিতে অল্প অল্প চাষ আবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করে এই গ্রামের লোকজন। তারাসুন্দরী রামলালের স্ত্রী। তারাসুন্দরী মহর্ষির শম্ভুপাদের কৃপাধন্যা হয়ে রঙ্কিনী দেবীর

জিহ্বাকে রক্ষা করতে সেইরাত্রে ঠাকুরঘরে উপস্থিত ছিল। এবং দেবীর কৃপায় তাদের কোল আলো করে এক কন্যাও জন্ম নিয়েছে সেদিন। এরা ছাড়াও এই ঘরে থাকে রামলালের মা বিজলী সরেন। আজ আঁতুড়ের সাত দিন। আর দু-দিন রঙ্কিনী মায়ের নাম করে কোনো ভাবে কাটিয়ে দিতে পারলেই বংশের একমাত্র মেয়ের জীবন বাঁচানো যাবে। নইলে সেই রাত্রে যারা গিয়েছিল রাজ মহলে তাদের মেয়ে গুলো তো...

আঁতুড়ঘর পাতা হয়েছে বাড়ির পিছনদিকের গোয়ালঘরের মেঝেতে। খড়, বিচালি, আর ছেঁড়া পাটের চটের বিছানার ওপর মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে তারাসুন্দরী। চোখের পলক পড়ছে না। যেন নিঃশ্বাস নিতেও মানা তার। ঘরের এক কোণে মিটমিট করে মাটির প্রদীপে যেটুকু আলো জ্বলছে তাতে দেখা গেল গোয়াল ঘরের কঞ্চি দেওয়া দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে বিজলী সরেন। চোখ তার চক চক করছে। হাতে একটা ধারালো কাঠ কাটার কুঠার। তারাসুন্দরীও চটের বিছানার নীচে একটা ধারালো দা লুকিয়ে রেখেছে। দরজার বাইরে টাঙ্গি হাতে পাহারায় বসে আছে রামলাল। ওরা খবর পেয়েছে যারা সেই রাতে রাজমহলে বাচ্চা জন্ম দিয়েছিল তাদের বাচ্চাগুলো আর বেঁচে নেই। আর তাদের পরিবারের লোকজনও কোনো এক অমোঘ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এলাকা থেকে। মাঝরাতে নাকি এক কালো রাক্ষস এসে দাঁত নখ বের করে ওদের মেয়েগুলোকে আঁতুড় থেকে টেনে বের করে খেয়েছে। কিন্তু রাজমহল থেকে কেউ আসেনি তাদের বাঁচাতে। কী ভীষণ যে অসহায় লাগছে তারাসুন্দরীর! বাধ্য হয়েই আজ সকালে রানিমার কাছে খবর পাঠিয়েছিল রসনার দ্বারা। রসনা তার সই, সে রাজমহলে মালিনীর কাজ করে। বিকেলে ফিরে রসনা জানিয়েছে রানিমার কানে সে সব খবর তুলে দিয়েছে।

তারাসুন্দরী জানতে পেরেছে কাল রাত থেকে বরদাউলি গ্রামের লতিকার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কোনো খবর নেই। হঠাৎ করেই যেন রাতারাতি কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে তারা। পড়ে ছিল তাদের ভাঙা বাড়ি। আর লতিকাসুন্দরীর ছোট্ট মেয়ের আধখাওয়া শরীরটা...। আচ্ছা তাদেরও কি তাই

অবস্থা হবে? এসবই ভাবছিল সে, এমন সময় হঠাৎ দরজার বাইরে শোনা গেল রামলালের গলা, চমকে উঠল তারা সুন্দরী। চমকে উঠল বিজলী।

দরজার বাইরে ততক্ষণে টাঙ্গিখানা দু-হাতে চেপে উঠে দাঁড়িয়েছে রামলাল। এমনিতে সাহসী হলেও কালো রাক্ষসের সামনে দাঁড়াবে এমন সাহস তার কই? অজান্তেই হাঁটুজোড়া কেঁপে উঠল তার। সারা শরীর দর দর করে ঘামছে। কারণ ততক্ষণে সামনের দৃশ্যটা তার নজরে চলে এসেছে। গোয়ালের সামনে যেটুকু অংশ ফাঁকা উঠোন মতো অংশ পড়ে আছে তাতে চাঁদের রুপোলি আলোটা পরিষ্কার ফুটে উঠছে। কিন্তু ও কী ওখানে যে দুটো ছায়া শরীর। একটা খুব লম্বা আরেকটা একটু বেঁটে।

— "কে কে? দাঁড়াই উখানে?"

কাঁপা-কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠল রামলাল।

বেঁটে ছায়াটি রামলালের দিকে আঙুল তুলে বিড়বিড় করে বলে উঠল, — "প্রভু! এই ঘরেই আছে সেই মেয়ে।" আর তারপরেই একটা রক্ত জল করা হাসি। কাছাকাছি কোনো হায়না হেসে উঠল যেন। হঠাৎ লম্বা ছায়ামুর্তিটা অপর ছায়ামূর্তির দিকে পিছন ফিরে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "যা। তুই এবার মহলে ফিরে যা। আর রঙ্কিনীর জিবটা সরিয়ে নে।"

এক মুহূর্ত সময় আর সঙ্গে সঙ্গেই অপর ছায়া মূর্তিটি যেন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামলাল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, "কে কে উখানে? বল কেনে? উথায় কে দাঁড়াই আছিস বটে? বল কিনে? নইলে টাঙ্গির বাড়িতে মাথা ফাটি দিমু।"

নাহ। কোনো জবাব এল না। রামালাল জানত কোনো জবাব আসবে না। কালো রাক্ষস কোনো জবাব দেয় না।

রামলাল দেখল ছায়ামূর্তিটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ভয়ংকর সবুজ চোখ জোড়া আর করাতের পাতের মতো তীক্ষ্ণ সাদা দাঁতের সারি দূর থেকেই রামলাল দেখতে পেয়েছে।

* * * * * * * *

গোপন কারাকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বয়স্ক মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু। চোখে মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু এসব ছাপিয়ে তাঁর কপালে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। এখানে কোনো সৈনিক নেই। নেই কোনো পাহারাদার। এই গোপন কারাকক্ষের খবর কেউ জানে না রাজপরিবার ছাড়া। আর জানেন দুজন বাইরের লোক। এক মহর্ষি শম্ভুপাদ আর দ্বিতীয় মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু স্বয়ং। বিশেষ কাউকে বন্দী করতে হলে এই কারাকক্ষ ব্যবহার করা হয়। আজকের বন্দী তেমনই বিশেষ একজন। রাজা জগন্নাথদেব।

তবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পাথুরে মেঝের ওপর শুয়ে থাকা নিরীহ দেখতে রাজামশাই যে কত নৃশংস হতে পারেন তার প্রমাণ একটু আগেই দেখেছেন মহামন্ত্রী। বিশ্বাস হয় না, এই সেই জগন্নাথদেব যাকে তিনি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন।

কী ভয়ংকরভাবে ওই কন্যা শিশুটির শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন তাদের রাজা। না দেখলে বিশ্বাস হয়না কেউ এতটা নৃশংস কী করে হতে পারে। পরিবারটি ছিল রামলাল সরেনের। কিন্তু বাকিদের মতো তারাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ওঁদের পৌঁছোনোর আগেই। পড়ে থাকে তাদের ভাঙা গোয়ালঘর আর মেয়ের মৃতদেহ। কিন্তু এই জায়গাতেই মহামন্ত্রীর সব চেয়ে বড় ভাবনাটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তারা আজ যখন জায়গাটাতে পৌঁছেছিলেন তখনও বাচ্চাটির কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। মহামন্ত্রী সেই মুহূর্তেই চেয়েছিলেন আক্রমণ করে রাজা মশাইকে আটকাতে কিন্তু মহর্ষি কীসের জন্য যে তাঁকে বাধা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে যেতে বললেন সেটা এখন বুঝতে পারছেন না বিপ্রবাহু। মহামন্ত্রীর বিশ্বাস সেই মুহূর্তেই যদি আক্রমণ করতেন তাহলে কন্যা শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হত। আচ্ছা মহর্ষি কি চাননি যে শিশুটি বাঁচুক? কিন্তু কেন?

বেশিক্ষণ ভাবতে পারলেন না তিনি। চমকে উঠলেন। রাজা জগন্নাথ দেবের কখন জ্ঞান ফিরে এসেছে মহামন্ত্রী খেয়ালই করেননি। দেখলেন রাজা

পদ্মাসনে বসে আছেন দুই হাঁটুর ওপরে হাত রেখে। চোখের তারা পুরো কালো। মুখে এক অদ্ভূত হাসি। কী ভয়ংকর সেই হাসি! কী নারকীয়তা সেই হাসিতে। মহামন্ত্রীর ভেতর পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে সেই নিঃশব্দ হাসি দেখতে দেখতে। কিন্তু বেশিক্ষণ না। কানের পেছনেই একটা খুট করে শব্দ। ঘুরে দেখার সময় পর্যন্ত পেলেন না বয়স্ক মহামন্ত্রী। সাথে সাথে মাথার পেছনে কীসের একটা যেন জোরে আঘাত। এক মুহূর্ত সময় গেল না কারাকক্ষের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু।

তাঁর পিছনে কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে একটা ছায়াশরীর দাঁড়িয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে অনুমানে বোঝা যায় এই সেই যাকে একটু আগে রাজা জগন্নাথদেব রামলাল এর বাড়ির সামনে নির্দেশ দিয়েছিলেন রঙ্কিনীর জিহ্বা সরিয়ে ফেলার জন্য। হাতের শক্ত মুগুরটা সে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, চটপট হাতে মহামন্ত্রীর কোমর বন্ধনী থেকে চাবির গোছাটা বের করে কারাগারের দরজাটা খুলে দিতেই রাজা জগন্নাথদেব বাইরে বেরিয়ে এলেন।

— "জিবটা দে..."

সময় যত যাচ্ছে রাজার মুখের ভাব তত পালটে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে তাঁর গলার আওয়াজ।

কালো চাদরে ঢাকা শরীরটি মৃদু স্বরে বলে উঠল, "আমি পাইনি প্রভু। অনেক খুঁজলাম কিন্তু কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে আমি কিছুই পাইনি।"

— "কী বললি?" রাজার মুখের ভাব পালটে হঠাৎ করে কী ভয়ংকর হয়ে উঠল!

তা দেখে সামনের জন ভয় পেয়ে বলে উঠল, "শম্ভুপাদ এত বোকা নন, যে জিনিসটি চোখের সামনে রেখে দেবেন। নিশ্চয়ই তা এক গোপন স্থানে আছে। একমাত্র রানি আর শম্ভুপাদই পারে বলতে সেই জিনিসটা ঠিক কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে।"

— "শম্ভুপাদ দেবে না।" রাজার আসুরিক মুখে ক্রুদ্ধ গর্জন।

— "কিন্তু রানি কঙ্কাবতী? তাঁকে যদি বাধ্য করা হয়?"

— "কীভাবে? কীভাবে বাধ্য করা হবে ওকে?"

— "রাজকন্যা শিবদ্যুতির বিনিময়ে। মহারানি নিজের ঘরে নেই। সম্ভবত মহর্ষির সঙ্গে সিংহবাহিনীর ঠাকুরঘরে। রাজমাতা রাজকন্যাকে একটু আগেই নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন। এই সুযোটাকে কাজে লাগাতে হবে। রাজকন্যার বিনিময়ে মহারানি নিশ্চয়ই রঙ্কিনীর জিহ্বার সওদা করতে রাজি হবেন। তাই না?"

একটা নারকীয় হাসি ফুটে উঠল ফের রাজা জগন্নাথ দেবের ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

কালো চাদরে ঢাকা শরীরটি বলে উঠল, "চলুন প্রভু। আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না। এই পথে আর কেউই পাহারায় নেই..."

কথা শেষ হল না তাঁর আগেই জগন্নাথ দেব বাতাসে নাক উঁচিয়ে কারও ঘ্রাণ নেওয়ার মতো জোরে শ্বাস নিলেন। তারপরেই তার মুখে ফুটে উঠল এক নারকীয় হাসি।

— "দাঁড়া, যাব তো বটেই। তবে তার আগে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।" কথাটা বলেই তিনি সরে এলেন কারাগৃহের একেবারে শেষের কক্ষে। কক্ষটা অন্ধকার। বাইরে থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না ভেতরে কে রয়েছে, কিন্তু কারো একটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। জগন্নাথ দেব নিজের অনুচরকে হাতের ইশারা করতেই সে চাবির গোছা কাজে লাগিয়ে কারার দরজা খুলে দিল।

একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার ঘরের আনাচে-কানাচে।

মুখে একটা নারকীয় হাসি ফুটিয়ে জগন্নাথ দেব বলে উঠলেন, "আয়... বেরিয়ে আয়..."

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে আরেকটা কালো শরীর। ঠিক দরজার বাইরে বেরোতেই দেওয়ালের ভাঁজে আটকানো মশালের আলো তার মুখের ওপর পড়ল। এ আর কেউ নয়, সেনাপতি বিমল ওরফে প্রধান বিকশবাহু। যে ছদ্মবেশ ধরে, পরিকল্পনা করে রাজা জগন্নাথ দেবকে নিয়ে গিয়েছিল সেই গুহায়। আর তারপরেই রাজা দু-ফোঁটা রক্তবন্ধনে যুক্ত হয়েছিলেন শয়তান প্রভু কল্লকেশীর সঙ্গে।

— "প্রভু... প্রভু... আপনি আমায় বাঁচাতে এসেছেন? আপনার এত কৃপা...!"

জগন্নাথ দেব তার মুখের কথা কেড়ে হিসহিসে স্বরে বলে উঠলেন, "তোকে এখান থেকে বের করছি, কারণ তোকে আমার দরকার। তোর জন্য আমার অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। এখন ভালো করে শোন... কী সেই পরিকল্পনা..."

চাদরে মোড়া শরীরটি দেখল, পরিকল্পনার কথা শুনতে শুনতে সেনাপতি বিমলের চোখজোড়া নিজের থেকেই জ্বলে উঠল যেন।

*   *   *   *   *   *   *   *

দূর থেকেই ভিড়টা চোখে পড়ছিল তাঁদের। দরজার কাছে এসে দেখা গেল দাস, দাসী, সৈনিকেরা সব আতঙ্কিত হয়ে ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে উঁকিঝুঁকি মেরে। মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু, আর নতুন সেনাপতি কালিদাসও সেখানে উপস্থিত। মহামন্ত্রীর মাথায় আঘাত। পরনের উত্তরীয় দিয়ে মাথা ভালো করে বেঁধে রাখলেও সেটা ক্রমান্বয়ে রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠছে। সকলের চোখে-মুখে এমন এক অবর্ণনীয় ভয় ফুটে উঠছে যা দেখে বাইরে থেকেও ভিতরের দৃশ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। মহর্ষি শম্ভুপাদ আর মহারানি কঙ্কাবতী দু-জনেই আগামী কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ঠাকুরঘরে ব্যস্ত ছিলেন। মদুরা গিয়ে এই ভয়ংকর খবর তাঁদের না জানালে তাঁরা তো জানতেই পারতেন না।

মহারানি কঙ্কাবতী আর মহর্ষি শম্ভুপাদ ধড়ফড় করে রাজমাতার ঘরে প্রবেশ করেই আঁতকে উঠলেন। ঘরের মধ্যের কুলুঙ্গিতে মিটমিট করে একাধিক প্রদীপের আলো তখনও জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখা গেল ঘরের মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড যেন প্রলয় হয়েছে ঘরের মধ্যে। আর তারপরেই সেই আধো আলোয় যা দেখলেন ওরা দু-জনে, তা দেখে ওদের মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের, আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল যেন।

পশ্চিমের দেওয়ালে কোনো জানালা দরজা নেই। সেই দেওয়াল জুড়ে একটা বড় ছবি ছিল। তা দেওয়াল থেকে নামিয়ে কেউ সেই দেওয়ালে রক্ত দিয়ে এঁকে রেখেছে একটা চিহ্ন। একটা চতুর্ভুজ, তার ভেতরে একটা ত্রিভুজ, আর তার ভেতরে একটা বৃত্ত। এ তো কল্লকেশীর পুনর্জাগরণের বীজযন্ত্র! কিন্তু এ কী? বৃত্তের মাঝে ও কে ঝুলছে? একটা মুণ্ডুহীন দেহ বড় বৃত্তের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে। লোহার শলাকা পেটে এফোঁড়-ওফোঁড় করে তাঁকে গেঁথে রেখেছে সেই নকশার মাঝখানে। আর সেই দেহ থেকে টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মেঝেতে জমা হচ্ছে। মুণ্ডু নেই কিন্তু অবশিষ্ট পোশাক দেখে আন্দাজ করা যায় মৃতা ব্যক্তি আর কেউ নন। স্বয়ং রাজমাতা সুভাষিণী দেবী!

কিন্তু তাঁর মুণ্ডু গেল কই? সে প্রশ্নের উত্তর ও পাওয়া গেল অল্পক্ষণেই। হা দেবী! রাজমাতার কাটা মাথা বিছানার ওপরে কেউ সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। খোলা চোখ চোখ কক্ষের ছাদের দিকে নিবন্ধ আর মুখ আতঙ্কে হাঁ হয়ে আছে। কাটা গলার নলি থেকে প্রবাহমান রক্তের ধারা অল্প অল্প করে ভিজিয়ে দিচ্ছে পুরো বিছানা খানা। কিন্তু এ কী? বিছানার সাদা মখমলের চাদরের ওপর রক্ত দিয়ে এ কী লেখা...!

"রাজকন্যার দেহ ছাড়া রইল রানির কী ই বা।
চাইলে ফেরত তাঁকে রানি, নিয়ে আসুক জিহ্বা।
একলা আসবে রাজগুরু, আর আসবে রানি।
আমার দেহের উপর দাঁড়ায়, অপেক্ষাতে আমি।
মধ্য রাত্রি পেরিয়ে গেলেই, বাড়াবি তোদের পা।
দেখব কেবা বাঁচায় তোদের, রক্কিনীর ছা!"

মহর্ষি খুঁটিয়ে লেখাটা পড়তে পড়তেই চমকে উঠলেন। এ কী, এ কার লেখা! এ হাতের লেখা তো মহারাজের নয়? মহারাজের হাতের লেখা অত্যন্ত সুশ্রী। কিন্তু এটা দেখে তো মনে হচ্ছে সদ্য কেউ লিখতে শিখেছে? তাহলে? তাহলে কি এই ঘরে আরেকজন কেউ ছিল মহারাজের সঙ্গে?

প্রাসাদে কী আরেকজন আছে যে জগন্নাথ দেবের সাহায্য করে চলছে? আর ওমনি বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো শম্ভুপাদের মনে পড়ল মহারানি কঙ্কাবতী কিছুকাল পূর্বে নিজের তত্ত্বাবধানে রাজপ্রাসাদেই এক পাঠশালা খুলেছিলেন। রানির মনে হয়েছিল প্রাসাদের অন্তর্গত সকল অধিবাসীদের ন্যূনতম সাক্ষরতার প্রয়োজন। অচিরেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তাঁর।

এক মুহূর্ত দেরি না করে মহর্ষি ছুটলেন দরজার বাইরের দিকে। হতবিহ্বল রানি কঙ্কাবতীর মাথার ভেতরটা পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে।

কী করবেন তিনি? কী করবেন এবার? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মহারাজ রাজকন্যাকে অপহরণ করে পালিয়েছেন। পালিয়েছেন কোনো ভয়ংকর জায়গায়। রাজকন্যাকে ফেরত পেতে হলে তাঁকে দেবীর জিহ্বা নিয়ে সেই জায়গায় যেতে হবে। হে মা! এবার কী করবেন তিনি? চোখের জল যেন বাঁধ মানছে না রানি কঙ্কাবতীর। কিন্তু তাঁর তো বসে বসে কাঁদলে হবে না। সময় বড় কম তাঁর হাতে। এখুনি তাঁকে মহর্ষির সাথে সব ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে? কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি তো এখানে নেই? কোথায় গেলেন তিনি?

ওদিকে অন্ধকার দেবীগৃহে একটা ছায়াশরীর সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজছে। সে ভালো করেই জানে এই দিকে এখন কেউ নেই সকলেই গিয়েছে রাজমাতার ঘরের দিকে। রাজা জগন্নাথদেব মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছেন। কোনরকম ভাবে সে যদি বিফল হয় রঙ্কিনী দেবীর জিবটা সংগ্রহ করতে তাহলে আজ মধ্যরাত্রের পরে রানি কঙ্কাবতী যেন জিবটা নিয়ে কল্লকেশীর সমাধিতে হাজির হতে পারেন সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

না, সে আরেকবার শেষ চেষ্টা করবে তারপর মহল ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এখানে থাকা আর তার জন্য নিরাপদ নয়।

শম্ভুপাদের চোখে সে নিজের প্রতি অন্যরকম দৃষ্টি দেখেছে।

আচ্ছা কোথায় থাকতে পারে সেই জিহ্বা? সে তো কয়েকমাস আগে স্পষ্ট শুনেছিল, রাজা যখন সেইবার সেই ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে এক বুক ক্ষত নিয়ে শুয়েছিলেন নিজের বিছানায়, মহর্ষি নিজের মুখে বলেছিলেন

রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা নাকি কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে রাখা আছে। কিন্তু সে তো অনেকবার দেখল। আরেকবার দেখবে? যদি গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখে শম্ভুপাদ? অবশ্য সে যা চালাক মানুস চোখের সামনে এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সে কিছুতেই চোখের সামনে রাখবে না। তাহলে? তবে কী গোপন কুঠুরি আছে এই ঘরে কোথাও?

এসব ভাবতে ভাবতে সে সিংহাসনের নীচে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আরেকবার দেখবার চেষ্টা করল। হিসেব মতো কুলদেবীর সিংহাসনের নীচেই তো সেই জিনিসের থাকার কথা। কিন্তু কই? এখানে তো কিছুই নেই? এসব-ই ভাবছিল সেই ছায়ামূর্তি আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বিকট শব্দ করে খুলে গেল দেবীগৃহের দরজা। চমকে উঠল সে...

মশাল হাতে নিয়ে দরজায় একাধিক লোক দাঁড়িয়ে। সবার আগে মহর্ষি শম্ভুপাদ। চোখে মুখে অপরিসীম ঘৃণা আর ক্রোধ। মহর্ষির এই রূপ সে এর আগে দেখেনি। ভেতরে ভেতরে সেটা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল সেই বিশ্বাসঘাতক।

শম্ভুপাদের পেছনে সেনাপতি কালিদাস। তার চোখে-মুখে ক্রোধের থেকে বিস্ময় বেশি প্রকাশ পাচ্ছিল। মহর্ষি বিড়বিড় করে উঠলেন, "কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে কী খুঁজছ? কল্লকেশীর জন্য রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা? চেষ্টা করতে পার, কিন্তু ওখানে ওটা পাবে না। একটা কাজ করো তুমি বরং ওটা কারাগারের কক্ষে খোঁজো। ঠিক ততদিন পর্যন্ত খোঁজো, যতদিন রাজকন্যার অপহরণ আর রাজমাতার হত্যার ষড়যন্ত্রে সহযোগী হওয়ার অপরাধে তোমার বিচার না হয়। বুঝলে মদুরা!"

হ্যাঁ, ততক্ষণে শয়তানের সহযোগীর গায়ের চাদরটা একপাশে খুলে ঝুলে পড়েছে। আর বেরিয়ে এসেছে রানি কঙ্কাবতীর প্রধান দাসীর মুখ। মদুরার মুখ।

(অষ্টমগর্ভ)

ঠাকুরঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ দরজার এদিকে তখন ঠাকুরঘরে উপস্থিত দু-জন ব্যক্তি। মহর্ষি শম্ভুপাদ আর রানি কঙ্কাবতী।

মহর্ষি পাণিশঙ্খের অভিমুখ পরিবর্তন করে দেবী মূর্তির হাত থেকে সোনার চক্রটা খুলে নিতেই একইসঙ্গে দুটো জিনিস হল। রাজপ্রাসাদের চূড়ার ঘণ্টায় তিন প্রহরের ঘণ্টাটা পড়ল। আর একটা বিকট শব্দ করতে করতে ভারী শ্বেতপাথরের সিংহাসনটি আপনা থেকেই একদিকে এমনভাবে সরে গেল যেন কেউ অদৃশ্য হয়ে দেবীর আসনটি ডান দিক থেকে বাম দিকে ঠেলা দিল।

দেবী সিংহবাহিনীর আসনটি একদিকে সরে যেতেই তার নীচের কার্পেটটা দুই হাতে মহর্ষি গুটিয়ে দিলেন। আর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে যা ফুটে উঠল, তা দেখে চমকে উঠলেন রানি কঙ্কাবতী।

একটা ছোট কাঠের পাল্লা।

মহর্ষি প্রায় শব্দ না করে কাঠের পাল্লাটা খুলতেই একটা ছোট গর্ত দেখা দিল সেখানে। মহর্ষি খুব একটা দেরি না করে গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন একটি অপূর্ব কাজ করা চন্দন কাঠের হাতবাক্স।

— "এই হল সেই বাক্স যাতে মন্ত্রবদ্ধ করা আছে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা। আপনি আরেকবার ভেবে নিন মহারানি? আপনি নিশ্চিত, এটি আপনি নিয়েই যাবেন সেখানে?" মহর্ষির কণ্ঠে হতাশা। দীর্ঘক্ষণ অনেক চেষ্টার পরেও কিছুতেই মহারাণী কঙ্কাবতীকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি কল্লকেশীর সমাধির নিকটে দেবীর জিহ্বা নিয়ে যাবেনই।

— "আমার কাছে আর কোনো উপায় নেই গুরুদেব। আমায় আমার মেয়েকে বাঁচাতেই হবে।"

— "আর আপনার প্রজা? সমগ্র রাজ্য?"

— "আমার বিশ্বাস দেবী আমাদের এই ভাবে ছেড়ে যাবেন না। এই চরম বিপদে তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন। মায়ের যে কর্তব্য তাঁর সন্তানদের রক্ষা করা।"

একটা অবহেলার হাসি হাসলেন শম্ভুপাদ, ভাবলেন একবার বলবেন, "আপনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন মহারানি, দেবী ইতিমধ্যেই নিদ্রাকালে চলে গিয়েছেন।"

কিন্তু তারপরেই কিছু না বলে মহর্ষি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চন্দন কাঠের বাক্সের ঢাকনাটা খুললেন। কঙ্কাবতী দেখলেন ভেতরের বস্তুটা লাল শালুতে মোড়া। কিন্তু রক্তে ভিজে সপসপ করছে পুরো কাপড়টা।

কঙ্কাবতী বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে জিনিসটা দুইহাতে টেনে বের করে আনলেন। ঠান্ডা জিনিসটা দুই হাতের মধ্যে তখনও তিরতির করে কাঁপছে। আর টস টস করে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত লাল শালু চুঁইয়ে ঠাকুরঘরের মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। শম্ভুপাদ বাক্সটা নামিয়ে জাগপ্রদীপের হাঁড়ি থেকে জাগপ্রদীপখানা তুলে সেটা নিয়ে ঠাকুর ঘরের পূর্বদিকের দেওয়ালের একটি নির্দিষ্ট অংশে তাপ দিতে থাকলেন কিছুক্ষণ।

ওমনি আরেক আশ্চর্যের কাণ্ড হল, যার জন্য রানি কঙ্কাবতী আদৌ তৈরি ছিলেন না। হঠাৎ পাথরে পাথরে একটা ঘর্ষণের শব্দ। আচমকা ঠাকুরঘরের মেঝে যেন কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ পরে রানি কঙ্কাবতী দেখলেন ঠাকুর ঘরের বামদিকের মেঝেতে একটা তিন ফুট বাহুর বর্গাকার গর্ত তৈরি হয়েছে, যার ভেতরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি অতল অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। এই সব তালগোলে মহর্ষি রানি কঙ্কাবতীর নজর এড়িয়ে দেবী রঙ্কিনীর সোনার খড়গ কাপড়ের আড়ালে এমন ভাবে লুকিয়ে নিলেন, যাতে মহারানি তা দেখতে না পান। তারপর দেওয়াল থেকে একটা মশাল হাতে নিয়ে বললেন, "চলুন মহারানি। এই পথের শেষ যেখানে, সেখানেই কল্লকেশীর জীবন্ত সমাধি । আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। কারণ আমাদের অনেকটা পথ নীচে যেতে হবে।"

কতটা পথ হাঁটলেন, তা মহারানির খেয়ালের বাইরে। শুধু হাঁটছেন তো হাঁটছেন। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমেই চলছেন। মহর্ষি মশাল ধরে নামছেন আগে আগে। আর তাঁর পিছনে দু'হাতে রক্তে ভেজা লাল শালুতে মোড়া দেবীর জিহ্বা ধরে নামছেন রানি কঙ্কাবতী। চোখের দৃষ্টি অচঞ্চল। মুখ

দেখে বোঝার উপায় নেই যে মনের মধ্যে কী চলছে তাঁর। মহর্ষি সত্যি বুঝতে পারছেন না, মহারানি কি সত্যি সত্যি নিজের সন্তানের জন্য এই জিহ্বা শয়তানের হাতে তুলে দেবেন?

তুলে দিলে যে ভয়ংকর অপশক্তি জেগে উঠবে সমগ্র রাঢ়ভূম জুড়ে তাকে প্রতিহত করবে কে?

সত্যি মহারানি কী করতে চলেছেন সেটা জানা ভীষণ ভাবেই দরকার। মহারানির মনের মধ্যে কী ঝড় বইছে তা মহর্ষি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন। স্বামী অপশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কন্যা সেই অপশক্তি দ্বারা অপহৃত, শাশুড়ি মাতা নিহত, যাকে এতদিন বড়দিদির মতো ভরসা করতেন, সেই দাসীই সব থেকে বড় বিশ্বাসঘাতক। মদুরার মুখ থেকে জানা গিয়েছে তার এইরকম বিশ্বাসঘাতকতার কারণ। আগের বারে বিকশবাহুরা যেই পাঁচ জন আদিবাসীকে দেবীর রক্তশাপে বন্দী করেছিল, তাদের মধ্যে একজন মদুরার স্বামী, কল্লকেশী না জেগে উঠলে অমরত্বের অভিশাপ থেকে তাদের মুক্তি নেই কিছুতেই। তাই মদুরা চেয়েছে যাতে কল্লকেশী জেগে উঠে ওদের শাপখণ্ডন করে মুক্ত করে। আপাতত রাজদ্রোহের আসামি হিসেবে কারাগারে বন্দী থাকবে মদুরা যতদিন-না তার অপরাধের বিচার হয়। অবশ্য যদি আজ সত্যি কল্লকেশী জেগে ওঠে, তাহলে কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

সাবধানে নামছেন তাঁরা দু-জনে। ভূগর্ভস্থ জল চুঁইয়ে পড়ে সিঁড়ির ওপরে মোটা পিছল শ্যাওলার সৃষ্টি করেছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই অতল গহ্বরে পড়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। শম্ভুপাদ সময় হিসেব করে বুঝলেন আর মাত্র কিছুটা পথ নীচে নামলেই সেই ভয়ংকরের সমাধির কাছে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁদের দু-জনের কানে একসঙ্গে একটা মাদলের বোল ভেসে এল। শব্দটা মৃদু সুরে রাজছে। কিন্তু তার বোল অত্যন্ত স্পষ্ট।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম...
দ্রমি দ্রমি দম।"

চমকে উঠলেন মহর্ষি। সেই বোল... হ্যাঁ এ তো মাদলের সেই বোল।

"গুরুদেব! শুনতে পাচ্ছেন?" মহারানির কণ্ঠে ভয় মেশানো উৎকণ্ঠা।

মশালের আলোয় শম্ভুপাদের চোখ চকচক করে উঠল। মনে মনে দেবী রঙ্কিনীকে স্মরণ করলেন মহর্ষি। "মা গো! আজ তুই রক্ষা করিস। রক্ষা করিস!" মনে মনে বললেন বটে তবে তিনি নিজেও জানেন এটা সম্ভব নয়। কিছুতেই নয়।

"আসুন মহারানি!" শম্ভুপাদ একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, "কল্লকেশীর সমাধির কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছি।

সিঁড়ির মুখটা একটা ছোট সরু পাথুরে গলির মুখে শেষ হয়েছে। যার মুখে আবার গাছপালা এমনভাবে ঘেরা রয়েছে, যে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গপথের মুখ আছে। মহর্ষি হাতের ইশারায় মহারানিকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত দিলেন। মাদলের বোল আগের তুলনায় আরও বেশি জোরে বাজছে। আরও বেশি তীক্ষ্ণ স্বরে।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

কিন্তু শুধু তো মাদলের বোল নেই। আরও একটা শব্দ ভেসে আসছে একই সাথে। কিন্তু কীসের এই শব্দ!

মহর্ষি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "আমাদের মশালের আলো এখনিই নিবিয়ে ফেলতে হবে মহারানি। ওদের কোনওভাবেই এই গোপন পথের কথা জানতে দেওয়া চলবে না।"

— "এই গোপন পথ থেকে বেরিয়েই আমরা পৌঁছে যাব সেই গুহার সামনে, যার মধ্যেই আছে কল্লকেশীর সমাধির মুখ, সেই ইঁদারা। এই সেই গুহা যার মধ্যে আগের বারে বিকশবাহুরা সেই ভয়ংকর উপাচার করেছিল মহারাজকে নিয়ে। আপনি কিন্তু এখনও ভেবে দেখতে পারেন মহারানি। এখনও কিন্তু ফিরতে পারি..."

— "আমি আমার সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি । রাজকন্যাকে না নিয়ে আমরা ফিরবো না মহর্ষি।" কঙ্কাবতীর কঠিন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠলেন মহর্ষি শম্ভুপাদ।

— "বেশ তাহলে চলুন। আমাদের আর দেরী করা ঠিক হবে না।" কথাটা

বলে অন্ধকার পাথুরে সিঁড়ির ওপরে মশালটা ছুঁড়ে ফেলতেই একটু পরে মশালের আলোটা নিবে গেল। পূর্ণিমার ঘন রুপোলি চাঁদের আলোয় পুরো বন। গোপন সুড়ঙ্গের মুখের সামনে কিছু গাছপালা সেই পথ লুকিয়ে রেখেছিল। মহর্ষি সেই গাছপালার ডালগুলো স্বস্থানে রেখে পুনরায় গুহার গোপন পথ ঢেকে দিলেন। ওনাদের থেকে কিছুদূরেই একটা বড় গুহার মুখ যার ভেতর থেকে এক ধরনের নীল আলোর প্রতিফলন ঘন জঙ্গলের আস্তরণ ভেদ করে বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। আর ছড়িয়ে পড়ছিল এক ভয়ংকর মাদলের বোল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম"

ওদিকে রাজাও মাথা ঝাঁকিয়ে মন্ত্রপাঠ শুরু করেছে। আঁতকে উঠলেন রানি। হে ঈশ্বর! যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটে যাবে।

— "মহর্ষি! রাজকন্যা! উনি যা করছেন রাজকন্যা যে কোনো সময় ওনার হাত ফসকে কুয়োর মধ্যে পড়ে যাবে। দয়া করে কিছু একটা করুন।"

মহর্ষি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন,

— "জগন্নাথ দেব, দাঁড়াও। আমরা তোমার কথা মতো দেবীর জিহ্বা নিয়ে এসেছি।"

মহর্ষির কথা শুনে থেমে গেল জগন্নাথ দেবের মাথা ঝাঁকানো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হতেই দেখা দিল এক ক্রূর হাসি।

— "জিবটা আমার কাছে নিয়ে আয় শম্ভুপাদ। আমার কাছে নিয়ে আয়।",

শম্ভুপাদ তাকালেন রানি কঙ্কাবতীর দিকে, — "আগে রাজকন্যাকে রানির হাতে ফেরত দাও। তারপরে তুমি জিহ্বা পাবে।"

শম্ভুপাদের কথা শুনেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জগন্নাথ দেব। সেই বুকের রক্ত জল করা হাসি মাদলের ভয়ংকর বোলের সঙ্গে মিশে গুহার প্রত্যেকটি কোণে ছড়িয়ে পড়ল।

— "শর্ত দেওয়ার মতো অবস্থাতে তুই নেই শম্ভুপাদ।" ঝকঝকে দাঁতের সারির মাঝ থেকে লকলক করে উঠল রাজার কালো জিবটা। উফ, কী

ভয়ংকর দেখতে লাগছে রাজাকে। "ছোঁড়, জিবটা আমার দিকে ছোঁড়।" গর্জে উঠল রাজা জগন্নাথদেব, "নাহলে স্বয়ং রাজকন্যাকেই বলি দিয়ে দেব। এই অতল কুয়োর নীচে আমার ঘুমন্ত শরীরের এমন অনেক খাবারের দরকার।"

মহর্ষি একবার মহারানির দিকে তাকালেন, ভয়ে, আতঙ্কে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে। রাজাকে বিশ্বাস করা তাঁর উচিত হয়নি। এ শয়তান, জিবের বিনিময়ে সে তার মেয়েকে না দিতেও পারে। হে মা! এ কী সর্বনাশ হল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম"

মাদল বাজছে, মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে, সেই সাথে গোঁ গোঁ করে একটা ভয়ংকর বুকের রক্ত জল করা শব্দ বেরিয়ে আসছে ইঁদারার ভেতর থেকে। ওই ওই জেগে উঠছে কল্লকেশী, আগেরবারের মতো। নিজের হাজার বছরের ঘুম ভেঙে। রাজা চিৎকার করে উঠলেন, "ওটা এদিকে ছোঁড়... জিবটা ছোঁড় বলছি... নাহলে..." কথাটা বলেই রাজকন্যাকে প্রায় এক হাত দিয়ে ধরে কুয়োর উপরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন রাজা জগন্নাথ।

আর তারপরেই ঘটনা ঘটল যা দেখলে যে কারোর হৃদস্পন্দন থমকে যেতে বাধ্য।

মহর্ষি মহারানির হাত থেকে রক্তভেজা লাল শালুতে মোড়া রঙ্কিনীর জিহ্বা কেড়ে নিয়ে যেই শয়তান রাজার উদ্দেশ্যে শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে রাজা হাতের মুঠো আলগা করে দেবীর জিহ্বাকে দু-হাতে ধরতে গেলেন।

কঙ্কাবতী আর্তনাদ করে উঠলেন, এক মুহূর্তের জন্য মনে হল রাজকন্যার দেহটা কুয়োর ভেতরের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। গুহার বাম দিকে বজ্রাসনে বসে-থাকা সেই নারীদের ভিড় থেকে একটা শরীর শূন্যে লাফ দিয়ে রাজকন্যার দেহটাকে এমনভাবে লুফে নিল যেন এই লুফে নেওয়ার খেলায় সে অভ্যস্ত। কে এই নারী! মশালের নীল আলোয় সেই মহিলা ততক্ষণে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। বুকের ভেতর অত্যন্ত যত্নে রাখা রাজকন্যার ছোট্ট দেহখানা। লল্লটা! মহর্ষি শম্ভুপাদের

পালিতা কন্যা। সে কখন এই দলের সাথে চুপিসারে এখানে উপস্থিত হয়েছে কেউ টেরও পায়নি।

ওদিকে ততক্ষণে আরেকটি ভয়ংকর দৃশ্য শুরু হয়ে গিয়েছে গুহার ভেতরে। রাজা জগন্নাথ দেব দু-হাতে লুফে ধরেছেন ততক্ষণে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা। কিন্তু একী দু-হাতে সেই জিহ্বা লুফে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ ধাঁধানো সাদা আলোর বিস্ফোরণ! আর প্রচণ্ড এক কান ফাটানো আর্তনাদ।

গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠল ভয়ংকর ভাবে। এ কী! ভূমিকম্প!

ততক্ষণে গুহার মধ্যে উপস্থিত সকলের বশীকরণ কেটে গিয়েছে। মাদলের বোল থেমে গিয়েছে। থেমে গিয়েছে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। নারী পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা শিশু যতজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। এ কী দেখছে তারা! এ কী দেখছেন কঙ্কাবতী...

দেবীর সোনার জিহ্বা ছোঁয়া মাত্রই রাজার সারা শরীর পাথর হয়ে যাচ্ছে। রক্ত মাংসের শরীর ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পাথরে।

বিস্ময়ে হতবাক লল্লটা চিৎকার করে উঠলেন, "এ কী হচ্ছে পিতা। রাজা পাথরে পরিণত হচ্ছেন কীভাবে?"

মহর্ষি শম্ভুপাদ নিজে কিছুই বুঝতে পারছেন না।

থেমে গিয়েছে ইঁদারার ভেতর থেকে ঘুমন্ত কল্লকেশীর গর্জন।

ওদিকে দেখতে দেখতে রাজার মূর্তি পুরো পাথরে পরিণত হয়ে যেতেই রানি কঙ্কাবতী ফিরলেন মহর্ষির দিকে। তাঁর চোখের জল বাঁধ মানছিল না যেন।

"এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করুন মহর্ষি। আমি চাই না এই অধ্যায় কোনোরকম ভাবে ফিরে আসুক রাঢ়ভূমের ললাটে।" ততক্ষণে গুহার ভাঙা দরজায় হাজির হয়েছে এক সশস্ত্র সৈন্যদল। যার পুরোভাগে সেনাপতি কালিদাস আর মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু। রানি কঙ্কাবতী ফিরলেন গুহার মধ্যে উপস্থিত সকলের দিকে। যারা এতক্ষণ অপশক্তির বশীভুত হয়ে নানান কুকর্ম করছিল। "তোমরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যাও। তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা কোনো দোষ করোনি।

আমি সেনাপতি কালিদাসকে নির্দেশ দেব, তিনি তোমাদের সকলকে তোমাদের যে যার গ্রামে পৌঁছে দেবেন আজ রাত্রেই। দেবী রঙ্কিনীর জয় হোক।”

ওদিকে মহর্ষি শম্ভুপাদ ইঁদারার পাঁচিলে উঠে দাঁড়ালেন, ধীরে ধীরে রাজার পাথরের মূর্তির দুই হাতের ভেতর থেকে লাল শালু জড়ানো রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বাটা বের করে মহারানির দিকে বাড়িয়ে দিতেই রানি কঙ্কাবতী তা যত্নের সঙ্গে বুকের কাছে চেপে ধরলেন। তারপর দেরি না করে মহর্ষি কাপড়ের আড়াল থেকে বের করে আনলেন রঙ্কিনী দেবীর সোনার খড়গ। কালবিলম্ব না করে রাজার পাথরের মূর্তি সেই খড়গের আঘাতে টুকরো টুকরো করে ইঁদারার অন্ধকার গহ্বরে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করে দিলেন শম্ভুপাদ। অবশিষ্ট হিসেবে পড়ে রইল জগন্নাথ দেবের পাথর হয়ে যাওয়া শরীরের কিছু গুঁড়ো।

* * * * * * * *

আরেকটি অন্ধকার কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত। পাহাড়ের ঢালে ঘন বন। সেই বন এই রাতের আঁধারে নিরাপদ নয় মোটেও, কিন্তু নবারুণ শাসমল সেই সবের তোয়াক্কা না করেই পাথুরে পাকদণ্ডীতে পা দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। তার গন্তব্য বনের আরও গভীর অংশ। তার এক হাতে জ্বলতে থাকা টর্চের সাদা আলো তীক্ষ্ণ ফলার মতো পাহাড়ি বনের ঘন অন্ধকারকে ফালা ফালা করছে। নবারুণ শাসমলের অন্য হাতে শাবল আর কাঁধে একটি কাপড়ের ব্যাগ। যে ব্যাগ থেকে ক্রমাগত চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তের ফোঁটা পাকদণ্ডীর ওপরে পড়ছে।

কিছুটা পথ একটানা চড়াই ভাঙার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নবারুণ। পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার নীচের গ্রামের দিকে তাকাল। একটু বসলে খুব ভালো হয়। দীর্ঘপথ একটানা উঠে আসায় পা জোড়া ভয়ংকর ভাবে কাঁপছে।

হাতে ধরা কাপড়ের থলের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল নবারুণ। এই কাপড়ের থলের ভিতরে আছে দেবী রঙ্কিনীর সেই জিহ্বা। যবে থেকে সে এই জিহ্বা নিজের কাছে এনে রেখেছে তবে থেকেই এই জিহ্বা ভয়ংকর

অভিশাপের মতো তাকে তাড়া করে চলেছে। রাতে ঘুমতে পারে না, ঘুমোলেই বারে বারে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকার ঘরে জেগে বসে ভয়ে কাঁপতে থাকে সে। বারবার মনে হয় সারা ঘর জুড়ে জেগে উঠেছে কোনো ভয়ংকর অপশক্তির ছায়া। শুধু কি রাতে? দিনেও বারে বারে অলীকদৃশ্য দেখে সে। যখনই খেতে বসে, তার বার বার মনে হয় দুই হাতে যেন রক্ত মাখা। বার বার ধোয়, ধুতেই থাকে ধুতেই থাকে। কিন্তু রক্ত আর ধোয়া হয় না হাত থেকে।

খাওয়া কমে যায়, ঘুম কমে যায়। অনিদ্রা, অনাহারে শরীর ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। সে বুঝতে পারে বাড়িতে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা রাখার কুফল এসব। অনিকেতবাবুও তো আর বেঁচে নেই যার সঙ্গে এই সমস্যার কথা আলোচনা করে কোনো সুরাহা বের করবে সে।

কিন্তু সে কি নিজে থেকে চেষ্টা করেনি? কতবার চেষ্টা করেছে এই জিহ্বাকে কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে। কতবার চেয়েছে এই জিহ্বাকে নষ্ট করতে কিন্তু নষ্ট হওয়া তো দূর, উলটে বারে বারে তার কাছে ফিরে চলে এসেছে এই সর্বনেশে জিহ্বা।

এই তো পাঁচ দিন আগে তিতিবিরক্ত হয়ে রাতের আঁধারে সুবর্ণরেখার জলে সে ভাসিয়ে দিয়ে এল মায়ের জিবখানা। তার মনে হয়েছিল, না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশি। নবারুণের স্পষ্ট মনে আছে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে জলের তলায় ফেলে দিয়েছিল সেই জিবখানা। কিন্তু বাড়ি ফিরেই শিউরে উঠেছিল সে।

অন্ধকার ঘরের যে কোণে ঠাকুরের আসন পাতা ছিল তার মধ্যেই রাখা ছিল মায়ের জিবখানা। আর তাতে জড়ানো লাল শালুখানা রক্তে ভিজে জবজব করছিল। নবারুণ আঁতকে উঠেছিল সেটা দেখে। তখনই বুঝেছিল এই জিহ্বার থেকে তার এমনি এমনি কিছুতেই মুক্তি নেই। রাজমহলের কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্রশক্তি দিয়ে বাঁধা ছিল এই জিহ্বা। রাজা নিজের হাতে সেই জিহ্বা মাটি খুঁড়ে বের করে শুধু কল্লকেশীকেই জাগানোর পথই সুগম করেননি, একই সঙ্গে এই জিহ্বার মন্ত্রবন্ধও ভেঙে

ফেলেছিলেন। তাহলে কীভাবে মুক্তি পাবে সে এই জিহ্বার অভিশাপ থেকে? কীভাবে?

এসব চিন্তাভাবনায় যখন সে কাতর হয়ে পড়ছে ঠিক তখনই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো কথাটা তার মাথায় আসে। কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে বিভিন্ন অপশক্তিরা জেগে ওঠে, তা-ই না? তার মানে এই রাতেই এই জিহ্বার ক্ষমতা কমে যায়! বেশ! এই জিহ্বার থেকে তাকে মুক্তি পেতে হলে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতেই এই জিহ্বাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে কোনো গোপন জায়গায়। যার খোঁজ সে-ও পরে পাবে না।

অন্ধকার আকাশের দিকে একবার তাকাল নবারুণ। না তার অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী ছেড়ে পাহাড়ের ঢাল বরাবর উঠতে লাগল সে। পাহাড়ের ঢাল আরও বিপজ্জনক। নবারুণ সাদা টর্চের আলো ফেলে খুব সাবধানে উঠেতে লাগল। ওই তো! ওই তো সেই জায়গাটা।

পাহাড়ের ধাপ কেটে কেউ অনেকদিন আগে একটা সমতল জায়গা বানিয়েছিল। কিন্তু সে জায়গাও দীর্ঘ দিন অব্যবহারের ফলে ঝোপ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। নবারুণ সেই সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে ভয়ংকর ভাবে হাঁপাতে লাগল। ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে তার। একটানা এতটা পথ সে কখনওই পাহাড়ে ওঠেনি। ঝিঁঝি পোকার নিরবচ্ছিন্ন ডাক আর গাছের মাথায় মাথায় চাক বেঁধে জোনাকির আলো জায়গাটা ভয়ংকর গা ছমছমে করে তুলেছিল।

— "হে মা রঙ্কিনী! তু রক্ষা কর কিনে!"

কাপড়ের থলে আর শাবলটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই পা দিয়ে যতটা সম্ভব আগাছাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করল নবারুণ। কিন্তু মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

পেছনের অন্ধকার বন থেকে একটা সড়সড় শব্দ আসছে। ঠিক যেন থেমে থেমে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে কেউ।

চমকে উঠে টর্চের আলোটা পেছনের বনের দিকে ফেলল সে। কোনো শেয়াল? নাকি হায়না?

না অন্ধকার ফুঁড়ে সেখানে শেয়াল বা হায়না এল না। বরং যে এল তাকে

দেখে নবারুণের বিস্ময়ের সীমা রইল না। টর্চের আলোয় ফুটে উঠল একটা সাদা কাপড় পরিহিত মানুষের অবয়ব! আর একে নবারুণ খুব ভালো করেই চেনে।

"মনুর মা!"

হ্যাঁ! অন্ধকার বনের আঁধার ভেদ করে দাঁড়িয়েছে মনুর মা। পিঠে একটা কুঁজ নিয়ে। হাতে একটা লাঠি নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে নবারুণের পেছনে। মনুর মা! নবারুণ তো জানে না মনুর মা-ই তো সেই দিন সাগরকে বশীভূত করে দেবীর জিহ্বা বের করে এনেছিল মাটির ভিতর থেকে। মনুর মা-ই তো তুলে দিয়েছিল বিষাণের হাতে সেই শিঙা। মনুর মা-ই হল মদুরার বংশধর যারা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছিল রাজা জগন্নাথদেবের পুনর্জন্মের। অপেক্ষা করেছিল কল্লকেশীর জেগে ওঠার। কিন্তু নবারুণ এ কাকে দেখছে? বৃদ্ধার মুখের চামড়ার প্রত্যেকটা ভাঁজে কী অপরিসীম ঘৃণা। এ মনুর মা কে তো সে চেনে না। হঠাৎ চমকে উঠল নবারুণ। বৃদ্ধা কাপড়ের ভাঁজ থেকে কী বের করে আনছে? ওটা কী? একটা শিঙা না? এই দিয়ে তো... ভাববার সময় পেল না নবারুণ! তার আগেই মনুর মা শিঙায় ফুঁ দিল। একটা অপার্থিব স্বর ছড়িয়ে পড়ল গোটা জায়গাটা জুড়ে। কী ভয়ংকর শব্দ সেই শিঙ্গার।

ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল নবারুণ, "কী করলি এ তু? কী করলি? ওই শিঙাটোতে ফুঁ দিলি কেনে? কাকে ডাকলি ওই শিঙায় ফুঁ দিয়ে তু...?"

কিছু বলল না সেই বৃদ্ধা! বদলে একটা চাপা ক্রূর হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটের কোলে।

ওদিকে ততক্ষণে জায়গাটা এক ভারী ভয়ংকর পচা গন্ধে ভরে উঠেছে। দপদপ করতে করতে বদলে যাচ্ছে নবারুণের হাতে ধরা টর্চের আলোর রং। সাদা থেকে সেই আলো হয়ে উঠছে ক্রমশ নীল।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল একটা শিসের শব্দ। এই শিসের শব্দ সেই ভয়ঙ্করীর আগমনের বার্তা। কেঁপে উঠল নবারুণ। সে এই শিস দেওয়া পিশাচিনীর কথা জানে। যে তিনখানা ভয়ংকর হায়না নিয়ে ঘোরে। কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রে কালগর্ভ থেকে জেগে উঠে আসছে ধলভূমগড়ের ভয়ংকরী পিশাচিনী

মড়ান্তিকা! আর তাকে শিঙ্গার আওয়াজে জাগিয়ে তুলেছে স্বয়ং মনুর মা।

নীলাভ টর্চের আলোয় নবারুণ দেখল একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী তাঁর সামনে পাক খাচ্ছে। শুধু পাক খাচ্ছে না। ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে এক নারীর অবয়বে। বীভৎস হয়ে উঠছে সেই পচা গন্ধ! শ্বাসটুকু নেওয়া যাচ্ছে না। ভয়ংকর হয়ে উঠছে সেই মন্ত্রমোহী শিসের শব্দ। নবারুণের চোখের পাতা আপনা থেকে ভারী হয়ে আসছে। ঘুমে চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে আসছে আশ্চর্য মন্ত্র বলে। কিন্তু তার মধ্যেই দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল কাপড়ের থলেটা যার মধ্যে রাখা ছিল দেবী রঙ্কিনীর জিহ্বা! কিন্তু পারল কই? তার আগেই টর্চের নীল আলোয় ঝলকে উঠল তিনটে হায়নার নাল ঝরা দাঁতের পাটি। আর এক ভয়ংকর আর্তনাদে কেঁপে উঠল সমস্ত বনানী।

*   *   *   *   *   *   *   *

মুম্বাইয়ের এক অন্ধকার গলি। এমনিতেও কর্পোরেশনের আলো সারা শহর জুড়েই। কিন্তু এই গলির মুখের আলোটাই কবে থেকে কেটে গিয়েছে। এই এলাকাটা শহরের বস্তি অঞ্চলের কাছে। তাই হয়তো প্রশাসনের আগ্রহও কম।

গলিটার শেষ প্রান্তে ময়লার স্তূপ ডাঁই হয়ে আছে পাহাড়ের মতো। সামনের দিকে কতগুলো পথশিশু চট পেতে জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে এই অন্ধকার রাতে। এরা সারাদিন এই নোংরার স্তূপ ঘেঁটে প্লাস্টিক কুড়োয়, নেশা করে। আর রাত্রে এখানেই চট পেতে শুয়ে পড়ে। আশপাশের উঁচু উঁচু ঘরগুলো থেকে আবছা আলো গলিটার মধ্যে পড়লেও কিছু কিছু জায়গায় জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

এরকম অন্ধকারেই নিজেকে আড়াল করে একটা ছায়াশরীর অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। ইদানীং এই এলাকায় হঠাৎ করেই এক অদ্ভুত সিরিয়াল কিলারের উদ্ভব হয়েছে যে শুধু সিরিয়াল কিলিং করে না। সেই সঙ্গে মৃতদেহর মাংসও খায়। এই মাংসখেকোর আতঙ্কে পুরো শহর আতঙ্কিত। প্রশাসন পর্যন্ত

নাস্তানাবুদ। কিন্তু কিছুতেই কোনো সুরাহা পাওয়া যাচ্ছে না অপরাধীর। ছায়াশরীরের চোখের লোভী দৃষ্টি সেই সব পথশিশুগুলোর দিকে নিবন্ধ কিন্তু আদৌ কি একে মানুষের দৃষ্টি বলে? অন্ধকারে বোঝা না গেলেও এই দৃষ্টি বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে। হঠাৎ শ্বাপদের মতো শ্বদন্ত গুলো চকচক করে উঠল ছায়াশরীরটির। ঠিক যেন শিকারী চিতা। অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট মুহূর্তের। হয়তো চলেও এসেছে সেই সময় নইলে সাবধানী পায়ে এগোচ্ছে কেন ছায়াশরীরটি?

কিন্তু হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই ভয়ংকর শিকারী। হঠাৎ একটা বিকট মাংস পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে গলি জুড়ে। সেই সাথে ভেসে আসছে এক হাড় হিম করা শিসের শব্দ। এ কী? এ যে তার আগমনবার্তা।

ছায়াশরীর সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরল। আর সেই মুহূর্তেই পাশের বাড়ির দপদপ করতে থাকা এক আলো ছায়াশরীর মুখের ওপরে পড়ল। সাগর!

উফ! কী ভয়ংকর লাগছে ওকে দেখতে! ঠিক জগন্নাথদেবকে শেষ সময়ে যেমন ভয়ংকর লাগছিল একেও ঠিক তেমন লাগছে। আর লাগবেই তো। সাগরের মধ্যে তো আর তার নিজের সত্ত্বা নেই। আছে কল্লকেশীর অংশ। সে যে পুরোপুরি তিন ফোঁটা রক্তের বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেছে কল্লকেশীর সঙ্গে। আর কল্লকেশীর খাবারই তো মানুষের মাংস।

সে যার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে তার শরীর ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে। একটা কালো ধোঁয়া গলির মুখেই কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কালো ধোঁয়ার আস্তরণ গায়ে মেখে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মড়ন্তিকা!

"প্রভু কল্লকেশীর জয় হোক!" মড়ন্তিকা সাগরের সামনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ করতেই সাগর রেগে চাপা গলায় গর্জন করে উঠল,

— "তুই! তুই এখানে কেন?" বোঝা যায় মড়ন্তিকার আগমনে সাগর খুশী নয়।

সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠল মড়ন্তিকা। প্রভুকে চটালে তারই যে বিপদ। সে সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে এক হাতে তুলে ধরল লাল শালুতে মোড়া একটা জিনিস! যার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পরে মাটি

ভেজাচ্ছিল।

চকচক করে উঠল সাগরের চোখ। "রঙ্কিনীর জিহ্বা!"

— "হ্যাঁ প্রভু! আমি ওই লোকটাকে মেরে ওর থেকে এই জিবটা কেড়ে নিয়ে এসেছি। আপনার জন্য! আর কোনো লুকোচুরি নয়। আর কোনো দেহের আশ্রয় নয়! এবার আপনি নিজের দেহেই ফিরতে পারবেন।" সাপের মতো হিসহিস করে উঠল মড়ন্তিকার স্বর।

সাগর সঙ্গে সঙ্গে মড়ন্তিকার হাত থেকে কেড়ে লাল শালু খুলে সোনার জিবখানা দুই হাতে তুলে ধরল। আর ঠিক তখনই আশ্চর্য ব্যাপারটা হল। ছবির পর ছবি সরে যেতে লাগলো সাগরের চোখের সামনে। যেন কোনো সিনেমা চলছে। আর তারপর হঠাৎ করেই একটা ঘরের দৃশ্য চোখের সামনে স্থির হয়ে গেল তার। এ কী... এ কী দেখছে সে... এ কাদের দেখছে সে...

— "আমি শুধু জানতাম রঙ্কিনী দেবী আমাদের ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু রাজামশাই কীভাবে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, তা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয় গুরুদেব।" শেষ কথাটা বলতে গিয়ে কঙ্কাবতীর গলা ঈষৎ কেঁপে উঠল। পরনের আজ তাঁর বৈধব্যের শ্বেত পোশাক।

মহর্ষি সেই মুহূর্তেই পাণিশঙ্খের অভিমুখ পরিবর্তন করে দেবীর হাতে চক্র স্থাপন করতেই পাথরের ভারী সিংহাসন পুনরায় নিজের অবস্থানে ফিরে এল।

— "আমিও তখন বুঝতে পারিনি মহারানি। পরে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই বুঝতে পেরেছি এসব দেবীর লীলা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আপনাকে বলেছিলাম, গর্ভ প্রাচীরের একটি প্রাচীরও অবশিষ্ট থাকলে শয়তানের পক্ষে সম্ভব হবে না সেই গর্ভপ্রাচীর ভেদ করে দেবীর জিহ্বা স্পর্শ করার। আপনি আমি ভেবেছিলাম আমরা বুঝি সপ্তগর্ভ প্রাচীর দিয়েই বেষ্টন করতে পেরেছিলাম দেবীর জিহ্বা। আদপে কিন্তু তা হয়নি। দেবীর জিহ্বা অষ্টগর্ভ প্রাচীর দ্বারাই বেষ্টন করা ছিল।"

— "অষ্টগর্ভ?! তা কীভাবে সম্ভব মহর্ষি? আপনি আমি দু-জনেই সাক্ষী সেদিন এই দেবীগৃহে মাত্র সাত জন ছিলেন। আর সাত জন কন্যাই জন্ম নিয়েছিল। আর সাত জন কন্যাকেই রাজা মেরে ফেলেছিলেন। তাহলে অষ্টম

জন কে?"

মহর্ষি মৃদু হেসে রানি কঙ্কাবতীর কোলের দিকে নির্দেশ করলেন, সেখানে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন রাজকন্যা।

— "অষ্টমগর্ভের ফল আর কেউ নন। আপনার কন্যা শিবদ্যুতি।"

— "কী!" চমকে উঠলেন মহারানি কঙ্কাবতী, "অষ্টমগর্ভ রাজকন্যা?"

— "আপনি একদম ঠিক শুনেছেন মহারানি" মহর্ষি শম্ভুপাদের ঠোঁটে প্রশান্তির হাসি। "আপনার কন্যাই দেবীর শক্তি অঙ্গের অষ্টমগর্ভ প্রাচীর!"

— "এসব আপনি কি বলছেন মহর্ষি। রাজকন্যা তো বহু আগেই..."

— "দেবীর মন্দিরে দেবীর বিগ্রহের সামনে জন্ম নিয়েছিলেন। কী? মনে পড়েছে?" মহর্ষি মুচকি হাসলেন, "আপনাকে এও বলেছিলাম সমস্ত পৃথিবী দেবীর গর্ভ। সেখানে সাত জন নারী দেবীর জিহ্বাকে ঘিরে সন্তানের জন্ম দিক বা দেবীর বিগ্রহের সামনে একজন নারী তাঁর সন্তানের জন্ম দিক সব শক্তির উৎস তো সেই এক পরম আদিশক্তি। তা-ই না? সেখানে সামান্য উপাচার দিয়ে কী দেবীর লীলা বাঁধা যাবে?"

— "দেবী নিজের রক্ষাকবচ নিজেই বানিয়েছেন। আপনাকে দেবী তাই স্বপ্ন দেখিয়ে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। আপনার কন্যাকে অষ্টমগর্ভ হিসেবে নির্বাচন দেবীরই সিদ্ধান্ত। তাই এই কন্যা দেবীরই অষ্টম গর্ভ। মা রঙ্কিনীর অষ্টমগর্ভ।"

মহর্ষি দেবীর সিংহাসনের সামনে থেকে চন্দন কাঠের হাতবাক্সটি তুলে নিয়ে দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তিকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন।

রানি কঙ্কাবতী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সব বিপদ তো কেটে গিয়েছে মহর্ষি। তাহলে এটা সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

— "বিপদের কথা কে কখন বলতে পারে মহারানি। কে বলতে পারে কোন রূপ ধরে কীভাবে বিপদ ফিরে আসে। তাই আসল জিহ্বাটি আরও গোপন স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এমন গোপন জায়গায় যার সন্ধান আমি ছাড়া হয়তো আর কেউ জানবে না। এই মুহূর্তে দেবীর সিংহাসনের নীচে একটি অবিকল একই দেখতে নকল জিব রাখা হয়েছে। আপাতত সেটিই

সকলে দেবীর আসল জিহ্বা বলে জানুক। আর আসল জিহ্বাটি লুকোনো থাকবে কালের অন্ধকারে। ঠিক ততদিন পর্যন্ত যতদিন না এর আবার দরকার হয়।"

— "কিন্তু মহর্ষি! আমি কি পারব? একহাতে প্রজা পালন, রাজ্য শাসন আর রাজকন্যার প্রতিপালন। আমি যে একা?"

মহারানির কথায় মুচকি হাসলেন মহর্ষি, "আপনি সেদিনের কথা ভাবুন মহারানি যেদিন আপনি প্রজাপালনের জন্য রাজার বিপক্ষে গিয়েছিলেন, যেদিন আপনার কন্যার রক্ষার্থে স্বামীর বিপক্ষে গিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিনই আমি বুঝেছি। পারলে আপনিই পারবেন। আর চিন্তা কী? দেবীর আশীর্বাদ সর্বদা আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। চিন্তা করবেন না। এবার আমি আসি মহারানি। মা রঙ্কিনীর জয় হোক। রানি কঙ্কাবতীর জয় হোক। রাজকন্যা শিবদ্যুতির জয় হোক।" কথাটা বলেই মহর্ষি শম্ভুপাদ ঠাকুরঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রানি কঙ্কাবতী তাঁর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে।

পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে আপনা থেকে সরে গেল। প্রবল রাগে সোনার জিবটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগর। তারপর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, "এটা নকল জিব!"

— "কী বলছেন প্রভু!" মড়ন্তিকা ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল, "নকল জিব! নকল জিব কী করে আসবে?"

— "শম্ভুপাদ আমাদের ঠকানোর জন্যই নকল জিভ রাজমহলে রেখেছিল। আসল জিব ওর কাছেই ছিল। আর সেই জিব এখনও অষ্টম গর্ভের প্রাচীর দ্বারা ঘিরে রাখা আছে। আসল জিব তুই ধরলেই পাথর হয়ে যেতিস। ঠিক আগের বারে আমি যেমন হয়েছিলাম!"

— "তাহলে এখন উপায় প্রভু?" মড়ন্তিকা ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করে উঠতেই সাগর বলে উঠল, "রাজা জগন্নাথদেবের বর্তমান বংশধরের খোঁজ কর। সেই অষ্টমগর্ভের শেষ জীবিত প্রাচীর! তাকে শেষ না করলে আমি রঙ্কিনীর জিহ্বা ধরতে পারব না।"

— "আর আপনি প্রভু? আপনি কী করবেন?"

— "আমি? শম্ভুপাদ আসল জিব কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা খুঁজব। যা এবার নিজের কাজ কর।"

ঠিক যেমন ভাবে মড়ন্তিকা আচমকা সেখানে উদয় হয়েছিল, সাগরের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্যও হয়ে গেল এক লহমায়। সাগর একবার পাশে পড়ে থাকা সোনার জিবের দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত দেরি না করে সেটা কুড়িয়ে দূরের অন্ধকার আবর্জনার স্তূপের ওপরে ছুঁড়ে দিল। মুম্বাইয়ের আবর্জনার স্তূপে অন্ধকারে জিনিসটা হারিয়ে যেতেই সাগর করাতের পাতের মতো দাঁতগুলো ঘষতে লাগল প্রবল আক্রোশে। আর ঠিক তখনই আবার তার দৃষ্টি গেল ঘুমিয়ে থাকা শিশুগুলোর ওপর।

ঘোলাটে চোখ জোড়া আবার লোভে চক চক করে উঠছে তার। ক্ষিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠছে।

মুখের নাল টেনে সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ঘুমিয়ে-থাকা শিকারের দিকে।

রঙ্কিনীর অভিশাপ

(পিণ্ডপ্রসবা)

অন্ধকার রাত্রি। স্থান এক সুবিশাল শুষ্ক দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর।

কিন্তু এ প্রান্তর নিস্তব্ধ নয় বরং আর্ত, আহতের আর্তনাদে এই প্রান্তর মুখরিত। চারদিকে পড়ে রয়েছে ভাঙা অস্ত্র, ছিন্ন বর্ম আর কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। জায়গায় জায়গায় স্তূপ করে রাখা মৃতদেহ হতে রক্তের ধারা বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে এই প্রান্তরের মাটি। ফলাফল দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে সদ্য শেষ হয়েছে ভয়ঙ্কর এক মহারণ। কিন্তু মৃতদের সৎকারের জন্য কিংবা আর্ত আহতদের সেবার জন্য কেউই বুঝি জীবিত নেই এ তল্লাটে। এই নির্জনতার সুযোগে রাতের আঁধারে নিজেদের গোপন আস্তানা ছেড়ে শেয়াল, হায়নারা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। প্রান্তরে পড়ে থাকা মৃত, আহতদের দেহ হতে মাংস ছিঁড়ে খাওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছে। এ এক বীভৎস নারকীয় দৃশ্য।

আর এই বীভৎস প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মহর্ষি শম্ভুপাদ মশাল হাতে কাকে যেন খুঁজে চলেছেন। স্তূপীকৃত মৃতদেহ সরিয়ে একের পর এক মৃতদেহ তিনি দেখে চলছেন যেন কারো সন্ধানে। কিন্তু কার সন্ধানে সেই মুখ তিনি মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। ঠিক এমন সময় সম্পূর্ণ এক বিসদৃশ স্বর তার কানে এসে ঠেকল।

একটা আর্তনাদ আর চাপা গোঙানি একসঙ্গে মিশলে যে ধরনের আওয়াজ তৈরি হয় এ-ও সেই তেমনই। স্বরটা শুনেই স্বরের উৎস সন্ধানে চতুর্দিকে ছোটাছুটি শুরু করলেন মহর্ষি। কিন্তু অন্ধকার প্রান্তরে তাঁর নজরে কিছুই পড়ল না। শব্দের উৎস সন্ধানে বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ছোটাছুটি করবার পর অকস্মাৎ তাঁর চোখ পড়ল হাত পঞ্চাশেক দূরের এক সুউচ্চ টিলার পাদদেশে। শব্দটা ওই টিলার পাদদেশ থেকেই আসছে। কিন্তু এগোতে গিয়েই পরের মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। মশালের আলোর ব্যাপ্তি বহুদূর পর্যন্ত

নয়। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে টিলার নীচে কাউকে একটা নড়তে দেখা যাচ্ছে।

একমুহূর্ত দেরি না করে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন শম্ভুপাদ। কিন্তু এ কাকে দেখছেন তিনি?

একটা বারো তেরো বছরের কৃষ্ণবর্ণা নগ্ন কিশোরী টিলার নীচে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চাপা গোঙানির আওয়াজ সেই কান্নার স্বরেরই। কিন্তু মেয়েটার হাত চলমান। সে কিছু একটা করছে। কী করছে সেটা এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না তাই তিনি আরেকটু কাছে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কাছে এগোতেই যা দেখলেন তাতে মুহূর্তের জন্য পাথরে পরিণত হলেন তিনি। মেয়েটি উবু হয়ে বসে একটা উঁচু পাথরের ওপর টেনে তুলছে এক একটা মৃতদেহ, তারপর ধারালো খাঁড়ার কোপে মৃতের মুণ্ডুটিকে আলাদা করে একপাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর তারপরেই নিজেই মুণ্ডুহীন ধড়টা টেনে তুলছে টিলার ওপরে। তারপর টিলা থেকে নেমে এসে একইভাবে পরের মৃতদেহের গতি করছে। ঠিক তখনই মহর্ষি বুঝতে পারলেন, যাকে তিনি টিলা ভেবে ভুল করেছিলেন সেটা আসলে টিলাই নয়। এই মেয়েটির তৈরি করা মুণ্ডুহীন দেহের স্তূপ। থরে থরে লাশ জমা করে মেয়েটি এই টিলা তৈরি করেছে। শিউরে উঠলেন মহর্ষি! কে এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ংকরী?

কিন্তু বেশিক্ষণ এ নিয়ে ভাবতে পারলেন না। মেয়েটির দৃষ্টি পড়েছে তাঁর ওপরে। মহর্ষিকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি প্রবল আক্রোশে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর একমুহূর্ত সময় ব্যয় না করে ছুটে এল মহর্ষির দিকে। মহর্ষি পালাতে যাবেন এই ভয়ংকরীর নাগাল হতে কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। তার আগেই ধারালো খাঁড়া ঝলসে উঠল মশালের আলোয়।

আর ঠিক তারপরেই প্রবল আতঙ্কে ভেঙে গেল তার ঘুম।

ধড়পড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসলেন মহর্ষি শম্ভুপাদ।

শরীরের পোশাক ঘামে ভিজে সপসপ করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে প্রবল আতঙ্কে। ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে দক্ষিণ পাশের কুলুঙ্গিতে একখানা মাটির প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। তারই মৃদু আভা ঘরের কিয়দংশ

আলোকিত করেছে। এ কোথায় আছেন তিনি? মাথার ওপর খড়-বিচালি দেওয়া নীচু ছাদ, গোবর দিয়ে নিকানো মাটির দেওয়াল। এ তো রাজমহলের তাঁর আবাসকক্ষ নয়। তাহলে? এ কোথায় আছেন তিনি?

কয়েকমুহূর্ত সময় ব্যয় হল তাঁর ধাতস্থ হতে। তারপর সব কিছু মনে পড়তেই শয্যার ওপরেই দু-হাতে মাথা চেপে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আবার? আবার সেই ভয়ংকর স্বপ্নটা দেখলেন তিনি? দুশ্চিন্তার কালো মেঘটা আবার ঘিরে ধরছে তাঁকে। কেন বারবার এই স্বপ্ন দেখছেন তিনি?

ঘরের শয্যা বলতে কাঠের তৈরি একখানা চৌকি, তার ওপর একখানা ছেঁড়া চাদর। মহর্ষির পরনের পোশাকেও মলিনতা। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ির ঘন জঙ্গল। খুব ভালো করে নিরীক্ষণ না করলে ধলভূমগড়ের মহর্ষিকে এইরূপে চেনাই দায়।

ডান দিকের খোলা জানালার বাইরে তাকাতেই চাঁদের ঈষৎ আলো তাঁর চোখে পড়ল। পাশেই দৃশ্যমান সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ি। ভারতের পূর্বপ্রান্ত হতে বর্ষা বিদায় জানিয়েছে বেশ কিছুদিন। বর্ষাপুষ্ট সুবর্ণরেখা তা-ই আকার আয়তনে বেশ ভরন্ত। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন ধলভূমগড়ের অখ্যাত একটি গ্রাম নয়নফুলিতে। সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এই গ্রামটি সাম্রাজ্যের একেবারে সীমান্তে।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল তিনি প্রাসাদ ছেড়েছেন। তারপর থেকেই তিনি সাম্রাজ্য আর সাম্রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন প্রান্তে ছদ্মবেশে ঘুরছেন। সঙ্গে রয়েছে দেবী রঙ্কিণীর স্বর্ণজিহ্বা। রাজা জগন্নাথ দেবের মৃত্যুর পর পরেই তিনি আসল স্বর্ণজিহ্বা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিরুদ্দেশের যাত্রায়। উদ্দেশ্য ছিল দেবীর আসল স্বর্ণজিহ্বাকে সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা। কিন্তু তিনি পারেননি। হয়তো পূর্বের দুই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এক শঙ্কা বদ্ধমূল করেছিল, যে এই জিহ্বা কাছছাড়া করলেই ভয়ংকর অনর্থ ঘটবে। তাই তিনি আজও নিজের সাথে এই জিহ্বা নিয়ে ঘুরছেন। ভবিষ্যতে জিহ্বার দ্বারা কেউ কোনো অনিষ্ট সাধন করতে এলে তা যাতে কার্যকরী না হয় তাই তিনি আসল জিহ্বার প্রতিরূপ একটি স্বর্ণজিহ্বা রেখে এসেছিলেন

রাজবাড়ির কূলদেবীর সিংহাসনের নীচে। সবকিছু প্রায় ঠিকই ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই জিহ্বার রক্ষাকল্পেই তিনি তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করে দেবেন। কিন্তু আচমকাই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এই স্বপ্নের আগমন। তিনি বুঝতে পারছেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। খুব ভয়ংকর কিছু। এ তারই ইঙ্গিত। ঠিক এমন সময় আচমকা কী একটা মনে হতেই জানালার বাইরে তাকালেন মহর্ষি।

মুহূর্তেই জ্যা ছেঁড়া ধনুকের ন্যায় বিছানা ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়ালেন শম্ভুপাদ। মহর্ষির চোখের দৃষ্টি বহুদূরের এক আলোকবিন্দুর ওপরে বিন্যস্ত। আলোটি আসছে সুবর্ণরেখার অপরপ্রান্তে থাকা ধলভূমগড়ের প্রতিবেশী রাজ্য নিশিগড় রাজ্যের সীমানায় জেগে থাকা দক্ষিণপূর্বের কোনো একটি পাহাড় থেকে। দক্ষিণপূর্বের পাহাড়ে আলো জ্বলে উঠেছে, অর্থাৎ হাতে সময় খুব বেশি নেই।

জানালার কাছ থেকে অতিদ্রুত সরে এলেন তিনি। তারপর আরো দ্রুততার সাথে চৌকিটাকে একপাশে ঠেলে দিতেই দেখা গেল চৌকির নীচে একটা হাতখানেকের কাঠের পাটাতন। শম্ভুপাদ সেই কাঠের পাটাতন সরিয়ে ভিতর থেকে বের করে আনলেন একটা চন্দন কাঠের কারুকার্য করা ছোট বাক্স। এই বাক্সের মধ্যেই রয়েছে রঙ্কিনী দেবীর আসল স্বর্ণজিহ্বা। এই জিহ্বার পাহারায় গত একমাসে প্রাতঃকর্ম আর স্নানাদি ছাড়া ঘরের বাইরে কখনও পা রাখেননি মহর্ষি।

বাক্সটাকে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেই চৌকিটাকে পুনরায় আগের জায়গায় রেখে দিলেন। ঘরের এককোণে রাখা ছিল এক কাপড়ের পুঁটুলি, সেই পুঁটুলিকে কাঁধে তুলে চন্দন কাঠের বাক্সটাকে সেই পুটুলির ভেতরে চালান করে দিলেন। তারপর এক কালো চাদরে নিজেকে ঢাকা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানী হাতে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এইসময় এই গ্রামে অকারণে আসেননি মহর্ষি। এই গ্রামে আসার একমাত্র কারণ ছিল ওই দক্ষিণ পূর্ব কোণের পাহাড়ের বুকে জ্বলা আলো। বছরে একবারমাত্র জ্বলে এই আলো, সেটাও কিছুক্ষণের জন্য। যা কেবল দৃশ্যমান হয় এই গ্রাম থেকেই।

এর আগেও একবার তিনি এই গ্রামে এসেছিলেন ওই আলোর উৎসের সন্ধানে, তখন অবশ্য এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়নি। মহর্ষি দেরী না করে দ্রুত অন্ধকারে মিশে গেলেন। তাঁর দেরি করা চলবে না, তাঁকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

রাত্রি তখন তিনপ্রহর।

আচমকা একটা বিকট চিৎকারে কেঁপে উঠল পুরো ভীমনগর গ্রামটি। চিৎকারটি ভেসে এসেছে গ্রামের একদম শেষের বাড়িটা থেকে। এই বাড়িটি রামলাল সরেনের। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি আগেই হয়েছে। এ সেই রামলাল সরেন যার স্ত্রী তারাসুন্দরী রঙ্কিণী দেবীর নিদ্রাকালে জিহ্বার গর্ভপ্রাচীর নির্মাণে অংশ নিয়েছিল। এরই কন্যাকে হত্যার অপরাধে রাজা জগন্নাথ দেকে, কারাবন্দী করা হয়েছিল। সে প্রায় বছর খানেক আগের ঘটনা। তারপরে সুবর্ণরেখা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভীমনগর সহ পুরো ধলভূমগড় মহারানি কঙ্কাবতীর সুযোগ্য শাসনে স্বচ্ছল। সব কিছুই যখন প্রায় ঠিকঠাক চলছিল, ঠিক এই সময়ই এমন কিছু একটা ঘটল যা ভীমনগর তো বটেই সমগ্র ধলভূমগড় সাম্রাজ্যকে এক লহমায় স্তম্ভিত করে দিল।

রামলাল সরেনের বাড়ির বাইরে কিছু লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল উদ্বিগ্ন মুখে। এরা সকলে সকলে এ গ্রামেরই লোক। আচমকা এই আর্তচিৎকারে তাতে কেবল ওরাই নয়, এই গভীর রাত্রে যারা যারা নিজেদের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল তারাও ঘুম ভেঙে উঠে বসল। দেখতেই দেখতে সারা গ্রামের লোকজন জড়ো হল রামলালের কুটির এর সম্মুখে। আগে থেকেই যারা উপস্থিত ছিল, তারা গ্রামের মুরুব্বি গোছের। ঘরের ভেতরে তখন উপস্থিত তারাসুন্দরী, গ্রামের দাই নতুবালা দাসী, আর রামলালের মা বিজলী সরেন। রামলালের স্ত্রী গর্ভপ্রাচীরের পর দ্বিতীয়বার গর্ভ ধারণ করেছিল। দাই-এর অনুমানে কয়েকদিনের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু আচমকাই

তারাসুন্দরীর আচরণে পরিবর্তন শুরু হয়। বেশি বেশি করে খাওয়াদাওয়া, স্নান না করা, সবসময় বিড়বিড় করে কোনো অদৃশ্যজনের সঙ্গে কথা বলা, পরনের কাপড়ে মলমূত্র ত্যাগ করা, নিজেকে অপরিষ্কার রাখা। এসবই করতে শুরু করে। ভয় পেয়ে রামলাল গ্রামের মুরুব্বিদের ব্যাপারখানা জানায়। তারাসুন্দরীকে গ্রামের সকলেই গর্ভপ্রাচীরের পর শ্রদ্ধার চোখে দেখত, আকস্মাৎ তার এই পরিবর্তন সকলকে বিচলিত করে তোলে। বদ্যি ডেকেও এ সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। দেখতেই দেখতে সেই প্রসবক্ষণ উপস্থিত হয়। গ্রামের মুরুব্বিরা মনে করেন যেহেতু তারাসুন্দরী দেবী নির্বাচিতা, তা-ই তার পরবর্তী সন্তানও গ্রামে সৌভাগ্য বহন করে আনবে। তাই তারা মধ্যরাত্রে স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরিধান করে হাজির হয় তারাসুন্দরীর ঘরের বাইরে। কিন্তু আচমকাই এই চিৎকারে বাকিদের সঙ্গে তারাও অবাক হয়ে যায়।

রামলাল দেরি না করে দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আচমকাই একটা হুটোপুটির আওয়াজ। বাইরে উপস্থিত সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। কী হচ্ছে ঘরের মধ্যে?

এমন সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে নতু দাসী ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। সারা শরীরে, পোশাকে, হাতে পায়ে কালো কাদার ছোপ।

“ওমা... গো। পালা... পালা কিনে তোরা...” ঘরের বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করে ওঠে সে তারপর আর একমুহূর্ত দেরি না করে ছুটে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। মুরুব্বিরা গ্রামের কিছু মহিলাদের নির্দেশ দিলো, ভেতরে কী ঘটেছে তা জানার জন্য। মহিলারা ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ওদের নাকে ধাক্কা মারল এক বিশ্রী পচা গন্ধ। ওরা নাকে কাপড় চাপা দিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটাই মাত্র প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। ঘরের এককোণে বিচালির বিছানায় তারা সুন্দরীর নিষ্প্রাণ দেহ। চোখের দৃষ্টি, যেন অদ্ভুত আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চমকে উঠল মহিলারা। এ কী? এই থকথকে কালো কাদা এল কোত্থেকে। তারাসুন্দরীর বিছানা থেকে বেরিয়ে সারা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে অদ্ভুত ধরনের কালো থকথকে কাদা। দুর্গন্ধটা ওই কাদা থেকেই আসছে। বিছানার অনতিদূরেই হাঁটু গেঁড়ে বসে রয়েছে রামলাল।

বিস্ফারিত দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত যেখানে রামলালের মা বিজলি সরেন বসেছিল উবু হয়ে। বিজলীর সারা শরীরও ওই অদ্ভুত কাদায় মাখামাখি। কিন্তু বিজলীর হাতে ওটা কী? প্রদীপের আলোয় দেখা গেল, বিজলির হাতে কালো কাদা মাখা মুখ, নাক, চোখ হাত পা বিহীন এক মাংসপিণ্ড। যার দেহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে একটু একটু করে নড়ছিল। এই ভীমনগরের সৌভাগ্য, গর্ভপ্রাচীর সৃষ্টিকারিণী তারাসুন্দরীর দ্বিতীয় সন্তান।

*   *   *   *   *   *   *   *

ঘন জঙ্গলের মধ্য আকাবাঁকা পাকদণ্ডী বেয়ে দীর্ঘপথ ওপরে উঠে এসেছেন মহর্ষি। দিনের আলোয় এখানে দাঁড়ালে নীচের সুবর্ণরেখার শান্ত ধারা দেখতে পাওয়া যায়। মহর্ষির হাতে এই মুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল। সেই মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে তার পরনের পোশাক ভিজে একসা। এই গহীন রাতে সুবর্ণরেখা সাঁতরে পার হওয়া ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিল না। এমন সময় কাছে পিঠেই শোনা গেল হায়নার বুকের রক্ত জল করা হাসি। এই জঙ্গল ঘন। হিংস্র শ্বাপদকুলে পরিপূর্ণ। এছাড়া বিষাক্ত সাপের উৎপাত ও কম নয়। এখানে অস্ত্রহীন হয়ে আসাটা তাঁর উচিত হয়নি। কিন্তু একজন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কাছে অস্ত্র থাকা শোভন নয় তাই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন বহুদিন। গতবার তিনি যখন এই স্থানে এসেছিলেন, দেবী রঙ্কিনীর সোনার খড়গ তাঁর সাথেই ছিল, এছাড়াও তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর পালিতা কন্যা লল্লটা। ধলভূমগড়ের সবচেয়ে সুদক্ষ যোদ্ধা। অথচ এবারে তিনি একাই।

পার্থিব আক্রমণে তাঁর ভয় নাই। হায়না, শেয়াল, বিষধর সাপ তিনি এই বয়সেও প্রতিহত করতে পারেন খালি হাতেই। কিন্তু যেখানে যাচ্ছেন সেখানে সবকিছুই তো পার্থিব নয়। অন্তত দেবীর খড়গটুকু তাঁর সঙ্গে থাকা উচিত ছিল।

পথ চলতে চলতেই আচমকা মহর্ষি থমকে দাঁড়ালেন। পাহাড়ের ঢালে তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানা উঁচু নিরেট পাথরের দেওয়াল।

মহর্ষি মশালের আলোয় দেখলেন দেওয়ালের গায়ে স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। একটা তৃপ্তির হাসি খেলে গেল মহর্ষির মুখে, দীর্ঘদিন পরেও তিনি সঠিক জায়গায় সঠিক সময়েই উপস্থিত হতে পেরেছেন।

শম্ভুপাদ দেরি না করে দেওয়ালের একটি নির্দিষ্ট খাঁজে আঙুলের চাপ দিতেই পাথরে পাথর ঘষা লাগার একখানা শব্দ পাওয়া গেল। আর তারপরেই আচমকা পাথরের দেওয়াল কোনো এক যান্ত্রিক উপায়ে দু-দিকে সরে গিয়ে মাঝখানে একটা একটা পথ তৈরি করে দিল।

ঠিক এমন সময়ই পেছনের গাছের আড়াল হতে একটা সড়সড় শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন মহর্ষি। পেছনটা অন্ধকার, তবুও তিনি মশালের আলো উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কেউ কী তাঁর পিছু নিয়েছে? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না তিনি।

মহর্ষি আর দেরি করলেন না। দেওয়ালের এই ফাঁক বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই পথ শেষ হবে এক ক্ষয়িষ্ণু সুদীর্ঘ পাথরের সিঁড়ির সম্মুখে। সেই সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা পথ উঠলে তবেই সেই আলোকের উৎসস্থলে পৌঁছোনো যাবে। তিনি সময় ব্যয় না করে দ্রুত দেওয়ালের ফাঁকে অদৃশ্য হলেন। জায়গাটা মহর্ষির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে উঠল। আর ঠিক তার পরেই অন্ধকার বনানীর ঢাল ছেড়ে একখানা কালো শরীর পাকদণ্ডীতে উঠে দাঁড়াল। এই শরীর মহর্ষির পিছু নিয়েছে সেই গ্রাম থেকে। আরেকটু হলেই মহর্ষির হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছিল সে। নেহাত সঠিক সময়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল তাই রক্ষে। ছায়া শরীরটি আর দেরি করল না। দেওয়ালের ফাঁক বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত সে মহর্ষির পথ অনুসরন করল।

(কালোরাক্ষসের পুরোহিত)

রাত্রি তখন কত হবে?

ভীমনগর গ্রামের দক্ষিণদিকে দিগন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। পাথুরে জমি হওয়ার জন্য খুব একটা ফসলি নয় এগুলো। এই জমির আরো দক্ষিণে পঞ্চাশ পা এগোলেই সুবর্ণরেখার বালিয়াড়ি। এই মুহূর্তে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনা পনেরোর একটি দল। তাদের কিছুজনের হাতে লণ্ঠন আর মশালের আলো। দলের মধ্যে রামলাল আর ভীমনগরের মুরুব্বিরা রয়েছেন। দুটো লোক কোদাল চালিয়ে নদীর তীরের এক অংশে একটা গর্ত খুলছে। ওদেরই একপাশে একটা চটের বস্তায় মুখবাঁধা অবস্থায় কিছু পড়ে রয়েছে। যার ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সেই কালো কাদা বাইরে বেরিয়ে আসছে।

— "তুরা, তাড়াতাড়ি হাতটা চালা। একটু গভীর করে গত্তটো খোঁড়। নইলে শিয়াল, কুকুরে গন্ধ পেলে টেনে তুলবে মাটি থেকে।" দলের মধ্যে থেকে একটি প্রৌঢ়লোক যারা গর্ত খুঁড়ছিল তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিল, "ইটাকে তাড়াতাড়ি কবরটো দিয়ে ইখান থেকে পালানো মঙ্গল। বড় অশুভ জিনিস মালুমটো হচ্ছে।"

— "হ, উদিকে আবার রামলালের বউটারও তো সৎকার করতেটো হবে। লে লে তুরা হাত চালা কিনে। বড় লড়লড় করু।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বালির চরে হাঁটু পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে উঠে এলো, দুটি লোক। তারপর অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দু-জনে মিলে গর্তের মধ্যে বস্তাটাকে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে বালি চাপা দিয়ে জায়গাটাকে সমান করে দিল।

রামলাল আর থাকতে না পেরে, হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। স্ত্রী, সন্তান হারানো লোকটার বুকফাটা কান্নার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল সুবর্ণরেখার বাতাসে।

বয়স্ক সনাতন দাস, রামলাল'কে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুর মনের বেদনটো বুঝি। ই যন্তনাটোর ভাগ মুরা কেউই লিতে পারবুনি। তবে কী করবি রাম? শক্ত হ। মনে করবি যা হইয়েছে সবই মা রঙ্কিণীটোর ইচ্ছায়। মায়ের আশীর্বাদ

ভেবে...”

— “না খুড়া।” আচমকা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল রামলাল। চোখে মুখে বিধ্বস্ত ভাব মুহূর্তেই বদলে গিয়েছে প্রবল রাগে।

— “ই রঙ্কিণীর আশীর্বাদটো লয়। ই উহার অভিশাপ।”

— “চুপ চুপ!” আতঙ্কে শিউরে উঠল গ্রামের লোকেরা, “ই কী বলছিস রাম? ই কথাটো মুখে আনতে লাই রে...”

— “ঠিক বলছি খুড়া...!” রামলালের গলায় এক অনমনীয় তেজ ফুটে উঠছে। যার সঙ্গে মিশে আছে, রাগ। আর কিছু না করতে পারার ব্যর্থতা।

— “গাঁয়ে এত বাচ্চা হইঞ্ছে, কেউ তো এরকম করে মরে লাই। মোর বউটো গেছিল রাজবাড়িতে, রঙ্কিণীর জিবটো রক্ষাটো করিতে। রঙ্কিণীকে সে বাঁচাইছিল, কিন্তু আজ রঙ্কিণী মোর বউ, বাচ্চাকে বাঁচাইতে লারে। তাহলে উ কীসের দেবী? উ দেবী লয়। উ ডাকিনী বটে... ডাকিনী। তুরা বলিস না? হেতায় যা হয় তা রঙ্কিনীটোর ইচ্ছায়। তাহলে এই অমঙ্গলও তাঁর ইচ্ছায় হইঞ্ছে। আমার বউ বাচ্চাকে খেয়েছে উ... ই তাঁরই অভিশাপ খুড়া। ই তাঁরই অভিশাপ...”

সাথে সাথে প্রবল আক্রোশে কাঁধের গামছাটা ফেলে গ্রামের দিকে দৌড় লাগালো রামলাল। হতবাক হয়ে দলের বাকিরা তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন ভয়ংকর কথা শোনাও যে পাপ। এ কী বলল রামলাল? ঠিক এমন সময় ওদের দলের মধ্য থেকে কারোর কিছু একটা মনে হতে লণ্ঠন তুলে বাচ্চাটিকে পুঁতে দেওয়া জায়গাটি যেই দেখল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল তার গলা থেকে। সকলে চমকে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জায়গাটা দেখতেই আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল ওরা। যেই জায়গায় বাচ্চাটিকে পোঁতা হয়েছিল, সেই জায়গার হলুদ বালি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে লোকজন প্রবল আতঙ্কে শাবল, কোদাল ফেলে কোনওরকমে গ্রামের দিকে ছুটে পালাল। এ বড় খারাপ ইঙ্গিত। বড়ই খারাপ ইঙ্গিত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে যেতে, অন্ধকার ঝোপের

মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এল এক কালো চাদরে ঢাকা শরীর। সে এদের গ্রাম থেকে অনুসরণ করছে। অন্ধকারের মধ্যেই একপাশে পড়ে-থাকা কোদাল তুলে সেই জায়গাটাই কোপাতে লাগল, যেখানে একটু আগে সেই অশুভ জিনিসটিকে পুঁতেছিল ওরা।

কিছুটা গর্ত হওয়ার পর, গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বস্তাটা টেনে বের করে আনল সেই রহস্যময় ব্যক্তি। বস্তার মুখের বাঁধন খুলে জিনিসটাকে টেনে বের করে আনতেই তার সারা হাত ভরে উঠল চটচটে কালো কাদায়।

এই শরীরটা নিয়ে তাকে যেতে হবে সেই গুহায় যার মাঝবরাবর আছে সেই ইঁদারা। আর ইঁদারার অনেক নীচে ঘুমিয়ে আছে শয়তান প্রভু কল্লকেশী। শম্ভুপাদ ভেবেছিল, রাজার পাথরের মূর্তি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ইঁদারায় নিক্ষেপ করলেই বুঝি প্রভুকে হারানো যাবে। কিন্তু প্রভুর মায়া বোঝার সাধ্যি কারই বা আছে? প্রভু নিদ্রায় থেকেও যা করতে পারলেন তা একটু আগে নিজের চোখে দেখেছে রহস্যময় ব্যক্তি। লোকের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। লোকে রঙ্কিণীকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। এরপর আরো যত দিন যাবে তত লোকের বিশ্বাস উঠে যাবে দেবীর মহত্ব থেকে। আর ভক্তের বিশ্বাস,আস্থাই তো দেবীর শক্তি। সেটাই যদি না থাকে, তাহলে... রঙ্কিণীর শক্তিও থাকবে না। এখন শুধু দরকার প্রভুর পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করা।

* * * * * * * *

জায়গাটা পাহাড়ের চূড়া, কিন্তু শৃঙ্গের মতো খাড়া নয়। বরং খানিকটা পালঙ্কের পৃষ্ঠদেশের মতো সমতল। মহর্ষি চারদিকে তাকালেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। চারিদিকে ভারী কুয়াশার মতো ঘন সাদা আস্তরণ। প্রবল হাওয়ায় পোশাক, চাদর থেকে শুরু করে মশালের আগুন পর্যন্ত যেখানে টিকিয়ে রাখা দায় সেখানে এই সাদা ধোঁয়ার আস্তরণ যেন অবিচল। মহর্ষি জানেন এ সাদা ধোঁয়া মায়া বই আর কিচ্ছু নয়। সাধারণের দৃষ্টি থেকে এই স্থানকে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশেই এই মায়া ।

দীর্ঘপথ একটানা উঠে এসেছেন মহর্ষি। দমটা হালকা হয়ে আসছে। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তাঁর উপায় নেই। এই জায়গায় সজাগ না থাকলেই বিপদ।

আকস্মাৎ মহর্ষির নজরে পড়ল সামনেই নিভে যাওয়া একটা যজ্ঞবেদীর ওপর। একটু আগেও নিশ্চয়ই ওই যজ্ঞবেদীতে আগুন জ্বলছিল। তা না হলে পোড়াকাঠ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীই বা ঊর্ধ্বাকাশে উঠবে কেন?

মহর্ষি আর দেরি না করে হাতের মশালটা সেই যজ্ঞবেদীতে ছুঁড়ে দিতেই যজ্ঞবেদীর নিভে যাওয়া কাঠ দাউদাউ করে নীল আগুনে জ্বলে উঠল। এক মায়াবী নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

মহর্ষির মনে প্রশান্তি। এবার তাঁরা আসবেন। নির্দিষ্ট তিথিতে এই নীল আলো তাদের আহ্বান এর সংকেত। বছরের এই একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তেই এই পাহাড়ে তাঁদের দেখা যায়। তাঁরা মর্ত্যগন্ধর্ব। অগাধ জ্ঞান তাদের ঝুলিতে। প্রেতপর্বতের পিশাচ সাধক গুণীনের ক্ষমতা যেখানে শেষ সেখানেই এদের ক্ষমতার শুরু। যে স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শান্তি কেড়ে নিয়েছে তার গুঢ় অর্থ এদের কাছ ছাড়া কারোর থেকেই জানা সম্ভব নয়। তাই এই দুর্গম পথ পার হয়ে এদের কাছে এসেছেন মহর্ষি। যদিও তাঁর এখানে আসা এই প্রথমবার নয়। একবছর আগেও তিনি এখানে এসেছিলেন। এরাই তাঁকে জানিয়েছিল, কীভাবে রঙ্কিণীর জিহ্বাকে রক্ষা করতে গর্ভ প্রাচীর তৈরি করতে হবে। এরাই জানিয়েছিল মহর্ষিকে, যদি রাজা স্বয়ং নিজের হাতে সেই সপ্ত কন্যাকে হত্যা করেন তাহলে রাজার শক্তিক্ষয় হবে। সেইদিন সেই সমস্যা থেকে এরাই মহর্ষিকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, আজও এরা মহর্ষিকে সমস্ত ধন্দ থেকে মুক্তি দেবে।

মহর্ষি হঠাৎ টের পেলেন বেদীর নীলাভ আলো যেন আপনা থেকেই কমে যেতে লাগলো। হু হু করে নামতে লাগল, জায়গাটার তাপমাত্রা।

ওই... ওই যে তারা আসছে। সেই ভয়ংকর অন্ধকারে জীবেরা। আলোর দূতেরা আসার আগে যারা এসে পৌঁছোয় সেই সব জীবেরা। কী হবে এবার? তিনি তো নিরস্ত্র। আচমকা তিনি হঠাৎ করেই দেবীর স্বর্ণখড়গের অভাব বোধ

করতে লাগলেন। ওদিকে বেদীর আলো কমতে কমতে প্রায় যখন নিবু নিবু ঠিক তখনই মহর্ষি দেখতে পেলেন, পাহাড়ের খাদ বেয়ে পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে উঠে আসছে অগণিত ভয়ংকর জীব। হাড়ের খাঁচার উপর দগদগে পোড়া মাংসের আস্তরণ। মুখে চোখ নাকের বালাই নেই, বরং সারা মুখ জুড়েই সুতীক্ষ্ণ দাঁতের সারি।

মহর্ষি পুঁটুলিটা বুকে চেপে ধরলেন। এরা অন্ধকারের জীব, তাই অন্ধকারের প্রতীক্ষা করছে। যজ্ঞবেদীর আলোটা নিবে গেলেই এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে মহর্ষির উপরে। ইশ! কেন যে মশালের আলোটা যজ্ঞবেদীতে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি? মহর্ষির নিজের যেন হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। ওদিকে শয়তানের দল মহর্ষিকে ঘিরে নিজেদের বৃত্তটা ছোট করছে। ওদের অঘোষিত চাপা হুঙ্কার শুনতে পারছেন মহর্ষি। বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি মৃত্যুর জন্য তিনি তৈরি ছিলেন না। অন্তত স্বপ্নের অর্থটুকু জানতে পারলে...

ঠিক এমন সময় শেষ আলোক বিন্দুটুকুও নিবে যেতেই চারিদিক ঘটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটল যার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলেন না খোদ মহর্ষি।

"জয় মা রঙ্কিণী!"

আচমকাই কেউ একজন মহর্ষির পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কে সেটা মহর্ষি ঘুরে দেখার আগেই এক চোখ-ধাঁধানো তীব্র সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেই সঙ্গে হু হু করে গরম হাওয়া। যেন আগুনের হলকা বইছে চতুর্দিকে। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কী যে হল তা বুঝে ওঠার আগেই আবার আলোর তেজ কমে গেল। সেই সঙ্গে কমে গেল গরম হাওয়ার তীব্রতা।

মহর্ষি ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখলেন তাঁর সম্মুখে এক হাতে দেবী রঙ্কিণীর সোনার খড়গ আর অন্যহাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কেউ নয়, এই বিপদে যার অভাব সবচেয়ে বেশি বোধ করছিলেন, সেই তাঁর পালিতা কন্যা স্বয়ং লল্লটা।

*　*　*　*　*　*　*　*
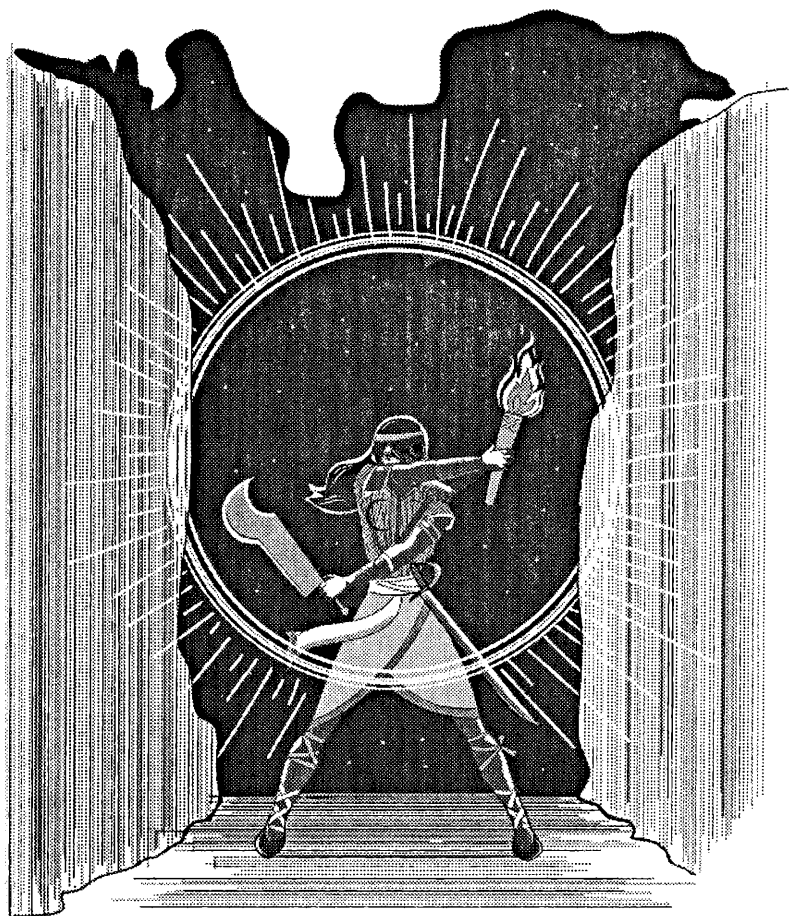
গুহার মুখটা আর আগের অবস্থায় নেই। এবড়ো-খেবড়ো, বড় বড় পাথরের চাঁই স্তূপীকৃত করে জমা রাখা এখানে-ওখানে। এক পলক দেখলেই মনে হবে জায়গাটা জুড়ে যেন কোনো ধ্বংসলীলা হয়ে গিয়েছে। গুহার মধ্যকার এই ধ্বংসলীলা মহারানির কঙ্কাবতীর নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা করছেন। ধীরে ধীরে ভাঙা পাথরগুলোর ওপর পা দিয়ে সামনে এগিয়ে চলছে সেই ব্যক্তি। শরীর কালো চাদরে ঢাকা। একহাতে একটা মশাল, অন্য হাতে একটা কাদা মাখানো মাংসপিণ্ড।

একটার পর একটা পাথরে পা দিয়ে সেই রহস্যময় ব্যক্তি হাজির হল, গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে। গুহার ভেতরটা চেনা দায় এইমুহূর্তে। কিন্তু সে জানে এখানেই কোথাও ছিল ইঁদারার মুখখানা। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাথরের আড়ালে দেখতে পাওয়া গেল, একটা কালো গহ্বর।

লোকটি দেরী না করে, মশালটা গুহার পাথরের খাঁজে গেঁথে দিল। তারপর একহাত দিয়ে পাথরগুলো সরিয়ে ইঁদারার মুখটা কিছুটা ফাঁকা করল। এই ফাঁকা জায়গাটুকু দিয়েই তার কাজ হয়ে যাবে।

সে দেরি না করে কালো গর্তের ভেতরে মাংসপিণ্ডটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা চাপা মেঘের গর্জনের মতো আওয়াজ ভেসে এলো ইঁদারার ভেতর থেকে। তারপর কোমরে গোঁজা ছুরিখানা বের করে কাদা মাখা হাতটার করতল বরাবর ফালা করে কেটে নিতেই সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়তে লাগল রক্তের ধারা। রহস্যময় ব্যক্তি আর দেরী করল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাতটা মেলে ধরল গর্তের মুখে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত একটু একটু করে পড়তে লাগল, ইঁদারার ভেতরে আর লোকটির গলা থেকে বেরিয়ে এল রহস্যময় মন্ত্রপাঠ। ওদিকে ইঁদারার ভেতর থেকে চাপা গুড়গুড়ে আওয়াজটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। ঠিক যেন আওয়াজটা অতল গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে।

আর তারপরেই লোকটি কী একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা সবুজ আলোর বিস্ফোরণ হল সমস্ত গুহা জুড়ে। সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত স্বর ছড়িয়ে পড়ল পুরো গুহা জুড়ে। লোকটি চারদিকে চোখ মেলে দেখল, ইঁদারার চারপাশটা মন্ত্রবলে যেন আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর কোনো পাথরের ভাঙা চাঁই ইঁদারার ধারে পাশে নাই। এই সবে একটি অংশ উৎসর্গ করা গিয়েছে প্রভুর উদ্দেশ্যে। এখনও বাকি ছ-টি। গর্ভপ্রাচীর যে রক্তে শক্তিশালী সেই রক্ত দিয়েই প্রভুর পুনঃজাগরণ হবে। এরপরে দরকার রঙ্কিণীর স্বর্ণজিহ্বা।

এখন তার অনেক দায়িত্ব। তারাসুন্দরীর গর্ভের সন্তানকে সে যেমন বদলে দিয়েছে ভীমনগরের কালো অভিশাপে। ওমনি বাকি ছ'জনের সঙ্গেও করতে হবে। তারজন্য শুধু তাকে একটু ছল করতে হবে। প্রভুর দেহাংশের গুঁড়ো ওদের খাদ্যের সঙ্গে কোনক্রমে মিশিয়ে দিতে পারলেই বাকিটা প্রভু সামলে নেবেন। কখন যে গর্ভপ্রাচীর সৃষ্টিকারী রমণীর গর্ভের সন্তান প্রভুর দেহাংশে পরিণত হয়ে যাবে তা তারা টেরও পাবে না।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই একপাশে খসে পড়ল তার কালো চাদর খানা। ওমনি মশালের আলোয় ফুটে উঠল, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, মুণ্ডিত মস্তকের অধিকারী, গৌরাঙ্গ বর্ণধারী প্রধান বিকশবাহুর অবয়ব। প্রভু আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন, কিছু একটা বিপদ হতে পারে তার পরিকল্পনায়, তাই তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। আর এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য তাকে কারা থেকে মুক্ত করেছিলেন প্রভু। এখনও অবশ্য অনেক কাজ বাকি আছে। যে অবিশ্বাসের ফুলকি আজ সে রামলালের চোখে দেখেছে, সেই ফুলকিকে ছলে, বলে, কলা কৌশলে দাবানলে পরিবর্তন করতেই হবে। তাহলেই একমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্য সফল হবে নতুবা নয়।

— "আমায় বাঁচিয়ে রেখে বড় ভুল করেছিলে শম্ভুপাদ। বড়ই ভুল করেছিলে...। তোমার উচিত ছিল আমায় সেদিনই মেরে দেওয়া।"

মশালের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, সেনাপতি বিমল ওরফে প্রধান বিকশবাহু।

(জিহ্বার কালো ছোপ)

"লল্লটা? তুমি এখানে কীভাবে?", শম্ভুপাদের কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

লল্লটা এসে মহর্ষির পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

— "দেবী রঙ্কিনী তোমার মঙ্গল করুন।"

— "আপনি প্রাসাদ ছেড়ে যতই আত্মগোপন করে থাকুন, আপনার গতিবিধির ওপর আমার সবসময়ই নজর ছিল। আচমকা একদিন চর মুখে যখনই জানতে পারলাম আপনি বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করে শেষে এইসময় কুলতলি গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই বুঝেছিলাম আপনার আসল উদ্দেশ্য এখানে আসা। কিছু কী হয়েছে? যার জন্য এখানে ফের আসতে হল আপনাকে..."

— "সব বলব তোমায়... তবে তার আগে আমার নিজের কাছেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমি নিজে খুব ধন্দে আছি... একাধিক প্রশ্ন আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। তারই উত্তরের খোঁজে..."

মহর্ষি কথা শেষ করতে পারলেন না, তার আগেই যজ্ঞবেদীর আগুনটা ফের ধক করে নীলআভায় জ্বলে উঠল, সেই সঙ্গে সুমিষ্ট অগুরুর সুবাস ছড়িয়ে পড়ল চরাচর জুড়ে। ওরা আসছে...

ঠিক পরের মুহূর্তেই নীলাভ আলোয় দেখা গেল, সাদা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনখানা অবয়ব।

শরীরখানা সাদা জোব্বায় ঢাকা। জোব্বার আড়াল হতে রক্তহীন ফ্যাকাসে চামড়ার খুব স্বল্প অংশই দৃশ্যমান। চোখ, কপালসহ পুরো মাথাটা সাদা ফেট্টি দিয়ে আঁটানো। দেখা যাচ্ছে কেবল টকটকে লাল ঠোঁটজোড়া।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে নতজানু হয়ে বসলেন মহর্ষি শম্ভুপাদ আর লল্লটা।

— "মর্ত্যগন্ধর্বদের আমার প্রণাম..."

— "শম্ভুপাদ..." একটা রিনরিনে সুরেলা স্বর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, "তুই আবার এসেছিস...?"

— "আবার কোনো বিপদে পড়লি বুঝি...?" এবার অন্যজনের গলা।

— "আপনাদের অজানা কিছুই নেই। একটা স্বপ্ন... আমায় কয়েকমাস স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বুঝতে পারছি প্রত্যেকবারের মতো এ-ও দেবীর কোনো এক ইঙ্গিত। কিন্তু কী সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না... তাই আপানদের স্মরনাপন্ন হয়েছি।"

তারপরেই মহর্ষি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বপ্নটিকে বর্ণনা করলেন। বর্ণনা শেষে নিজেই আবার বলে উঠলেন, "এতটা পর্যন্ত তবুও ঠিক ছিল। বুঝতে পারছিলাম দেবী কোনো ইঙ্গিত দিতে চাইছেন। তা-ই এই স্বপ্ন বারবার দেখাচ্ছেন। কিন্তু আচমকা দিন পনেরো আগে আমি এমন কিছু টের পাই, যা আমার ভাবনা চিন্তাকে প্রায় লীন করে দেয়।" কথাটা বলেই তিনি পুঁটুলির ভেতর থেকে চন্দনকাঠের বক্সটা বাড়িয়ে দিলেন তাঁদের উদ্দেশে। একজন বাক্সটি হাতে নিতেই মহর্ষি বলে উঠলেন, "আপনাদের পরামর্শ মেনেই আমি নকল জিহ্বা কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে রেখে আসল জিহ্বা নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। প্রতি অমাবস্যায় আমি জিহ্বাকে তন্ত্র উপাচারে শুদ্ধ করি। কিন্তু গত অমাবস্যায় উপাচারের মুহূর্তে আমি আমি জিহ্বার এই পরিবর্তন আবিষ্কার করি। আমার বিশ্বাস, স্বর্ণজিহ্বার এই পরিবর্তন, আর আমার স্বপ্নের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো যোগসূত্র আছে।"

ওনারা কাঠের বাক্সটা খুলে লাল শালুতে মোড়া জিহ্বাখানা বের করে আনলেন। সেই লালশালু আজও রক্তে ভিজে সপসপ করছে, শুধু তাই নয় এখনও সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা কাঁচা রক্ত ঝরে পড়ছে। মর্ত্যগন্ধর্বরা খুব যত্নসহকারে ভেজা লালশালুর মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে এল স্বর্ণজিহ্বা। কিন্তু এ কী?

মর্ত্যগন্ধর্বরা অমন আতঙ্কে শিউরে উঠলেন কেন?

সে কারণ অবশ্য ক্ষণিকেই স্পষ্ট হল।

একজন মর্ত্যগন্ধর্ব সেই জিহ্বা খানা তুলে ধরতেই বেদীর নীল আলো এসে পড়ল দেবীর স্বর্ণ জিহ্বার ওপর। আর তখনই দেখা গেল, দেবীর স্বর্ণজিহ্বায় কালো কালো ছোপ।

মহর্ষি বলে উঠলেন, "প্রথম দিন অল্প ছিল। তারপর যত দিন যাচ্ছে,

ছোপগুলো বাড়ছে। আমার ভয়...”

—“এই জিহ্বা খুব দ্রুত পুরোপুরি কালো জিহ্বায় পরিণত হয়ে যাবে।”

— “কিন্তু, এটা কেন...”

মহর্ষির কথা শেষ হওয়ার আগেই ওদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, “খুব দ্রুত। খুব দ্রুত এক প্রলয় আসতে চলেছে শম্ভুপাদ...।”

শিউরে উঠলেন মহর্ষি। শিউরে উঠল লল্লটা। এ কী শোনালেন মর্ত্যগন্ধর্বরা?

আচমকা সেই তিন জন মর্ত্যগন্ধর্ব আকাশের দিকে একসঙ্গে তাকাল। তারপর তিনখানা স্বর একই সঙ্গে একই লয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

— “পশ্চিমের আকাশে এক কালো মেঘ। দেখতে পাচ্ছিস শম্ভুপাদ? এই মেঘ পুরো ধলভূমগড়ের আকাশে যেদিন ছড়িয়ে পড়বে, সেদিন আসবে সেই প্রলয়। যাকে শেষ করা উচিত ছিল তাকে বাঁচিয়ে রাখার মূল্য তোকে দিতে হবে। শয়তানের প্ররোচনায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিভেদ ভেঙে যাচ্ছে। যারা ভক্ত তারা ভক্তি থেকে সরে যাবে। দেবী হবে ডাইনি। মায়ের সন্তানেরা মা এর বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরবে। রঙ্কিণীর কালো জিহ্বা সেই নির্দেশই দিচ্ছে।”

বিস্ফারিত নয়নে শম্ভুপাদ সেই কথাই শুনছিল। এ কী ভয়ংকর ভবিতব্য! রঙ্কিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে তারই সন্তানেরা। কিন্তু কেন?

— “কী ভাবছিস? এতেই শেষ? না। এ তো সবে সর্বনাশের শুরু। একদিন সুবর্ণরেখার জল রক্তে পরিণত হবে, পাহাড়ের পাথর প্রাণ পেয়ে চলাফেরা করবে, রাত আচমকাই বদলে যাবে দিনে, সেদিন জানবি আসবে আসল প্রলয়। মায়ের ক্রোধ অভিশাপ হয়ে ঝরবে সমগ্র ধলভূমগড়ে। দেবী সেদিন সত্যি হয়ে উঠবে, রক্তখাকি। যে সন্তানেরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে তাদের রক্তে তিনি শুদ্ধ হবেন। তারপর অনেকদিন পরে একদিন শয়তান পুনরায় জন্ম নেবে। জন্ম নেবে দেবীকে ধ্বংস করার জন্য।”

আর্তনাদ করে উঠলেন শম্ভুপাদ, “এর কী কোনো প্রতিকার নেই?”

— “আছে।”

— “কী সেই প্রতিকার? বলুন... বলুন আমাকে।”

মর্ত্যগন্ধর্বেরা একসঙ্গে মাথা ঘোরালেন লল্লটার দিকে।

মহর্ষি ইশারা বুঝলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন কন্যার দিকে।

— "লল্লটা, প্রাসাদে ফিরে যাও। মহারানি কঙ্কাবতীকে যে কোনোভাবে জানাও, আমি দ্রুত রাজপ্রাসাদে ফিরব। সমগ্র রাজ্যে সৈনিকদের টহলদারী বাড়াতে বলো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানিও, আমি বলেছি। গুপ্তচরদের সজাগ থাকতে বলো। মহারানিকে বলো পাশের রাজ্য হতে সৈন্য সমর্থন চাইতে। দরকার পড়তে পারে এসবের। যাও, দেরি করো না।"

লল্লটা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পিতার স্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে সে আর দেরি করল না। সকলের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করল।

— "এবার বলুন, কী সেই প্রতিকার?"

মহর্ষির কণ্ঠে ব্যাকুলতা। যে করেই হোক এই সর্বনাশ আটকাতেই হবে।

— "যা ভবিতব্য, তা কেউ বদলাতে পারবে না শম্ভুপাদ। না তুই, না তোর সৈন্য। কল্লকেশীর পুনঃজন্ম যেমন ধলভূমগড়ের ভবিতব্য তেমনই রঙ্কিনীর নররক্তপিপাসী হওয়াও তার ভবিতব্য। এ কেউ আটকাতে পারবে না। কেউ না।"

— "একইভাবে তোর হাত রাজরক্তে রাঙা হওয়া থেকে যেমন কেউ আটকাতে পারবে না। এও ঠিক তেমনিই।"

— "কী!" ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন শম্ভুপাদ। "এসব কী বলছেন আপনারা?"

— "ঠিক শুনেছিস। তোর হাত রাজরক্তে রাঙা হবে। তোর সেটাই নিয়তি।"

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না মহর্ষি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে তাঁর। কোনোরকমে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন,

— "কাকে...? কাকে হত্যা করব আমি?"

মর্ত্যগন্ধর্বরা ফের আকাশ পানে মুখ তুললেন, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "গর্ভপ্রাচীরের অষ্টমগর্ভ যার, তাকেই হত্যা করবি তুই।"

শিউরে উঠলেন মহর্ষি, "মহারানি কঙ্কাবতী!"

মর্ত্যগন্ধর্বেরা মাথা নাড়াল, "হ্যাঁ, মহারানি কঙ্কাবতী।"

(দেবী দ্রোহ)

প্রাসাদের ছাদে উঠলে দিগন্ত বিস্তৃত ধলভূমগড়ের শোভা সহজেই নজরে পড়ে। উঁচুটিলার ওপর প্রাসাদটি তৈরি হওয়ায় হু হু করে সবসময় হাওয়া বইতে থাকে। সময়ের হিসেবে সূর্য অস্ত হয়ে যাওয়ার কথা এতক্ষণে, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না সমস্ত ধলভূমগড়ে। সারাদিন মেঘলা আকাশের জন্য কেমন একটা যেন অন্ধকার হয়ে আছে চারদিক।

মহারানি কঙ্কাবতী, প্রাসাদের ছাদের পশ্চিমদিকের কিনারে। পুরো ছাদটা বুক পর্যন্ত উঁচু লাল পাথরের জাফরি দিয়ে বেষ্টন করা। তাই ছাদ থেকে পড়ার ভয় নেই।

মহারানির পরনে বৈধব্যের বেশ। চোখে মুখে পূর্বের কমনীয়তা, চঞ্চলতা লোপ পেয়েছে দীর্ঘদিন। তার বদলে সেখানে জায়গা করেছে শান্ত, স্থির, দৃঢ়চেতা মনভাব। রাজকন্যা শিবদ্যুতি দেড় বছরের হয়েছেন। বলতে গেলে এখনো তিনি দুধের শিশুই। কিন্তু রাজ্য পরিচালনার জন্য তাঁর রাজকন্যাকে তেমন সময় দেওয়া হচ্ছে কই? বেশির ভাগ সময় তাঁর কাটে দাসীদের পরিচর্যাতেই। এই পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝেই দমবন্ধ লাগে মহারানির। মনে হয় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কন্যাকে নিয়ে দূরে কোথাও যেন লুকিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু ওই ভাবনাই সার।

যে গুরু দায়িত্ব মহর্ষি তাকে দিয়ে গিয়েছেন, এত শীঘ্র তার থেকে মুক্তির পথ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কিন্তু ইদানীং এসব নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন না। তাঁর চিন্তার কারণ ভিন্ন। মহর্ষি বহুদিন পূর্বে খবর পাঠিয়েছিলেন তিনি ফিরবেন। কিন্তু তারপর আর তাঁর কোনো খবর নাই। এই সময় তাঁর তাঁকে বড়ই প্রয়োজন। উনি কাছে কাছে থাকলে মনে হয় পিতার মতো কারো ছায়া যেন সবসময় যেন তাঁর মাথার ওপরে রয়েছে। কিন্তু এ ছায়া দীর্ঘদিন অনুপস্থিত।

— "দেবী রঙ্কিনীর জয় হউক!" পেছন থেকে সেনাপতি কালিদাসের গলা পেলেন কঙ্কাবতী। কিন্তু তিনি আকাশের পশ্চিমকোণ থেকে চোখ সরালেন না।

— "পশ্চিমের ওই কালোমেঘটা দেখেছেন সেনাপতি মশাই? কয়েকদিন আগেও ওটা একই জায়গায় ছিল। এখন কেমন ধীরে ধীরে পুরো আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে দেখছেন? কেন কে জানে... আমার মনটা আচমকাই কু গাইছে। খুব অশুভ কিছু একটা ঘটতে চলেছে, বুঝলেন।"

— "অশুভ কিছু তো হচ্ছেই। আপনার কথা মতো সারা রাজ্যে সেনা টহলদারির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তচরদের ও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যা বুঝতে পারছি রাজ্যের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয় মহারানি। লোকজনের মনে একটা অজানা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। একটু আগেই গুপ্তচরদের মধ্যে একজন খবর এনেছে সদরপুর গ্রামে রমা গাইনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর ধরন বাকী ছ-জনের মতোই। সন্তান প্রসব কালে মৃত্যু। কিন্তু যাকে প্রসব করেছে তা বাকিদের মতোই কাদা মাখা একতাল মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নয়।"

রানি কঙ্কাবতী পশ্চিমের কালো মেঘের দিকে তাকালেন, কপালে দুশ্চিন্তার গভীর ভাঁজ। তাঁর অনুমান মিলে গেল। যারা গর্ভপ্রাচীর দিয়ে রঙ্কিনীর জিবকে রক্ষা করেছিল, তাদের মধ্যে ছ-জনই এই অদ্ভুত মাংসপিণ্ড প্রসব করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। বাকি ছিল সদরপুরের রমা গাইন। সেও আজ মারা গেল একটু আগে। বেছে বেছে এই সাত জনই কেন? এর কারণটা এমন নয় তো, যে এই সাতজনই গর্ভপ্রাচীরে সাহায্য করেছিল। আর এদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে কোথাও লোকেদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়াটা সহজ হবে?

— "লোকেদের মনে দেবী রঙ্কিনীকে নিয়ে চাপা আক্রোশ টের পাওয়া যাচ্ছে রানিমা। যেসব কথা কয়েকমাস আগে লোকে বলবার আগে কয়েক'শবার ভাবতো সেগুলোই এখন প্রকাশ্যে বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে। লোকে মনে করছে..." কথাটা বলতে গিয়েই থেমে গেলেন সেনাপতি কালিদাস।

— "কী মনে করছে সেনাপতি মশাই?"

— "লোকে মনে করছে, এসবই দেবী রঙ্কিনীর অভিশাপ। এরপর এই অভিশাপ নাকি ধীরে ধীরে পুরো সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তখন নাকি আর কেউ বাঁচবে না। আসলে দেবী রঙ্কিনী কোনো দেবী নন, তিনি নাকি আদপেই

ডাকিনী...”

— “একটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার খেয়াল করেছেন, এই সব গুজবগুলো এই মৃত্যুগুলোর পরেই শুরু হয়েছে। এর আগে কিন্তু একবারও এসব গুজব ওঠেনি।”

— “হ্যাঁ মহারানি। আসলে এই মৃত্যুগুলো প্রজাদের মনে...”

বাকি কথা কানে গেল না কঙ্কাবতীর। তাঁর মনের মধ্যে একটাই চিন্তা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। আচ্ছা এই ছ-জন যে একইরকম ভাবে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল, এগুলো সত্যি তাদের নিয়তি? নাকি এসবের পেছনে কোনও ঘৃণ্য পরিকল্পনা রয়েছে কারো? কিন্তু কার পরিকল্পনা থাকবে? রঙ্কিনীর নামে অপপ্রচার করলে এমন কার সুবিধে... চমকে উঠলেন মহারানি।

— “সেনাপতি বিমলের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল?”

— “নাহ, মহারানি।”

এমন সময় মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু সেখানে উপস্থিত হলেন। মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল, বড় অস্থির হয়ে রয়েছেন ভেতরে ভেতরে।

— “মহারানির জয় হোক।”

— “দেবী রঙ্কিনীর জয় হোক! বলুন মন্ত্রীমশাই। কোনো খবর আছে?”

— “খবর গুরুতর মহারানি।” মন্ত্রীমশাই একটু থামলেন, “মন্দিরের প্রধানপুরোহিত আর সেবাইতরা জানিয়েছে দেবী মন্দিরে, গত তিন দিনে কোনো ভক্ত সমাগম হয়নি। এমনকী, রাজগৃহের বাঁধা পুজো ছাড়া মন্দিরে আর নাকি কোন পুজোও পড়েনি গত তিন দিন।”

— “কোনো একজনের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে গোপন বৈঠক হচ্ছে যাতে বলা হচ্ছে দেবী রঙ্কিনীকে বর্জন করতে। অবস্থা বেশ খারাপের দিকে এগোচ্ছে। প্রজারা দেবীকে ভয় পেতে শুরু করছে। তারা মনে করছে, দেবী এই সাম্রাজ্যে থাকলে তাদের বিপদ।”

একটা জোরে শ্বাস নিলেন মহারানি কঙ্কাবতী। বিশ্বাস খুব দ্রুত অবিশ্বাসে বদলে যাচ্ছে। ভক্তি বদলে যাচ্ছে শঙ্কায়। এ বড় খারাপ ইঙ্গিত।

— “এইসব বৈঠক করে মানুষের মনে কুপ্রভাব ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিন। কাল থেকে পুরো রাজ্যজুড়ে কোন জমায়েত, কোন বৈঠক, কোন আলোচনা সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। এই নির্দেশে অমান্য করা হলে তার শাস্তি কারাবাস।"

— "কিন্তু রানিমা..."

— "কোনো কিন্তু না, সেনাপতি মশাই। যেমন করেই হোক এই দেবীদ্রোহ আটকাতে হবে।"

রানি কঙ্কাবতীর নির্দেশ পেয়ে মহামন্ত্রী বলে উঠলেন, "কিন্তু অবস্থা যেরকম দিকে এগোচ্ছে, এই আদেশে দিয়ে কী সভা, বৈঠক বন্ধ করা যাবে?"

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন মহারানি কঙ্কাবতী। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "তাহলে সেই মানুষটিকে যেন-তেন প্রকারেণ বন্দি করুন, যে এই বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমার সন্দেহ যদি ভুল তাহলে সে আর কেউ নয়... স্বয়ং প্রাক্তন সেনাপতি বিমল ওরফে প্রধান বিকশবাহু।"

* * * * * * * *

সদরপুর গ্রামটা রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে। সেই গ্রামে বিশ, তিরিশ হিন্দু পরিবারের সঙ্গে গোটা দশেক মুসলিম পরিবারের সহাবস্থান। এই গ্রামে ধর্মীয় বিভেদ থাকলেও আন্তরিকতায় কোন বিভেদ নেই। বেশিরভাগ লোকই এখানে নানান ধরনের ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। তা-ই গ্রামের অবস্থা খানিকটা সচ্ছল ধরনের। মাটির দোতলা বাড়ির সঙ্গে চুনসুরকির ইটের বাড়ি দু-একটা দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রামের পেছনদিকেই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে, খাঁড়া পাহাড়। আমাদের গল্পের কিছু অংশ এই গ্রাম ঘিরেই।

গ্রামের বাইরের দক্ষিণ দিকের এই অংশটা পাহাড়ের পাদদেশ হলেও চারদিকে যথেষ্ট জঙ্গল রয়েছে। এরই মাঝখানে কিছুটা জায়গায় গাছ কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই জায়গাটা হিন্দু মহাশ্মশান। দুই-তিন গ্রামের লোকজন মারা গেলে এখানেই সৎকার করা হয়।

অন্ধকার রাত্রি। গাছের মাথায় জ্বলতে থাকা ঝাঁক ঝাঁক জোনাকির আলো

ছাড়া চারিদিকে আর কোথাও কোনো অলো নেই। একটা বিকট কাঠপোড়ার গন্ধে জায়গাটা এখনও ভারী হয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেও এই ফাঁকা জায়গায় একখানা চিতা জ্বলছিল। এখন সেই চিতার আগুন নিবে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

একটা লোক এই অন্ধকারেই নিবে-যাওয়া চিতার সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে তার পরিচয় বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, লোকটি অন্ধকারের মধ্যেই চিতার পোড়া কাঠগুলো হাতড়াতে লাগল। চিতার আগুন নিবে গেলেও, আগুনের ওম যথেষ্ট রয়েছে। সেই তাপে হাত পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাকে যেমন করেই হোক অভীষ্ট জিনিসটা খুঁজতেই হবে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে অন্ধকারে চিতার ছাই হাতড়ানোর পর মনে হল লোকটি স্থির হয়ে বসল। তার হাতে উঠে এসেছে একখানা নাভীকুণ্ডলী। এই জিনিসটাই তো এতক্ষণ খুঁজছিল সে। দ্রুত সে উঠে দাঁড়াল জিনিসটা নিয়ে। নাকে, মুখে, চোখে কাঠ পোড়া ছাই ঢুকেছে, কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবলে হবে না। সে দ্রুত জিনিসটা কোমরে আটকে রাখা একটা কাপড়ের পুঁটুলিতে চালান করেই চিতাটিকে নতজানু হয়ে প্রণাম করল।

এমন সময় আচমকা পেছন থেকে দু-তিনটে স্বরের উত্তপ্ত বাদানুবাদের শব্দ শুনেই চমকে উঠল সেই লোকটি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একাধিক মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। একদল লোক মশালহাতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কিছু নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। কী নিয়ে তাদের আলোচনা তা বোঝা না গেলেও, রঙ্কিনী নামটা দু-তিনবার শোনা গেল তাদের মুখ থেকে।

লোকটি নিজেকে যতটা সম্ভব অন্ধকারে মিশিয়ে গাছদের আড়ালে একেবারে জঙ্গলের ধারে উপস্থিত হতেই দেখতে পেল, একটা জনা তিরিশের দল গোটা দশ মশাল হাতে পরকে পর লাইন দিয়ে এগিয়ে চলছেন জঙ্গলের ধার ধরে। এদেরকে লোকটি না চিনলেও, বোঝা গেল এরা সকলেই

সদরপুরের অধিবাসী। আচমকা লোকটি চমকে উঠল। দলের শেষের লোকটি, শঙ্কর গাইন না? মাথা নীচু করে হাঁটলেও মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মশালের আলোয়। এর স্ত্রী রমা গাইন তো আজ সকালেই মারা গিয়েছিল। ওরই নিবে যাওয়া চিতার ভেতর থেকে নাভিকুণ্ডলীখানা খুঁজে বের করেছে লোকটি। কিন্তু এরা কোথায় যাচ্ছে দল বেঁধে? তা-ও এই অন্ধকার রাত্রে?

— "তাড়াতাড়ি চল কিনে। তবে সাবধান, কেউ যাতি টের না পায়। আমরা বৈঠকে যাচ্ছি জানতি পারলে কিন্তু জেল হবে।"

— "উ! কী ভেবেছে? জোর যার মুলুক তার। এমনি হুলিয়া বের করে দিল, কোনো আলোচনা, বৈঠক হবে না বলে? মজা নাকি?"

দলের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠতেই আরেকজন বলে উঠল, "আসলে উরা ভয় টো পেয়েছে। তাই এই হুলিয়া। রানি রঙ্কিনীটোর ভক্ত কিনা। রঙ্কিনীকে আর কেউ মানছে না। মন্দিরের পুজা বন্ধ। মন্দিরের পুজাটো বন্ধ হওয়া মানেই তো রঙ্কিনীকে অস্বীকারটো করা।"

— "অস্বীকার করবে লাই তো কী?" আরেকজনের উত্তপ্ত গলা। "সাতটো মাইয়াকে উ মারছে। আরো কত মরবে কে জানে? এই যে আজ শঙ্করের বউটা মরল সেও তো ওই ডাকিনীটোর ইচ্ছায়। গুরুদেব কইঞ্ছে, রঙ্কিনীকে শেষটো না করতে পারলে পুরা রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। মড়ক লাগবে দেশে।"

— "আমাদের কে রঙ্কিনীকে তাড়াতে হবে। রঙ্কিনীকে রাজ্য ছাড়া না করতে পারলে..."

— "কী করে তাড়াব? উ ডাইনি। উর অনেক ক্ষমতা...। উর সঙ্গে আমরা পারব কেমন করে?"

— "যে পারবে... তাকে এবার জাগাতে হবে।"

— "কার কথা, বলছিস তুই...?"

— "যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চল কিনে। সেখানে গেলেই সব উত্তরটো পাওয়া যাবে।"

অন্ধকারেই শিউরে উঠল লোকটি। কী ভয়ংকর কথা এদের মুখে? এরা

দেবীকে ডাকিনী বলছে কোনো এক গুরুদেবের প্ররোচনায়। কে সেই গুরুদেব? আর এরা কাকেই বা জাগানোর কথা বলছে? কল্লকেশী নয়তো...?

কিন্তু তাকে কীভাবে জাগানো সম্ভব? সে তো... লোকটি আর কিছু ভাবতে পারল না। দলটি তাকে ছাড়িয়ে অনেকটা পথ জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করেছে। সে আর দেরি না করে চুপি চুপি ওদের পিছু নিল। তাকে সবটা জানতেই হবে।

*   *   *   *   *   *   *   *

গুহার ভেতরটা এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম।

আগের সেই ধ্বংসস্তূপ যেন কোন এক মন্ত্রবলে আপনা থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছে। চারদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গুহার ভেতরটা এখন অন্ধকার নয়। দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে মশালের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, গুহার ভেতরে অনেক লোক। সকলেই প্রায় পুরুষ। ভেতরটা লোকে প্রায় গিজগিজ করছে। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। একপাশে পাঁচ জন লোক গলায় মাদল ঝুলিয়ে তাতে বোল তুলেছে,

"দ্রমি দ্রমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

গুহার পিছনদিকে যেই ইঁদারা রয়েছে তার পাঁচিলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেনাপতি বিমল ওরফে প্রধান বিকশবাহু। কিন্তু তার চেহারা এখন চেনা যাচ্ছে না। কালো চাদর। মুখে দাড়ি-গোঁফ না থাকলেও মাথায় পাগড়ি। সারা মুখে খড়িমাটির প্রলেপ। সব মিলিয়ে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছদ্মবেশ। মাদলের তালে তালে শরীরখানা দুলছে অল্প অল্প। আচমকা সে হাত তুলে ইশারা করতেই মাদলের বোল থেমে গেল। এক ভয়ংকর নীরবতা নেমে এল জায়গাটা জুড়ে। বিকশবাহু সকলের মুখের পানে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বলে উঠল, "সময় এসে গিয়েছে বন্ধুরা। রঙ্কিনীকে শেষ করতে হবে..." বিকশবাহুর কণ্ঠে অদ্ভুত শীতলতা। "রঙ্কিনী কোনো দেবী নয়। রঙ্কিনী আসলে

ডাইনি। আজ আমরা রঙ্কিনীকে যদি শেষ না করি তাহলে কাল রঙ্কিনী আমাদের, আমাদের সন্তানদের রক্তে নিজের পিপাসা মেটাবে। সে যে ভয়ংকরী তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সাত জন নারী যারা তার শক্তিঅঙ্গ রক্ষা করেছিল গর্ভপ্রাচীর দিয়ে, তারা সাতজনই মারা গিয়েছে এক ভয়ংকর অভিশাপে। এরপর বাকিরা মরবে। ডাইনি একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ও আমাদের ছাড়বে না কিছুতেই।"

— "কিন্তু কী করে? উর তো অনেক ক্ষমতা...? কে শেষ করবে ওকে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠতেই বিকশবাহুর ঠোঁটের কোলে হাসি ফুটে উঠল।

— "সেই শেষ করবে ওকে যে ঘুমিয়ে আছে তার মায়ায় বলি হয়ে। মহান প্রভু কল্লকেশী। সময় হয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলার।"

ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। সকলের মুখেই চাপা আতঙ্ক।

— "আমি জানি তোমরা কী ভাবছ।" বিকশবাহুর স্বর অত্যাধিক শীতল। "কিন্তু এই মুহূর্তে রঙ্কিনীর থেকে বড় বিপদ আর কিছুই নেই। দেখলে তো কেমন সেই সাত জন মারা গেল? কী চাও? এরপর তার অভিশাপ পুরো রাঢ়ভূমে ছড়িয়ে পড়ুক। রঙ্কিনীকে আটকাতে গেলে মহান প্রভুকে জাগাতেই হবে। যে করেই হোক।"

— "কী করে জাগাবেন তাকে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করতেই বিকশবাহুর মুখে হাসি ফুটল। "তাকে জাগাতে গেলে তোমাদের সাহায্য চাই।"

তারপরেই পাশে-দাঁড়ানো একজনকে ইঙ্গিত করতে সে একখানা মাটির সরা, আর একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে।

— "তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে কল্লকেশীর ওপর, এটাই তাকে রঙ্কিনীর মায়া থেকে মুক্ত করবে। জেগে উঠবেন প্রভু। কিন্তু এই বিশ্বাস যে শুধু মৌখিক নয় তারই প্রমাণ হিসেবে তোমরা প্রত্যেকে দেবে এক ফোঁটা করে রক্ত।"

বিকশবাহুর নির্দেশ বুঝতেই প্রত্যেকে ছুরি দিয়ে হাতের চেটোখানা কেটে একফোঁটা করে রক্ত দিতে লাগল সেই সরায়।

দেখতেই দেখতে এত জনের রক্তে সরা পূর্ণ হয়ে উঠতেই, সেই সরা খানা বিকশবাহু হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো। তারপর বিড়বিড় করে অবোধ্য ভাষায় মন্ত্রপাঠ করতে করতেই সরার রক্তটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন ইঁদারার গর্তে। আর তারপরেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল পুরো গুহা জুড়ে। দেওয়ালের খাঁজে আটকানো মশালের হলুদ আলোগুলো আচমকা বদলে গেল নীলাভ সবুজ আলোয়। সারা গুহায় রহস্যময় নীল আলোর খেলা। সারা গুহা জুড়ে তাপমাত্রা যেন আপনা থেকেই হু হু করে কমতে লাগল।

একই সঙ্গে ইঁদারার ভেতর থেকে উঠে এল একটা উজ্জ্বল নীল বর্ণের ধোঁয়া। তারপর সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল সারা গুহার মধ্যে।

ওদিকে ইঁদারার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রধান বিকশবাহু খুলে ফেলেছে চাদরখানা। বেরিয়ে পড়ল পরনের শ্বেতবস্ত্র। খসে পড়েছে তার মাথার পাগড়ি। বেরিয়ে পড়ল মুণ্ডিত মস্তক। নিজের আসল রূপে ফিরে এসেছে প্রধান বিকশবাহু। কিন্তু উপস্থিত কারো সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। থাকবেই বা কী করে? প্রত্যকের চোখের কালো মণি ততক্ষণে বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের কষ থেকে ঝরছে লালা। গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক চাপা গোঙানি। এখানকার সকলেই বশীভূত হয়েছে প্রধান বিকাশবাহুর চক্রান্তে। প্রত্যেকের স্বেচ্ছায় দান করা রক্তের ফোঁটা তো এইজন্যই নিয়েছিল সে। সেই রক্তের ফোঁটা মন্ত্রপূত করেই সে বশ করেছে সকলকে। গড়ে তুলেছে এই বাহিনী। যারা তার আদেশে এখন মরতেও প্রস্তুত।

অবশ্য এর জন্য তাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। সেদিন এই গুহার মধ্যে, এক অদ্ভুত কারণেই রঙ্কিনীর জিহ্বা স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই জগন্নাথ দেবের শরীরখানা বদলে গিয়েছিল পাথরে। শম্ভুপাদ নিজে রঙ্কিনীর খড়গ দিয়ে সেই পাথরের মূর্তি ভেঙে তা ইঁদারায় নিক্ষেপ করেছিলেন সেদিন। সকলে ভেবেছিল কল্লকেশী বুঝি সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কল্লকেশীর মায়া বোঝার সাধ্য এদের কারোর ছিল না। সেদিন অনেকপরে সকলে যখন চলে গেল, তখন চুপিসারে এই গুহায় এসেছিল প্রধান বিকশবাহু। পাথর হয়ে

যাওয়া কল্পকেশীর দেহাংশের গুঁড়ো কাঁচিয়ে সংগ্রহ করেছিল সে। প্রভুর নির্দেশ ছিল যদি তার সঙ্গে সেদিন অঘটন কিছু হয় তাহলে তার দেহাংশ তাকে নবজীবন লাভে সাহায্য করবে। শুধু তাকে ছল করে এই দেহাংশ কোনোরকমে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে গর্ভপ্রাচীর সৃষ্টিকারিণী সেই সব রমণীদের শরীরে। যে রক্ত রঙ্কিনীর শক্তি অঙ্গের রক্ষা করেছিল, সেই রক্তের শক্তি শোষণ করেই প্রভুর দেহাংশ শক্তি লাভ করবে। তারপর তাদের গর্ভ বিদীর্ণ করে আপনিই বেরিয়ে আসবে নির্দিষ্ট সময়ে। পরে সেই দেহাংশকে ইঁদারার গহ্বরে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করলেই তিনি পুনঃজীবিত হবেন। এখন শুধু দরকার রাজপ্রাসাদের কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে-রাখা স্বর্ণ জিহ্বাটা। কিন্তু তার একলার পক্ষে কখনওই সম্ভব ছিল না দুর্গের মধ্য হতে রঙ্কিনীর জিহ্বা বের করে আনা। তা-ই সে আজ গড়েছে এই বাহিনী। যারা তার নির্দেশে প্রাসাদ আক্রমণ করে সিংহাসনের নীচ থেকে বের করে আনবে সেই জিহ্বা। যা পূর্ণ শক্তি ফিরিয়ে দেবে প্রভুকে। শক্তিদেহাংশ জগন্নাথ দেবের মুক্তি ঘটাতে পারে, যাতে সে পুনঃজন্ম লাভ করে। কিন্তু রঙ্কিনীর জিহ্বা প্রয়োজন আসল শরীরে ফিরে আসার জন্য।

"তুমি এদের রক্ষা করেছিলে রঙ্কিনী? এদের? যারা সামান্য বিপদ বুঝেই দল বদল করতে পারে, এই প্রজাদের? দেবী থেকে ডাকিনী বানাতে যারা মুহূর্তকাল ব্যয় করেনি তাদের রক্ষা করে কী পেলে তুমি? কিছুই না। পেলে কেবল অবিশ্বাস আর অভক্তি। তোমার মতো বোকা দেবীদের এই পরিণতি হওয়াই উচিত।"

মনে মনে হেসে উঠল বিকশবাহু।

"যাও" জমায়েতের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল বিকশবাহু, "হামলা কারো প্রাসাদে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও প্রাসাদ। কুলদেবীর সিংহাসনের নীচ থেকে টেনে বের করে আনো রঙ্কিনীর স্বর্ণজিহ্বা। ওটা লাগবে প্রভুর। যে বাধা দেবে তাকেই হত্যা করবে। যে পথে আসবে তাকেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করবে। যাও তোমরা। পালন করো প্রভুর আদেশ। নিয়ে এসো রঙ্কিনীর স্বর্ণ জিহ্বা।"

জমায়েতের উদ্দেশে চিৎকার করে কথাটা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা

জুড়ে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যেন। বিকশবাহু বশীভূত প্রজারা সবাই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াল গুহার বাইরে।

গাছ পালা মাড়িয়ে, পাহাড়ের ঢাল বরাবর ছুটতে লাগল ওরা। কেউ পড়ল, কেউ গড়াল, কেউ মাথা ফাটাল। কিন্তু কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। যেন তাদের সব অনুভূতি লীন হয়ে গেছে। এরই মধ্যে একজন এই হুড়োহুড়ির সুযোগ নিয়ে গুহার একপাশে গা ঢাকা দিলো। সকলেই যখন নিজের একফোঁটা করে রক্ত দিচ্ছিল, ঠিক তাদের মধ্যেই একজন নিজের রক্ত দেয়নি বুদ্ধি করে। তাই বিকশবাহুর মন্ত্র দ্বারা সে বশীভূতও হয়নি।

সকলেই যখন চলে গেল, হুড়োহুড়ি, কোলাহল বন্ধ হয়ে জায়গাটা আচমকা নির্জন হয়ে উঠল। তখনও গুহার মধ্যে বিকশবাহুর সাথে দাঁড়িয়েছিল এক মহিলা।

বিকশবাহু তাকে নির্দেশ দিল, "তোমার গর্ভে আমার সন্তান রয়েছে। ওকে এখানে রাখা ঠিক না। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর সঠিক প্রতিপালন হওয়া দরকার। আমাদের রক্তের কাজই হল প্রভুর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা, সে কর্তব্যের যেন অন্যথা না হয়..."

— "কিন্তু গুরুদেব..."

— "কোনো কিন্তু নয়। এখন যাও এখান থেকে।" বিকশবাহুর নির্দেশে মেয়েটি বেরিয়ে চলে গেল গুহা থেকে। বিকশবাহু চায় না এই সময় এখানে কেউ থাকুক। কেউ দেখলে এই উপাচার অশুদ্ধ হয়।

ইঁদারার প্রাচীর থেকে নেমে প্রধান বিকশবাহু ইঁদারার কোণ হতে টেনে বের করে আনল একটা কালো রসে ভিজে যাওয়া কাপড়ের থলি। এর মধ্যে আছে প্রভুর দেহাংশের শেষ খণ্ডটা যা রমা গাইনের গর্ভবিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিল। থলের ভেতর থেকে মাংসপিণ্ডটা বের করে আনতেই ইঁদারার ভেতর থেকে এক অদ্ভুত গর্জন ভেসে এল। কান পেতে শুনলে মনে হবে কেউ যেন ইঁদারার ভেতরে চাপা গলায় বলছে, "দে... দে..."

দেরি না করে বিকশবাহু সেই মাংস পিণ্ডটা ইঁদারার গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলতেই এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে গুড়গুড় করে একখানা কম্পন টের

পাওয়া গেল মাটির নীচে। কিছু একটা নড়ছে মাটির নীচে। ওদিকে আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে এসেছে। একদল বশীভূত লোক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে যাচ্ছে, এই খবরটা রাজপ্রাসাদে পৌঁছোনো দরকার। কিন্তু এখানে কী হচ্ছে সেটাও তো দেখা দরকার। লোকটি কী করবে কিছু বুঝতে পারল না। ওদিকে বিকশবাহু সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ছুরির ডগায় ফালা করে কেটে বাড়িয়ে দিলো ইঁদারার গহ্বরের উপরে। ক্ষতস্থান হতে তিন ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল অন্ধকার অতলে। টুপ... টুপ... টুপ।

আর তারপরেই গুহার মধ্যে ঘটল এক ভয়ংকর নীলাভ সবুজ আলোর বিস্ফোরণ।

সেই সঙ্গে এক তীব্র গরম হাওয়ার ঘূর্ণিঝড়। হাওয়ার চোটে বিকশবাহু ইঁদারা হতে ছিটকে পড়েছে গুহার মেঝেতে। তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে যাওয়ার জোগাড়। লোকটি আড়াল থেকে বেরিয়ে গুহার দরজায় এসে দাঁড়াল। আর তখনই জিনিসটা দেখতে পেল সে।

ইঁদারার খোলা মুখের হাত দুই ওপরে একখানা তীব্র নীল আলোকপিণ্ড শূন্যে ভাসছে। আর সেই আলোকপিণ্ড ঘিরে রয়েছে একখানা জ্যোতির্ময় চিহ্ন। এই চিহ্ন লোকটি এর আগে বহুবার দেখেছে। একটা চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের মাঝে একটি ত্রিভুজ, ত্রিভুজের কেন্দ্রে একটি বৃত্ত।

মাটিতে বজ্রাসনে বসে দু-হাত মাথার উপরে তুলে সেই আলোকপিণ্ডকে প্রণামের মুদ্রা করছে বিকশবাহু। আর চিৎকার করে বলছে, "জয় মহান প্রভু কল্লকেশীর জয়! জয় মহান প্রভু কল্লকেশীর জয়!"

তার পরনের পোশাক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড হাওয়ায়। আলোর তীব্রতায় চোখ পর্যন্ত মিলতে পারছে না প্রধান বিকশবাহু, কিন্তু তারপরেও সে চিৎকার থামাচ্ছে না।

"বিকশবাহু!"

দরজায় দাঁড়ানো লোকটির সারা শরীর কাঁপতে লাগল প্রচণ্ড রাগে।

প্রধান বিকশবাহু ভেবেছিল, এই স্থানে সে ভিন্ন আর কেউই নেই। কিন্তু আচমকা ডাকে পেছন ঘুরে তাকাতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল প্রাক্তন

সেনাপতি। সারা গায়ে হাতে, পায়ে কালি মাখা হলেও এই চেহারা চিনতে তার ভুল হওয়ার কথা নয়।

"শম্ভুপাদ!"

হ্যাঁ, দরজার কাছে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, মহর্ষি শম্ভুপাদ। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি মহাশ্মশানে রমা গাইনের চিতা হাতড়ে নাভিকুণ্ডলী সংগ্রহ করছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সেই দলের পিছু নিয়ে আজ এখানে উপস্থিত হতে পেরেছেন।

প্রচণ্ড রাগে তাঁর সারা শরীর কাঁপছিল। চোখ দুটো প্রচণ্ড রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মহর্ষির। এই তাহলে সবকিছুর পিছনে রয়েছে। এই জন্যই মর্ত্যগন্ধর্বেরা তাঁকে বলেছিল, "যাকে শেষ করা উচিত ছিল তাকে বাঁচিয়ে রাখার মাসুল তোকে গুনতে হবে।"

— "কী ভেবেছিস তুই? তোর পরিকল্পনা সফল হয়ে যাবে? কক্ষনো না। কোনোদিন তুই সফল হতে পারবি না। তার আগেই তোকে আমি শেষ করে ফেলব।" কথাটা বলেই কোমরে গুঁজে রাখা রঙ্কিনী দেবীর স্বর্ণ খড়গটা বের করে আনলেন শম্ভুপাদ। তারপর সঙ্গে ছুটে গিয়ে ইঁদারার প্রাচীরের দিকে। বিকশবাহু দু-হাত বাড়িয়ে তাঁকে বাধা দিতে এগোল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু মুড়ে শরীর ঝুঁকিয়ে সেই বাধা এড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের নিমেষে ইঁদারার পাঁচিলের ওপর উঠে সোনার খড়গের একখানা কোপ মারলেন সেই আলোক পিণ্ডের ওপর।

আবার একটা তীব্র আলোর বিস্ফোরণ আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শম্ভুপাদ ছিটকে গুহার দেওয়ালে ধাক্কা খেলেন। অক্ষত রইলো সেই নীলাভ আলোক পিণ্ড।

তাঁর এই পরিণতি দেখে হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বিকশবাহু, "তুই আর কিছুই করতে পারবি না শম্ভুপাদ। কিছুই না। না পারবে করতে তোর ওই খড়গ। লোকের বিশ্বাস উঠে গেছে রঙ্কিনীর থেকে। সে দেবী থেকে ডাইনি হয়ে গিয়েছে এখন। আর যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে দেবত্ব কোন কাজে লাগে না। তোর দেবী শক্তিহীন হয়ে গেছে রে।"

একটু থেমে আবার বলে উঠল সে, "তা ছাড়া আমার প্রভুর মুক্তি ঘটে গেছে। তিনি সঠিক সময় আবার জন্ম নেবেন অন্য শরীরে। অপেক্ষা শুধু রঙ্কিনীর সোনার জিহ্বার। সেটা..."

— "তোর লোকেরা দেবীর জিহ্বা কোনোদিন খুঁজে পাবে না। কোনোদিনই না।" মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন শম্ভুপাদ।

— "পাবে পাবে... সব পাবে। আর তারপরেও তারা যদি না পায় তাহলে তারা পুরো রাঢ়ভূম ধ্বংস করে দেবে।"

— "দেবী ঠিক তার রাজ্য রক্ষা করবেন, দেখে নিস।"

মাথার আঘাতটা বেশ জোরেই লেগেছে, মহর্ষির।

— "কীভাবে শম্ভুপাদ? কীভাবে?" তারপরেই বিকশবাহুর একটা খিলখিলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত গুহা জুড়ে।

এক মুহূর্ত চুপ করে কী যেন একটা ভাবলেন মহর্ষি, তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "বিশ্বাসের অর্থ অনেক গভীর। সেই গভীরতা নির্ধারণ করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাসের শক্তি কোনোদিনই সমষ্টিগত শক্তি নয়। জমায়েত লাগবে না। একজনের বিশ্বাস অটুট থাকলে তার যা শক্তি থাকবে, তা হাজার জনের অবিশ্বাসের কয়েকগুণ ওপরে।"

কথাটা বলতে বলতেই ফের ইঁদারার প্রাচীরে খড়গ হাতে উঠে দাঁড়ালেন মহর্ষি।

— "মা... আমি তোকে বিশ্বাস করি মা। আমি তোকে বিশ্বাস করি। তুই আমার মা। তুই নিজের সন্তানদের রক্ষা কর মা। রক্ষা কর।" কথাটা বলে এক মুহূর্ত ব্যয় হল না, মহর্ষি চিৎকার করে উঠলেন।

— "জয় মা রঙ্কিনী" তারপরেই সেই নীল আলোকপিণ্ডের ওপর তিনি সজোরে বসালেন দেবীর খড়গের কোপ।

সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড তীব্র সোনালী আলোর ঝলকানি। আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা।

শম্ভুপাদ আর বিকশবাহু দু-জনেই দুদিকে ছিটকে পড়লেন।

কিছুক্ষন পর আলোর তীব্রতা কমলে দেখা গেল, মশালের নীল আলো

পুনরায় স্বাভাবিক হলুদ আলো বিকিরণ করছে। সেখানে না রয়েছে সেই তীব্র নীল রঙের আলোকপিণ্ড আর না বইছে সেই তীব্র গরম হাওয়া।

— "এ কী করে সম্ভব?"

হাহাকার করে উঠল বিকশবাহু।

— "ওই যে বললাম," মহর্ষি দেবীর খড়্গখানা প্রধান বিকশবাহুর গলায় ঠেকিয়ে বলে উঠলেন, "বিশ্বাসের শক্তির গভীরতা বোঝা তোর সাধ্য নয় বিকশবাহু।"

বিকশবাহুর চোখ গুহার মধ্যে তখনও যেন খুঁজে চলছিল সেই আলোকপিণ্ডকে। সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না সেই আলোকপিণ্ড খড়্গের কোপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর আকস্মাৎ কী একটা মনে পড়তেই ঠোঁটের কোলে খেলে গেল এক ভয়ংকর হাসি।

— "আমার প্রভু তো জন্ম নেবেই শম্ভুপাদ। নাই বা পেল এ জন্মে সমস্ত শক্তি। পরের জন্মে পাবে। কিন্তু তুই? তুই কী করবি এবারে? তোর মা যে রক্ত খাকি হয়ে উঠবে?"

তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক চোখে তাকালেন মহর্ষি।

"রঙ্কিনী শক্তিহীন ভেবে যে গ্রামবাসীদের বশীভূত করে আমি রাজপ্রাসাদে হামলা করে জিহ্বা আহরণ করতে পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁরা তো আসলে নিরাপরাধ। এদিকে রাজপ্রাসাদের কূলদেবী সিংহবাহিনী, যা রঙ্কিনীরই অংশ। প্রাসাদের ভেতরের লোকেদের রক্ষা করতে হলে রঙ্কিনীকে নিজের নিরাপরাধ সন্তানদের রক্তেই নিজের হাত রাঙাতে হবে শম্ভুপাদ। হিঃ হিঃ হিঃ।" তোর দেবী তো রক্তখাকি হয়ে উঠবে রে সত্যি কারের।"

আতঙ্কে শিউরে উঠল শম্ভুপাদ। এদিকটা তো ভেবে দেখেনি সে। ঠিক আবার তখনই মনে পড়ল মর্ত্যগন্ধর্বদের বলা কথা, 'কল্লকেশীর পুনঃজন্ম যেমন ধলভূমগড়ের ভবিতব্য তেমনই রঙ্কিনীর নররক্তপিপাসী হওয়াও তার ভবিতব্য। এ কেউ আটকাতে পারবে না। কেউ না।'

ওদিকে পাগলের মতো হি হি করে হাসছে বিকশবাহু। এই হাসির মধ্যে নৃশংসতা যেমন আছে, তেমন আছে জয়ের উল্লাস। প্রচণ্ড রাগে গরগর করে

উঠল মহর্ষির সারা শরীর। আর সহ্য করতে পারলেন না তিনি।

এক মুহূর্ত দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ধারালো খড়গটা বিকশবাহুর গলার নলি বরাবর টেনে দিতেই ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তের ধারা। গুহার পাথুরে মেঝেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল বিকশবাহু ওরফে প্রাক্তন সেনাপতি বিমলের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ মৃতদেহ।

আর ঠিক তারপরেই মহর্ষি একটা অবাক কাণ্ড চাক্ষুষ করলেন স্বচক্ষে।

পাথুরে মেঝেটা আচমকাই চোরাবালির মতো নরম হয়ে টেনে নিতে লাগল, বিকশবাহুর দেহটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহার মেঝে আগের অবস্থায় ফিরে আসতেই ছিল থেকে নেই হয়ে গেল, কল্লকেশীর প্রধান অনুচর।

মহর্ষি দেখলেন, তাঁর পরনের পোশাকে বিকশবাহুর রক্তের ছিটে।

আচমকাই ভরে এল তার চোখের জল। এই পাপীর রক্তের দাগ তার হাতে লেগেছে, এ ভার তিনি বইতে পারবেন। একসময় এ হত্যার দায় লাঘবও হয়ে যাবে। কিন্তু এক নিরাপরাধ রমণী যে তাঁকে কন্যার মতো স্নেহ করেন, তাঁর রক্তের দাগ তিনি কীভাবে মুছবেন হাত থেকে। কীভাবে?

(দেবীর ইচ্ছা)

আজকাল নানান দুশ্চিন্তায় কঙ্কাবতীর ঘুম আসতে দেরিই হয়। অনেক কষ্টে যদিও বা আসে তাও হয় ভীষণ পাতলা। সামান্য কারো ডাক বা আওয়াজে থেকে থেকেই ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। অনেক কষ্টে ঘুমটা ধরেছিল, ঠিক এমন সময়ই খুব নিকটেই একটা বিশ্রী আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল মহারানির। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু গম্বুজে কেউ সজোরে বাজাচ্ছে দুন্দুভি।

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলেন কঙ্কাবতী। রাত্রের পাহারাদার এই সময় দুন্দুভি কেন বাজাচ্ছে? এ তো বিপদের সংকেত। নরম তুলোর মত শয্যায় রেশমের চাদর গায়ে ঢেকে তার পাশেই শুয়ে রয়েছেন রাজকন্যা শিবদ্যুতি।

গভীর ঘুমে অচৈতন্য।

দ্রুত বিছানা থেকে নেমে উত্তরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কঙ্কাবতী। হিসেব বলছে পূর্ণিমা আগামীকাল, কিন্তু সারা আকাশ জুড়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় কালো মেঘ। কিছুই দেখবার উপায় নেই। কেবল বহু নীচে কিছু কোলাহল টের পাওয়া যাচ্ছে। গম্বুজের দুন্দুভি বেজেই চলছে একনাগাড়ে। ঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু বাইরের অলিন্দে লোকেদের ছোটাছুটি, দাসীদের আর্তনাদ, চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ আক্রমণ করল নাকি রাজ্য? কিন্তু কারা?

বেশিক্ষণ ভাবতে পারলেন না কঙ্কাবতী, তার আগেই একটা সাদা বিদ্যুতের ঝিলিক কালো আকাশের বুকচিরে একদিক থেকে আরেকদিকে মিলিয়ে গেল। আর তারপরেই একটা কান-ফাটানো বাজ পড়ার শব্দ। ক্ষণিক মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র সময়েই কঙ্কাবতী যা দেখার দেখে নিয়েছেন।

কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে খোলা প্রান্তর দিয়ে। তাদের মধ্যে আবার অনেক টিলার দেওয়াল বেয়ে অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় উপরে উঠে আসছে।

একমুহূর্ত দেরি করলেন না কঙ্কাবতী। জানালাটার পাল্লাজোড়া ভেতর থেকে লাগিয়ে রাজকন্যাকে ঘুমের মধ্যেই কোলে তুলে নিলেন কঙ্কাবতী। তারপর ঘরের এককোণ থেকে টেনে নামালে মহারাজের ভারী তলোয়ার খানা। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস, কিন্তু তিনি পারবেন। নিজের কন্যাকে বাঁচাতে হলে তাকে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

"মা রঙ্কিনী, রক্ষা কর!" মনে মনে আরাধ্যাকে স্মরণ করে তলোয়ার খানা তাক করে দাঁড়ালেন বন্ধ জানালার দিকে। মহারানি দেখেই বুঝেছেন এরা বাইরের কেউ না। সকলেই অবোধ রাজ্যবাসী। কিন্তু এরা আক্রমণ করছে কেন রাজপ্রাসাদ? কী চায় এরা?

ঠিক এমন সময় জানালার পাল্লায় দড়াম করে একটা শব্দ হল। বাইরের থেকে ওরা ধাক্কা দিচ্ছে। এমন সময় প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হল বাইরের অলিন্দে। ওরা প্রাসাদে ঢুকে আসছে। বুকখানা হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে মহারানির। সেনাপতি কালিদাস কই? আর মন্ত্রী বিপ্রবাহু? কঙ্কাবতীকে নিজের

সুরক্ষা নিয়ে ভাবছেন না কিন্তু প্রাসাদের আশ্রিত নিষ্পাপ নাগরিক, আর প্রজাদের রক্ষা করুক তারা।

ঠিক এমন সময় বিকট শব্দ, আর জানালার ভারী পাল্লাজোড়া ছিটকে ঘরের মেঝেতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে যারা প্রবেশ করতে লাগল তারা পোশাকে সাধারণ গ্রামবাসী হলেও চোখের মুখের ভাব দেখলেই মনে হয় তারা কারো দ্বারা বশীভূত। সামনের দু-জন মহারানিকে দেখেই দাঁত, নখ বের করে ছুটে এল তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাবতীর হাতে ঝলসে উঠল রাজা জগন্নাথ দেবের ভারী তলোয়ার। ওমনি কচুকাটা হয়ে দু-জন গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। দু-জনকে পড়ে যেতে দেখেই আরও তিন জন ছুটে এল কঙ্কাবতীর দিকে। ওরা নিরস্ত্র গ্রামবাসী। কিন্তু বাগে পেলেই যে সামনের জনকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে তার আর বলার দরকার পড়বে না। মাথা ঝুঁকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলেন কিন্তু সেই মুহূর্তেই ডান হাতের তলোয়ারখানা চালিয়ে দিলেন তাদের পেট বরাবর। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। এই কোলাহলে আচমকা রাজকন্যার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তিনি ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। কঙ্কাবতী মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। একলা হলে তিনি পুরোটাই একলাই সামলাতে পারতেন, কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ রাজকন্যাকে একহাতে ধরে অন্যহাত দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি জানেন না। তবে শরীরে প্রাণবায়ু যতক্ষণ রয়েছে...

এবার তাঁর দিকে ধেয়ে এল একসঙ্গে পাঁচ জন। হে মা রঙ্কিনী! এবার এবার কী করবেন তিনি? ঠিক এমন সময় একটা বিকট শব্দ করে খুলে গেল মহারানির পিছনের দরজাটা।

"দড়াম।"

আর সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক তীর ছুটে কঙ্কাবতীর মাথার ওপর থেকে উড়ে এসে বিদ্ধ করল হামলাকারীদের। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল তারা। কঙ্কাবতী দেখলেন, সেই খোলা দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একদল রমণী ঘরের মধ্যে ঢুকেই তাঁকে আর রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মানব প্রাচীর তৈরি করল।

এরা রমণী হলেও এদের যোদ্ধার পোশাক। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা। হাতে খোলা তীর ধনুক। কোমরে লম্বা অসি। এরা কারা?

"মহারানি!"

ওদের মাঝেই একজনকে চিনতে পারলেন কঙ্কাবতী।

"লল্লটা!" এই বিপদের মাঝে লল্লটাকে দেখে কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না কঙ্কাবতী। ওদিকে জানালা গলে এখনো পিলপিল করে ঘরের মধ্যে লোক ঢুকছে। কিন্তু এই মানব প্রাচীর ভেদ করে তাঁর ধারে কাছে কেউ আসতে পারছে না। তার আগেই যোদ্ধারমণীদের তরবারির আঘাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে তারা।

— "এই যোদ্ধারমণীর দল? এরা কারা?"

— "এরা সবই আমার শিক্ষার্থী। আমি এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এক প্রমীলা বাহিনী গড়ে তুলেছি মহারানি। বুঝেছিলাম কখনও না কখনও এসবের দরকার পড়বে।"

— "কিন্তু গ্রামবাসীরা হামলা করছে কেন? কী চায় এরা?"

— "সঠিক কারণ জানি না মহারানি। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এরা কারোর দ্বারা বশীভূত। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

— "কোথায়?" অবাক গলায় কঙ্কাবতী প্রশ্ন করে উঠলেন।

— "আপনার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা দরকার। কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে প্রাসাদে। এই আচমকা আক্রমণে সৈন্যরা দিশেহারা। প্রাসাদের উত্তর দিক ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। আপানার এখানে থাকা উচিত নয় আপনাকে দক্ষিণদিকের কূলদেবীর মন্দিরে আত্মগোপন করতে হবে।"

*   *   *   *   *   *   *   *

মহর্ষি রাজমহলের অলিন্দ বরাবর এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। এক হাতে দেবী রঙ্কিনীর সোনার খড়গ, অন্য হাতে জ্বলন্ত মশাল। কাছে পিঠে কোনো আওয়াজ নেই। নেই কোনো অস্ত্রের ঝনঝনানি। তবুও মহর্ষির

সাবধানী পদক্ষেপ। মহলের মেঝেতে, দেওয়ালে চতুর্দিকে রক্তের ছোপ। সেই সঙ্গে নারী, পুরুষ, শিশুর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। কাটা পড়া অঙ্গ, মুণ্ডুহীন ধড় থেকে ফিনকির আকারে রক্তের ধারা বেরিয়ে পিছল রাজ মহলের মেঝে। মহর্ষি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই মৃতের স্তূপ, সেখানেই রক্তের ধারা। যেখানে অপেক্ষাকৃত নিচু মেঝে সেখানে তো রক্তে গোড়ালিও ডুবে যাচ্ছে। এ এক নারকীয় দৃশ্য! কিন্তু এ দৃশ্য তাঁর কাছে নতুন নয়। এ দৃশ্য তিনি বছরদেড়েক আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন। এই স্বপ্নদৃশ্য আজ যেন সত্যি হয়ে ধরা দিলো তাঁর চোখের সামনে।

তিনি ধীরে ধীরে মহলের দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলেন। সিংহবাহিনীর মূর্তি রয়েছে ঠাকুর ঘরের। তাঁর কী অবস্থা হয়েছে সেটা তাঁর জানা দরকার। দক্ষিণের চওড়া বারান্দার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

বারান্দার শেষ মাথায় দুটো বড় পাল্লা ভেঙ্গে বাইরের দিকে ঝুলছে। অবিকল সেই স্বপ্নদৃশ্যের মতো।

মহর্ষি মশালের হাতলখানা চেপে অন্ধকার দেবীগৃহের ভেতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। পুরো দেবীগৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাথার ছাদ ভেঙে তারকাখচিত খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে উপরে। ঘরের ভেতরে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যেন কোনো এক ভয়ংকর ধ্বংসলীলা ঘটে গিয়েছে পুরো ঘর জুড়ে।

অবশিষ্ট রয়েছে কেবল দেবীর সিংহাসন, আর তাঁর উপর উপবিষ্টা দেবী সিংহবাহিনীর অক্ষয় স্বর্ণমূর্তি। এই ভয়ংকর প্রলয় তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

ঠিক এমন সময় ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণ হতে একটা সড়সড় আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠলেন মহর্ষি। অন্ধকারে দেখে মনে হল একখানা অবয়ব যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।

— "কে?" মহর্ষির দৃঢ় কণ্ঠস্বর, "কে ওখানে?"

— "মহর্ষি, আমি।" অন্ধকার হতেই উত্তর এল, "রানি কঙ্কাবতী"। অচিরেই মশালের আলোয় ফুটে উঠল রানি কঙ্কাবতীর বিধ্বস্ত চেহারা।

"আপনি এসেছেন মহর্ষি?" কঙ্কাবতীর চোখে জল, "দেখুন প্রাসাদের কী অবস্থা..."

মহর্ষির কণ্ঠ শীতল, "দেখেছি মহারানি। এক ভয়ংকর প্রলয় যেন বয়ে গিয়েছে প্রাসাদের উপর দিয়ে। দেবীগৃহও তো রক্ষা পায়নি। অবিচল কেবল দেবী সিংহবাহিনীর সিংহাসন। কিন্তু আপনারা নির্বিঘ্নে রয়েছেন কী করে?"

— "এ মায়েরই কৃপা। আজ এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল চোখের সামনে যা দেখে নিজেরই ঘোর লাগছে মহর্ষি, ঠিক দেখেছি তো?..." রানি কঙ্কাবতী বলে চললেন,

— "তাঁর আগে বলুন রাজকন্যা কই?"

— "আপনার কন্যার কাছে। লল্লটা আমাকে রাজকন্যা সমেত এই ঘরে পৌঁছে দেওয়ার মুহূর্তেই এখানে হাজির হয় একদল আক্রমণকারী। আমি কোনোরকমে দ্বার রুদ্ধ করে তাদের কিছুক্ষণের জন্য ঠেকিয়ে রাখি। কিন্তু বুঝতে পারি এই ভাবে ওদের আটকে রাখা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। ওদিকে তাদের ক্রমাগত আক্রমণে ঠাকুর ঘরের দ্বার প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আমি তখন বাধ্য হই গোপন পথ খুলে দিতে। আগেরবারে যেহেতু আমি আপনাকে সেই পথ খুলতে দেখেছিলাম তাই আমার পক্ষে দরজাটা খুলতে অসুবিধে হয়নি। আমি লল্লটার কোলে শিবদ্যুতিকে দিয়ে তাকে অনুরোধ করি রাজকন্যাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে। আমি নিজে এখানে থাকতে চেয়েছিলাম কারণ লল্লটা দরজা বন্ধের পদ্ধতি জানত না। আর তিনজনেই যদি চলে যেতাম তাহলে ওই খোলা পথ ধরে ওরা আমাদের পিছু নিত। যা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। লল্লটা অবশ্য আমায় ফেলে যেতে চায়নি। কিন্তু আর উপায়ও ছিল না। ওরা গোপন পথ ধরে নেমে যেতেই আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। আর তারপরেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ঠাকুরঘরের দরজা।"

— "দীর্ঘদিনের অনভ্যাস, তাও আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি ওদের আটকাতে। ঠিক এই রকম এক ভয়ংকর পরিস্থিতিতে যখন ওরা প্রায় আমায় ঘিরে ফেলেছে ঠিক তখনই দেখি ওদের মধ্যে কেউ একজন দেবীর সিংহাসনের

দিকে হাত বাড়িয়েছে ওই মুহূর্তে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। একটা উজ্জ্বল সাদা আলোর বিস্ফোরণ ঘটল যেন দেবী গৃহের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দূরের দেওয়ালে ছিটকে পড়লাম। মাথায় চোট পেলাম। বুঝতে পারলাম চেতনা লোপ হচ্ছে, কিন্তু চেতনা লোপ পাওয়ার আগের মুহূর্তে দেখলাম একখানা নারীর অবয়ব ঠিক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর সারা দেহ হতে উজ্জ্বল সাদা আলো এমনভাবে বিকিরণ হচ্ছিলো যে সেদিকে তাকানোই যাচ্ছিল না। আবয়বটা মাথায় বাড়তে বাড়তে আচমকা ছাদ ফুঁড়ে উপরে উঠতে লাগল, আর ঠিক তখনই এই ঘরের ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তারপর... তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।"

মহর্ষি স্বর্ণখড়গটা দেবীর সিংহাসনে রেখে দেওয়ালে আটকে দিলেন হাতের মশালটা। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তির অভিমুখে, সেই ভাঙা স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন, "সবই, মায়ের ইচ্ছে মহারানি। সবই মায়ের ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছের বাইরে আমরা কেউ নই।" কথাটা বলতে বলতেই অঝোরে ঝরতে লাগল দু-নয়নের জল। কিছুক্ষণ এইরূপ বিমূর্ত ভঙ্গীতে বসবার পর চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর মহারানির দিকে তাকিয়ে বললেন,

— "আপনি মায়ের কৃপাধন্য মহারানি, জীবনের শেষ ক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনি মায়ের মূর্তি চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য পেলেন।" মহারানির মুখে স্মিত হাসি।

— "আপনি ঠিক বলেছেন মহর্ষি, আমি সত্যি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি। সেই উজ্জল অবয়ব দেবী ছাড়া আর কারো নয়। মায়ের যে দেখা পাব আমি..." তারপরেই কী একটা ভেবে অবাক চোখে তাকালেন মহর্ষির দিকে,

— "কী বললেন আপনি... জীবনের শেষ ক্ষণে?"

মহর্ষির চোখের জল বাঁধ মানছিল না যেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে বলে উঠলেন, "আমায় ক্ষমা করবেন মহারানি। আমায় ক্ষমা করবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুপাদ কোমরে গোঁজা ছুরিখানা বের করে তা বিদ্যুৎগতিতে

গোঁখে দিলেন কঙ্কাবতীর বুকে। আর তারপরেই বাচ্চাদের মতো হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। অচিরেই একটা চাপা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল মহারানির গলা থেকে। বিহ্বল মহারানি বুঝে উঠতেই পারলেন না কী হল। শেষ মুহূর্তে ঢলে পড়বার আগে, তিনি আঁকড়ে ধরলেন ফুঁপিয়ে কেঁদে চলা বুড়ো মানুষটাকে। মাটিতে পড়বার আগেই মহর্ষি দুইহাতে আঁকড়ে ধরলেন কন্যাসম কঙ্কাবতীকে। "আপনাকে আমি বাবার জায়গায় বসিয়েছি চিরকাল। মেয়ে যাওয়ার সময় বাবার চোখে জল দেখলে কী শান্তিতে যেতে পারবে?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মহর্ষি, "আমায় ক্ষমা করে দাও কঙ্কাবতী। আমার কিছু করার ছিল না।"

— "জানি বাবা... আপনি যা... ক...রেন তা দেবীর ইচ্ছাতেই করেন। আর এ-ও জানি, এটাও তারই ইচ্ছে। নিশ্চয়ই আমার মৃত্যুর পিছনে কোনো গূঢ় কারণ রয়েছে। আমার আপনার প্রতি কোনো রাগ নেই পিতা। কোন রাগ নেই। এবার আমার যাওয়ার সময় হল... আমায় বি দা..."

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কঙ্কাবতী। অবসন্ন দেহটা এলিয়ে পড়ল মহর্ষির কোল থেকে। আর ঠিক তখনই মহর্ষির গলা চিরে কন্যাহারানোর আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল ভগ্ন প্রাসাদের কোণে কোণে।

রক্ত কঙ্কালী
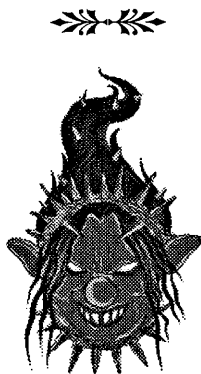
(শক্তিকুণ্ডলী)

"মহর্ষি? আপনি?"

মন্দিরের ফটকে মহর্ষি শম্ভুপাদকে দেখে চমকে উঠলেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

পূর্ণিমার দু-দিন আগের সন্ধ্যা। চরাচরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার যেন বান ডেকেছে। সদ্য সমাপ্ত হয়েছে মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি। প্রধান পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপখানা নামিয়ে রাখলেন পেতলের রেকাবের ওপর থেকে। ধুপ-ধুনো, কর্পূরের সুগন্ধে গৃহগর্ভ মুখরিত। পুষ্প, চন্দনে শোভিত দেবীর পাথরের শিলামুর্তি। আগে ভক্তদের উপস্থিতিতে গমগম করত মন্দিরের সামনেটা। আজকাল আর এখানে কেউ সন্ধ্যা আরতি দেখতে আসে না। শুধু সন্ধ্যা আরতি কেন? আজকাল দিনের বেলাও ভক্তদের সমাগম হয় না এ মন্দিরে।

কিছু লোকের বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে টিকে আছেন দেবী রঙ্কিনী।

পুরোনো অভ্যাস মতো, আরতি শেষ করে শান্তিজলটা ভক্তদের উদ্দেশে ছড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরের সেবাইতেরাও অবাক। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহর্ষি শম্ভুপাদ।

দীর্ঘদিন মহর্ষি নিরুদ্দেশ ছিলেন রাজ্য হতে। কোনোভাবেই তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ বলত তিনি নাকি মারা গিয়েছেন, কেউ বলত তিনি নাকি জীবিতই রয়েছেন আর নাকি এই রাজ্যেই রয়েছেন। তবে ছদ্মবেশে। দু'দিন আগে হওয়া এক ভয়ংকর যুদ্ধে রাজপ্রাসাদ ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ধ্বংস হয়েছে সমস্ত রাজকীয় সম্পত্তি। এমনকী সেই যুদ্ধে অবিশ্বাসী প্রজাদের হাতে মারা গিয়েছেন মহারানি কঙ্কাবতীও। লোকে এই ধরনের আলোচনাও করেছে, মহর্ষি সত্যি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই রানিকে রক্ষা করতেন। প্রাসাদকে রক্ষা করতেন। সেই ভয়ংকর বিপদের মুহূর্তেও মহর্ষিকে

দেখা যায়নি। তাই আজ মন্দিরের দ্বারে মহর্ষির আচমকা আবির্ভাবে সকলেই খানিকটা হচকচিয়ে গেল। মহর্ষি নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন দেবীকে।

— "হ্যাঁ, আমি। আপনার সন্ধ্যা আরতি দেখতে এলাম। তা আপনার কাজ কী শেষ মুখুজ্জ্যে মশাই?"

পুরোহিত কৃষ্ণপাণি মুখোপাধ্যায় সাধাসিধে লোক। তিনি মুখে হাসি ঝুলিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ, আরতি তো শেষ। এরপর দেবীকে শয়ান দেব। তারপর সেবাইতরা পুজোর জায়গাটা পরিষ্কার করবে। তারপর আমি মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করব আজকের মতো। কাল আবার..."

— "তার আর প্রয়োজন নেই, মুখুজ্জ্যে মশাই। আমি দেবীর শয়ান করিয়ে দেব। আর প্রয়োজন মতো আমিই মন্দিরে দ্বার দিয়ে দেব। আপনি সেবাইতদের নিয়ে গ্রামে ফিরে যান। অনেকটা পথ আপনাদের নীচে নামতে হবে।"

— "আপনি? আপনি... পারবেন?"

— "কেন পারব না?"

— "না মানে আপনি তো... কোনোদিন..."

— "আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আপনার দেবীর ইচ্ছা ব্যতীত আমি কোনো কাজ করি না। আজও করব না।" মহর্ষির কঠিন স্বর শুনে মুখেজ্জ্যে মশাই আমতা আমতা করে বলে উঠলেন, "না না, সে আছে... ঠিক আছে। আমরা তাহলে আসি।"

তিনি দেবীর উদ্দেশে প্রণাম সেরে সেবাইতদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন মন্দির থেকে। ওদের চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মহর্ষি।

অন্ধকার পাহাড়ি পথে ওরা অদৃশ্য হতেই মহর্ষির বুকের ভেতর হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এরা আজ খুব অবাক হয়েছে। অবাক হওয়ারই কথা। এতদিন তিনি জনমানসে আসেননি। এমনকী সেই ভয়ংকর দিনেও কেউ মহর্ষিকে দেখেননি। লোকেরা নিশ্চয়ই ভেবেছে তাঁর প্রয়াণ ঘটেছে। অবশ্য লোকেদের আর দোষ কী? লোকেরা তো আর পুরো ঘটনাটা জানে না। ঠিক

এই সময় মুহূর্তের একক ভগ্নাংশে তাঁর মানসচোখে ফুটে উঠল সেই দৃশ্য যখন কঙ্কাবতী ছুরিবিদ্ধ হয়ে তাঁর শরীরে এলিয়ে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল।

না, আর দেরি করা উচিত নয়। যেই কাজে এসেছেন সেই কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।

মন্দিরটা মূলত একখানা গুহা হলেও গুহার সামনের দিকটা মন্দিরের আদলে গড়ে দেওয়া হয়েছে। মহর্ষি দেরি না করে মন্দিরের সুবিশাল দরজা খানা নিজের হাতে লাগিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে পঞ্চপ্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। মন্দিরের একপাশে জাগপ্রদীপের আলোও কিঞ্চিত দৃশ্যমান। মহর্ষি দেবী বিগ্রহের সম্মুখে পদ্মাসনে বসে কাঁধের কাপড়ের পুঁটুলিখানা নামিয়ে রাখলেন। তারপর চন্দন কাঠের বাক্স আর একখানা লাল কাপড়ের ছোট থলে বের করে আনলেন সেই পুঁটুলি হতে। মাথায় ঠেকিয়ে চন্দন কাঠের বাক্সটা প্রণাম করে খুলতেই দেখা গেল ভেতরে রাখা রয়েছে রক্তে ভেজা লালশালুতে মোড়া দেবী রঙ্কিনীর কালো জিহ্বা। হ্যাঁ, রঙ্কিনীর জিহ্বা সম্পূর্ণ কালো হয়ে গিয়েছে। মর্ত্য গন্ধর্বদের বানী মতে মহাপ্রলয় আগত। মহর্ষি দেবীর জিহ্বাকে নামিয়ে রাখলেন সামনের একটি পুষ্পপাত্রে। সেই প্রথমদিনের মতো আজও রঙ্কিনীর জিহ্বা থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা কাঁচা রক্ত।

কয়েকমুহূর্ত সেইদিকে তাকিয়ে লাল কাপড়ের থলের মুখখানা খুলে ভেতরের জিনিস উপুড় করে ঢেলে দিলেন পুষ্পপাত্রের ওপরে। বেরিয়ে পড়ল আটখানা কালো হয়ে যাওয়া নাভিকুণ্ডলী। সাতখানা এর আগেই জোগাড় করেছিলেন তিনি। বাকি ছিল মহারানি কঙ্কাবতীর, সেটাও মহারানির চিতা হতে সংগ্রহ করেছেন মহর্ষি।

দেরি না করে অতিদ্রুত হাতে পুষ্পপাত্রের চারদিকে আটখানা নাভিকুণ্ডলীকে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর তুলে নিলেন দেবীর কপালে ছোঁয়ানো সিঁদুর। সেটাকে ভালো করে মাখিয়ে দিলেন দেবীর জিহ্বায়।

খুব ধীরে ধীরে বজ্রাসনে বসে কোমরে গুঁজে-রাখা রঙ্কিনী দেবীর সোনার খড়গটা বের করে আনলেন। সম্মুখে দেবীর আবক্ষ মূর্তি। মূর্তি বলতে

ফুল-বেলাপাতাতে নিবেদিত একখানা বিরাট কালো পাথর। এটাই রঙ্কিনী দেবী।

মহর্ষির চোখের সামনে আবার এক অন্ধাকার রাতের দৃশ্যপট ফুটে উঠল।

যজ্ঞবেদীর উপর দাউদাউ করে জ্বলছে নীলআগুনের শিখা। যজ্ঞবেদীর ওপারে সাদা জোব্বা পরে দাঁড়িয়ে-থাকা তিন জন মর্ত্যগন্ধর্বেরা মাথা নাড়াল,

— "হ্যাঁ, মহারানি কঙ্কাবতী"

— "কিন্তু কেন?" মহর্ষির মুখ থেকে বিস্ময়ে কথা সরছে না, "মহারানি কঙ্কাবতীকে আমি কেন মারব?"

মর্ত্যগন্ধর্বের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "কারণ মহারানি কঙ্কাবতী অষ্টমগর্ভের ধারক। আর তোর এই মুহূর্তে দরকার আট জন সেই রমণীর নাভিকুণ্ডলী, যারা রঙ্কিনীর শক্তিঅঙ্গের রক্ষা করেছিল।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" মহর্ষি অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

— "কল্লকেশী পুনরায় জন্ম নেবেই। কিন্তু যে শরীরে সে জন্ম নেবে তা জগন্নাথ দেবের মতো হবে না। সেই নতুন শরীরে কিছুটা কল্লকেশীর প্রভাব থাকবে। আর কিছুটা থাকবে না। এই দোলাচল কাটবে তখনই যখন কল্লকেশীর নতুন শরীর বাকি-থাকা শেষ রক্ত বিন্দুর মাধ্যমে যুক্ত হবে। আর এটা হবেই। আর একবার এটা হলে নতুন শরীর পুরোপুরি কল্লকেশীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তখন কল্লকেশী নিজের পুরো শক্তি ফেরত পাওয়ার জন্য দুটো জিনিস চাইবে। এক রঙ্কিনীর আসল জিহ্বা আর দুই অষ্টমগর্ভের সন্তান। এই দুটোকেই তোকে রক্ষা করতে হবে।"

— "হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে, ওদের নাভিকুণ্ডলী আর মহারানির মৃত্যুর কী সম্পর্ক?"

ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "মায়ের শক্তি একমাত্র তাঁর সন্তানের সূত্রেই। সন্তান না থাকলে মাতার অস্তিত্বও লীন হয়ে যায়। এবার একটু ভেবে দেখ শম্ভুপাদ... সন্তানের সঙ্গে মায়ের যোগসূত্র হল নাভিকুণ্ডলী।

তা-ই নাভিকুণ্ডলীর শক্তি সকল কিছুর ঊর্দ্ধে। তা-ই তো কখনওই

নাভিকুণ্ডলীকে সর্বশক্তিমান অগ্নি গ্রাস করতে পারে না। এবার সেই সাত জন রমণী খুব তাড়াতাড়িই মারা যাবেন যারা গর্ভ প্রাচীর তৈরি করেছিল। তাই তাদের নাভিকুণ্ড পাওয়া তোর জন্য কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু মহারানি কঙ্কাবতীর এখনই মরবার কথা নয়। তাই তিনি যদি না মারা যান তাহলে কখনওই তাঁর নাভিকুণ্ডলী তোর পাওয়া হবে না। আর নাভিকুণ্ডলী না পেলে...

— "এই নাভি কুন্ডলীই কী একমাত্র উপায়? এছাড়া আর কোনো উপায় কিছু নেই?"

— "উপায় থাকলে আমরা তোকে সেটাই বলতাম শম্ভুপাদ। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকটা জিহ্বা খণ্ডের সঙ্গে এই নাভিকুণ্ডলী একসঙ্গে প্রতিস্থাপন করতে..."

— "জিহ্বা-খণ্ড?" মহর্ষি একটু ধন্দে, "না... না। আপনাদের বুঝতে বোধ হয় কিছু অসুবিধে হচ্ছে। এই দেখুন দেবীর জিহ্বা তো একটাই। এতে কোনো আলাদা খণ্ড বা টুকরো নেই। এটা পুরোটাই গোটা..."

কথা বলতে গিয়েই মাঝপথ থমকে গেলেন মহর্ষি। মর্ত্যগন্ধর্বরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে,

— "আপনারা বলছেন..."

— "রঙ্কিনীর জিহ্বাকে খণ্ড খণ্ড করতে হবে। একটা দুটো নয়। পুরো আটটা খণ্ডে।"

— "কী!"

— "হ্যাঁ। তারপর সেই জিহ্বা-খণ্ড আর এই নাভিকুণ্ডলী একসঙ্গে পুঁতে দিতে হবে আটটি রঙ্কিনী পীঠের গর্ভগৃহে।"

— "আটটি?"

— "হ্যাঁ। তোর কী মনে হয় রঙ্কিনী শুধুমাত্র জাদুগোড়াতেই অবস্থিতা? তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। সেই জায়গাগুলোর মধ্যে আটটি জায়গায় তোকে এই জিহ্বার খণ্ড আর এই নাভিকুণ্ডলী নিয়ে পৌঁছোতে হবে।"

— "কল্পকেশীর হাত থেকে রঙ্কিনীর জিহ্বাকে রক্ষা করতে হলে এই কাজটা করতেই হবে তোকে। আটটা খণ্ড, আটটা নাভিকুণ্ডলী, আটটা জায়গা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মহর্ষি। তারপর আচমকা বলে উঠলেন, "শুধু কী রঙ্কিনীর জিহ্বা রক্ষা করার জন্যই এত বড় একটা প্রক্রিয়া?"

আবার তিনজন একসঙ্গে আকাশের পানে তাকিয়ে একই সুরে বলে উঠলেন, "পুরো কাজটাই রাঢ়ভূমকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া। রঙ্কিনীর জিহ্বাকে বাঁচালে কল্পকেশী কখনও নিজের পূর্ণ শক্তি পাবে না। কিন্তু তারপরেও কোনোভাবে কোনো অঘটন ঘটল আর কল্পকেশী নিজের পূর্ণশক্তি পেয়ে গেল, তখন তো সৃষ্টিকে রক্ষা করতেই হবে। তা-ই না?"

— "তার মানে এইটা শুধুমাত্র জিহ্বা রক্ষা করার জন্য?"

— "আপাততর জন্য এই কারণটাই প্রাধান্য পাক। যত তাড়াতাড়ি পারিস, এই কাজ শুরু করে দে। কারণ তোর হাতে সময় খুব কম...। জাদুগোড়া, আর ঘাটশিলা ছাড়াও যে ছয়টি জায়গায় তোকে যেতে হবে সেগুলো কিন্তু খুব কাছাকাছি নয়। ওড়গোন্দা, ডাইনিটিকরি কাছাকাছি হলেও খেজুরি, পঞ্চকোট রাজবাড়ি, ময়নাগড় রাজবাড়ি আর শ্যামরূপার গড় কিন্তু বেশ দূর একে অপরের থেকে।"

— "আশা করি তোর আর কিছু জানার নেই।" তিন জনের মধ্যে এক জন বলে উঠল, "এবার তাহলে আমরা বিদায় নেব।"

— "একটা প্রশ্ন ছিল, এই জিহ্বা খণ্ড কীভাবে হবে?"

— "এই জিহ্বা, রঙ্কিনীর শক্তিঅঙ্গ। তাকে খণ্ড করতে হলে... দেবীর কোনো পীঠেই খণ্ডন করিস। সবচেয়ে উপযুক্ত জাদুগোড়ার মন্দির। জায়াগাটা তুলনামূলক নির্জন।"

— "রঙ্কিনীর জিহ্বাকে দেবী মূর্তির সামনে আটখানা নাভিকুণ্ডলীর কেন্দ্রে স্থাপন করে, দেবীর সিঁদুর কাজে লাগা অভিষেকের জন্য। তারপর দেবীর বীজমন্ত্র একশো আশি বার উচ্চারণ করে দেবীর খড়্গের ব্যবহার কর।"

— "তাতেই হয়ে যাবে?"

— "এটা এতো সোজা নয় শম্ভুপাদ। প্রত্যেকটা কাজেরই কিছু মূল্য থাকে।

এই কাজের ও কিছু মূল্য তোকে ব্যয় করতে হবে। সে মূল্যের কাছে একসময় মৃত্যু হয়তো অনেক স্বস্তির মনে হবে। কিন্তু এছাড়া তোর কাছে আর কোনো পথ নেই।"

— "আর দুটো সতর্কবার্তা যাওয়ার আগে, এক প্রলয়ের দিন আসার আগেই কাজটা সেরে ফেল। কারণ তারপর থেকে রঙ্কিনীকে যেই রূপে দেখতে অভ্যস্ত সেই রূপে সে নাও থাকতে পারে।"

— "আর দ্বিতীয় সতর্কবার্তা?" মহর্ষির কণ্ঠে সতর্কতা।

তিন জনে ফের আকাশপানে মুখ তুলল, "রঙ্কিনী নিজের অধিষ্ঠানস্থান এমনি এমনি শূন্য ছেড়ে আসবে না। নিশ্চয় সেখানে এমন কিছু থাকবে যা এতদিন ধরে সেই পীঠ পাহারা দিচ্ছে। সে তোকে বাধা দেবেই। তাই জাদুগোড়া আর ঘাটশিলা বাদে বাকি ছ-টি পিঠে সাবধানে থাকিস..." সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটটা মহর্ষির চোখের সামনে থেকে সরে পুনরায় মন্দিরের গৃহগর্ভ ফুটে উঠল। মহর্ষি দেরি না করে মনে মনে দেবীর বীজমন্ত্র স্মরণ করলেন। এক দুই করে মোট একশো আশি বার।

আর তারপরেই, বলির মতো করে খড়গটাকে মাথার ওপরে তুলে সজোরে কোপ মারলেন কালো হয়ে যাওয়া স্বর্ণজিহ্বায়। সঙ্গে সঙ্গে কড়াৎ করে বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল আর আটটা খণ্ডে টুকরো হয়ে গেল দেবীর জিহ্বা। মহর্ষির টের পেলেন আচমকা প্রকৃতি যেন একটু বেশিই শান্ত হয়ে গেছে। ঠিক ঝড়ের আগে যেমন হয়। ক্ষণিকেই মহর্ষির ভুল ভাঙল। মাটির নীচে আচমকা শুরু হল এক কম্পন। মহর্ষি দেখলেন পুষ্পপাত্রের নীচ থেকে গুহার মেঝে বরাবর একটা চিড়ফাটল রঙ্কিনীর বিগ্রহের দিকে এগিয়ে গেল। আর তারপরই সেই ফাটল রঙ্কিনীর বিগ্রহকে লম্বালম্বি দুটো খণ্ডে ভাগ করে দিল। আর ঠিক তখনই মন্দিরের গৃহগর্ভের মধ্যে যা হল, তা যেন সাক্ষাৎ তাণ্ডব।

বিগ্রহের চিড় খাওয়া ফাটল থেকে উজ্জ্বল সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে শম্ভুপাদের দেহে মিলিয়ে যেতেই পঞ্চপ্রদীপের আগুন কোনো এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে মুহূর্তেই বিস্ফোরণের আকারে বদলে গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে এক প্রচণ্ড হাওয়া, গুহার ভেতর যেন সব কিছু ওলোটপালট করে দিল।

আগুনের তাপে ঝলসে যাচ্ছে মহর্ষির সারা শরীর। পুড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠলেন মহর্ষি। কিন্তু আগুনের তাপ যেন কমছে না কিছুতেই। এই অবস্থায় বিগ্রহ হতে একটা তীব্র সাদা আলো বেরিয়ে রুদ্ধ দেবীগৃহের ভেতরখানা ভাসিয়ে দিল একদম।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বহু দূরের কোনো পাহাড়ের গুহায়, একদল নিদ্রারত কাপালিকের মধ্যে একজন ভয়াল চেহারার কাপালিক ধড়ফড় করে নিজের শয্যায় উঠে বসল।

গুহার এককোণে টিমটিম করে একখানা প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল প্রদীপের সম্মুখে রক্তজবা নীল আপরাজিতায় আচ্ছাদিতা এক ভয়ংকর দ্বিভুজা মূর্তি। মূর্তির একহাতে খড়গ। অন্য হাতে কাটা মুণ্ডু।

পদতলে মুণ্ডুহীন দেহ। খানিকটা কালীমূর্তির ধারায় গড়া। কিন্তু মুখের ভয়ংকর ভাব দেখে ভক্তির বদলে ভয়ের উদ্রেক বেশি হয়।

কাপালিক মূর্তির দিকে তাকাতেই একটু আগের ভয়ের ভাবখানা বদলে গেল প্রসন্নতায়।

কাপালিক বিড়বিড় করে মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "চিন্তা করিস না, আমি যাব মা। আমি যাব।"

(অশুদ্ধ উপাচারী)

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। সবেমাত্র পূর্বদিক, একটু একটু করে ফরসা হতে শুরু হয়েছে। কৃষ্ণপাণি মুখোপাধ্যায় পাহাড়ি চড়াই-উতরাই বেয়ে আগে আগে চলছেন। চলছেন বলার থেকে দৌড়োচ্ছেন বলা ভালো।

তাঁর পিছনে একজন সেবাইত আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুখুজ্জ্যে মশাইয়ের তালে তাল রেখে তাঁকে ধরার। কিন্তু পারছে কই? উভয় এর মুখেই একটা অজানা আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে।

সেবাইতরা সূর্যোদয়ের বহুপূর্বেই স্নান সেরে মন্দিরে চলে আসে। আগের দিনের পুজোর জায়গা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা, পুজোর বাসনপত্র মাজা, ফুল তোলা, চন্দন বাটা, প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপের সলতে পাকিয়ে রাখা, তারপর দেবীর ভোগ রান্না। ভোর হতে না এলে চলবে কেমন করে?

কাল রাত্রে মহর্ষি শম্ভুপাদ আচমকা হাজির হলেন মন্দিরে। শুধু তা-ই নয় দেবীকে শয়ান দেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন স্বেচ্ছায়। মহর্ষি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠান করেন। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস কেউই দেখায় না এই রাজ্যে। কিন্তু কাল রাত্রি থেকেই মনটা খচখচ করে চলছে। তিনি ফেরার পথেই সেবাইতদের নির্দেশ দেন যাতে ওরা ভোরবেলা তাড়াতাড়ি চলে আসে।

— "কে জানে? আদৌ উনি পারবেন কিনা? ওনার তো এসব করার অভিজ্ঞতা তেমন নেই। কিন্তু এমন করে বললেন... তোরা কাল একটু তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাবারা। এসে দেখিস যদি আগের দিনেরই জায়গা পরিষ্কার হয়নি। তাহলে সময় পাবি। নইলে সেসব পরিষ্কার করে ভোগের রান্না বসাতে আবার দেরী হয়ে যাবে।"

পুরোহিতের নির্দেশ মেনে খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছিল সেবাইতরা, কিন্তু মন্দিরের মুখে পৌঁছেই তারা দেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ তো নয়ই বরং আধখোলা। খারাপ কিছুর আশায় ওদের বুক কাঁপতে থাকে। তখনই ওরা নিজেরদের মধ্যে শলা করে সবচেয়ে কমবয়সি সেবাইতকে দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণপাণি মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনতে বলে।

ওদিকে অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে সারারাত ঘুমোতে পারেন না মুখুজ্জ্যে মশাই। যেন খুব খারাপ কিছু ঘটতে পারে সেই ভেবেই বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে সদ্য ঘুমটা ধরে এসেছিল ভোরের দিকে ঠিক এমন সময়ই, দরজার বাইরে সেবাইতের হাঁক-ডাক। সেবাইত হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল, তাতে পরিষ্কার ভাবে না বুঝলেও এটা বুঝলেন মন্দিরে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। দেরী না করে, চোখে মুখে জল দিয়ে ছুটলেন, মন্দিরের পানে। পিছন পিছন সেই সেবাইত।

মন্দিরের সামনে তিনি পৌঁছে দেখলেন, বাকি সেবাইতরা ইতিমধ্যেই একখানা মশাল জ্বালিয়েছে। কিন্তু ভয়ে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেনি। আধখোলা দরজার ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পুরোহিত মশাই সেবাইতদের হাত থেকে মশালের আলোটা নিয়ে আধখোলা দরজাটা ভেতর দিকে ঠেলতেই একটা বিশ্রী ক্যাঁচ করে শব্দ হল।

দরজার ডান দিকেই একটা ধুনি থাকার কথা। মহর্ষি, দেরী না করে মশালের আলোটা দিয়ে ধুনিটা জ্বালাতেই ধুনির আগুনের হলদেটে আভা ছড়িয়ে পড়ল সারা গুহায়। আর সেই আলোয় গুহার ভেতরকার দৃশ্যটা ওদের চোখের সামনে ফুটে উঠতেই সকলের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল যেন।

পূজার সমস্ত উপকরণ, থালা, বাটি, জাগপ্রদীপ, প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, ধুপদানি, কর্পূরদানি, ধুনুচি, ফুল-বেলপাতা, দেবীঘট সব... সব কিছুই ওদের মাথার ওপরে শূন্যে ভাসছে।

"এ... এসব কী?"

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না মুখুজ্জ্যে মশাই। এরকম কাণ্ড তিনি কখন নিজের চোখে দেখবেন এ তাঁর কল্পনাতেই ছিল না। আর ঠিক তখনই একজন সেবাইত তাঁর কাঁধ খামচে কোনোরকমে গোঁ গোঁ করে গুঙিয়ে উঠল। ঘটনায় বিহ্বল পুরোহিত সহ বাকিরা তার দিকে তাকাতেই সকলে দেখল সে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করছে দেবী মূর্তির দিকে। এতক্ষণ সেদিকে কারো নজর পড়েনি। আচমকা লোকটির ইশারায় সেদিকে তাকাতেই একখানা শীতল স্রোত বয়ে গেল সকলের মেরুদণ্ড দিয়ে, দেবী বিগ্রহের মাঝে লম্বা লম্বি একখানা ফাটল, আর সেই ফাটল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে কাঁচা রক্ত। সেই রক্ত গড়িয়ে সারা মেঝে ভরে উঠেছে।

এসব দেখে সেবাইতরা ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল গ্রামের দিকে।

আর কৃষ্ণপাণি মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শুধু একটাই কথা... "মহর্ষি, এ কী করলেন আপনি?"

*   *   *   *   *   *   *   *

ধলভূমগড় সাম্রাজ্য জুড়ে এমনিতেও অনেক ছোট ছোট জনপদ থাকলেও উঁচুটিলার উপর অবস্থিত রাজপ্রাসাদ থেকে যে ক-টি জনপদ দেখা যেত তাদের মধ্যে একটি হল বাগমারী জনপদ। লোকসংখ্যা খুব বেশি নয়। বড় জোর তিরিশ চল্লিশটি পরিবারের বসবাস এই জনপদে। এই জনপদের লোকজনদের জীবন বড়ই আড়ম্বরহীন। তাই এদের শান্তির অভাবও ঘটে না। কিন্তু কয়েকদিন থেকে বড় হই হট্টগোল এ তল্লাটে।

কয়েকদিন আগের এক ভয়ংকর যুদ্ধে ধলভূমগড়ের রাজতন্ত্র ব্যবস্থা একদম ভেঙে পড়ে। শোনা যাচ্ছিল প্রজাবিক্ষোভ। কী বিক্ষোভ, কীসের জন্য বিক্ষোভ তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যাথা ছিল না এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর। কয়েকজন কিঞ্চিত আগ্রহ দেখিয়েছিল বটে, তবে জনপদ প্রধানের কঠোর নির্দেশ ছিল এই সবের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকতে। তারই ফল বলা যায়, জনপদ পুরুষশূন্য হয়নি।

রাজামশাই আর রাজমাতা বহুদিন আগেই গত হয়েছিলেন। রানিমা রাজকন্যাকে নিয়ে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রেখেছিলেন ব্যাপারটা, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনিও প্রাণ হারান। প্রাসাদের উত্তরাধিকারী বলতে ছিলেন রাজকন্যা শিবদ্যুতি। কিন্তু তিনিও সেই যুদ্ধের পর থেকে নিখোঁজ। কে জানে বেঁচে আছেন কিনা?

কথায় বলে অভিভাবকহীন সাম্রাজ্য কখনও ফেলে রাখতে নেই। পার্শ্ববর্তী রাজ্য চাকুলিয়ার রাজা সৌরবর্মা এমনিতে ভীতু ধরনের হলেও এইসময় খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে পুরো ধলভূমগড় রাজ্য সেনা দিয়ে দখল করে নিলেন। যারা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের মধ্যে মহর্ষি শম্ভুপাদ বহুদিন যাবত নিখোঁজ। সেনাপতি কালিদাস সেই যুদ্ধেই প্রাণ হারান। বাকি ছিলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী বিপ্রবাহু মহাশয়। তিনি আর এই পরিস্থিতিতে কী করবেন?

দেখতেই দেখতে ধলভূমগড় সাম্রাজ্য চাকুলিয়ার রাজার নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। তারপর থেকেই ভিনরাজ্যের সেনা টহলদারি বেড়েছে পুরো এলাকায়। আজ আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার ন্যায় হাজির হয়েছে, আরো মিস্ত্রী,

মজুর, লোকলস্কর, পাথর সরানোর যন্ত্রপাতি। আরো কত কী? শোনা যাচ্ছে পুরোনো ভেঙে পড়া রাজপ্রাসাদ আবার নতুন করে গড়ে তোলা হবে। পথের মাঝে বাগমারী অবস্থিত হওয়ায় এই হৈ হট্টগোল জনপদকেও ভোগ করতে হচ্ছে।

গ্রামের একেবারে দক্ষিণের দোতলা মাটির বাড়িটি জনপদ প্রধান সর্বেশ্বর রানার। নিঃসন্তান সর্বেশ্বর রানার স্ত্রী কয়েকবছর আগেই রোগভোগে গত হয়েছে। তারপর থেকে তিনি একলাই ছিলেন। কিন্তু আচমকা একদিন জনপদের লোকেরা আবিষ্কার করে, সর্বেশ্বর রানার বাড়িতে এক শিশুর আগমন ঘটেছে। কৌতূহলবশত কেউ কেউ এই ব্যাপারে আগ্রহী হলে প্রধান তাদের নিরস্ত করেন এই বলে যে শিশুটিকে তিনি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছেন। মা রঙ্কিনীর আশীর্বাদ হিসেবেই তিনি একে গ্রহণ করেছেন। লোকে বোঝে সর্বেশ্বর আসল কথাটি গোপন করলেন। লোকজন তারপরে তাকে ঘাঁটায় না। দেখতে দেখতে তারপরে সাত-সাতবছর কেটে গিয়েছে। শিশুটি বড় হয়েছে। বৃদ্ধ সর্বেশ্বরের এখন অনেকটা সময় কেটে যায় এই ছেলেটির পরিচর্যায়। জনপদের লোকেরাও খুশি। অন্তত, বুড়ো বয়সে সর্বেশ্বরকে একলা মরতে হবে না।

এইসব হই-হট্টগোলে বিরক্ত সর্বেশ্বর ঘরে ঢুকেই দেখলেন, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে প্রভুদেব। সেই শিশুপুত্র।

— "প্রভুদেব? ওখানে কী করছ?" সর্বেশ্বর রানার কণ্ঠে উষ্মা। বাচ্চা ছেলেটি, আচমকা পালক পিতার আগমনে হচকচিয়ে গেল।

— "তোমায় না বলেছিলাম, দোতলার যাবে না। কেন উঠলে সিঁড়িতে?" সর্বেশ্বর দ্রুত হাতে পুত্রকে সিঁড়ি থেকে ধরে নামিয়ে দিলেন।

প্রভুদেব, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো খেলছিলাম। হঠাৎ শুনলাম ওপরে কে ঘণ্টা নাড়াচ্ছে। তাই তো দেখতে যাচ্ছিলাম...। বাবা, ওপরে কে আছে?"

— "ঘণ্টার ধ্বনি?" ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল সর্বেশ্বরের।

— "হ্যাঁ, শুনলাম তো। বাবা কে আছে ওপরে?"

সর্বেশ্বর চোখ মটকে একটা মুচকি হাসি হেসে বললেন, "ভূত আছে। গেলেই ধরে নেবে। তারপর গপ করে গিলে খেয়ে নেবে..."

— "ভূত?"

— "হ্যাঁ, ভূত। যাও এবার বাইরে গিয়ে খেলো।"

প্রভুদেব, সর্বেশ্বরের কথা মেনে বাইরে বেরিয়ে যেতেই সর্বেশ্বর সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে এলেন। বাঁশের ওপর মাটি লেপে এই সিঁড়িগুলো বানানো। সিঁড়ির মাথায় দু'দিকে দুটো ঘর। দোতালায় জানালাগুলো ছোট হওয়ার জন্য ঘরগুলোর মধ্যে আলো কম ঢোকে। সর্বেশ্বর একখানা জোরে শ্বাস নিলেন সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে, তারপর বাম দিকের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিলেন।

ঘরটা ছোট। জানালা দিয়ে অল্প সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েলেও ঘরের ভেতরে জায়গায় জায়গায় অন্ধকার। একখানা চৌকির ওপর পরিষ্কার চাদর পাতা রয়েছে। আর সেই চৌকির ওপর কেউ একজন, কালো চাদরে নিজেকে মুড়ে পদ্মাসনে বসে রয়েছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিছু লম্বা চওড়া শরীর দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, ইনি একজন পুরুষ।

— "আপনি ডাকছিলেন?"

— "হ্যাঁ," লোকটির কণ্ঠে উষ্মা, "এই হই-হট্টগোল কীসের? এত আওয়াজ কেন বাইরে?"

— "চাকুলিয়ার রাজা বোধহয় ভেঙে পড়া রাজবাড়ি নতুন করে গড়তে চাইছেন। তাঁরই লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি। আপনার কি কিছু চাই?"

— "প্রভুদেব কোথায়?"

— "আজ্ঞে, বাইরে। ডাকব?" যদিও সর্বেশ্বর রানা নিজের মুখে বললেন কথাটা, তবুও একটা অস্বস্তি হতে লাগল ভিতরে ভিতরে।

লোকটি নিজেই বলে উঠল, "না, থাক। এখন আমার যা অবস্থা ও আমায় দেখলে ভয় পেয়ে যাবে।" তারপরে লোকটি ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলেন, "দক্ষিণের কুলুঙ্গিতে দুটো জিনিস রাখা আছে। নিয়ে এসো।"

লোকটির আদেশ মান্য করে সর্বেশ্বর রানা ঘরের কোণের কুলুঙ্গি থেকে দুটো জিনিস নামিয়ে আনল। একখানা কাগজে লেখা চিঠি। আরেকটা শিকড় দিয়ে বানানো একখানা মাদুলি। মাদুলিটি দেখতে একটা চিহ্নের মতো। একটা চতুর্ভুজ, একখানা ত্রিভূজ, তার ভেতরে একখানা বৃত্ত।

— "এটা কী মহর্ষি?"

হ্যাঁ। চাদরের আড়ালে যিনি ছিলেন তিনি আর কেউই নন। স্বয়ং মহর্ষি শম্ভুপাদ।

শম্ভুপাদ বলে উঠলেন, "প্রভুদেব এখন ছোট। ওর সঠিকভাবে প্রতিপালন করো। তুমি যোগ্য লোক। তা-ই তোমার হাতেই তুলে দিয়েছি আমার বংশপ্রদীপকে। তবে প্রভুদেব আমার নাতি হলেও সকলে জানবে ও তোমারই সন্তান। তোমার পরিচয়েই ও বড় হবে। কিন্তু ওর জীবনের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে সর্বেশ্বর। সেটা ভুলে গেলে চলবে না। কল্লকেশী যখন নতুন করে জন্ম নেবে তখন কাউকে ওকে আটকে রাখতেই হবে। সে ঘটনা আজ থেকে কত বছর পরে হবে আমরা কেউই জানি না। হয়তো আমরা কেউ তখন থাকব না। কিন্তু কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে। আমি চাই আমার বংশধরেরা থাকুক তাকে আটকানোর জন্য।"

— "এই মাদুলি, প্রভুদেব দশ বছরের হলে ওর হাতে পরিয়ে দিও। এই মাদুলির মধ্যে আমার সমস্ত জ্ঞান আর ভবিষ্যতে ওর কী কর্তব্য হবে তার সমস্ত নির্দেশ আছে। ওর জীবদ্দশায় যদি কল্লকেশী জন্ম না নেয় তাহলে ও সেটা পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যাবে। এটাই একমাত্র জিনিস যা আমার বংশধরদের বুঝিয়ে দেবে কোথায় কখন কল্লকেশী আবার জন্ম নেবে। তাই এই জিনিস প্রভুদেবকে ধারণ করতেই হবে। এই নির্দেশের যেন অন্যথা না হয় সর্বেশ্বর।"

সর্বেশ্বরকে একটু বিমর্ষ দেখাল। মহর্ষি তাকে যখন এই সন্তান দিয়েছিলেন, প্রভুদেব তখন ভীষণ ছোট। তিনি প্রথম থেকেই জানতেন, তাঁর কাছে মহর্ষি নিজের বংশধরকে প্রতিপালন করতে দিচ্ছেন, এটা এমনি এমনি নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গুঢ় অর্থ রয়েছে। এর অর্থ যে এই সেটা তিনি

ভাবেননি।

— "যথা আজ্ঞা মহর্ষি। আর এই চিঠি..."

— "এই চিঠি তুমি অত্যন্ত গোপনে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দিও মহামন্ত্রী বিপ্রবাহুর কাছে।"

— "আচ্ছা!"

— "আমি আজ রাত্রেই হয়তো চলে যাব সর্বেশ্বর। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের হয়তো আর কখনই দেখা হবে না। তা-ই যাওয়ার আগে... তোমায় একটা কথাই বলব। তুমি প্রভুদেবকে প্রতিপালন করে আর দু-দিন আগে আমায় আশ্রয় দিয়ে আমার যা উপকার করলে, তা আমি কোনোদিনও ভুলব না।"

— "এ আপনি কী বলছেন মহর্ষি?" সর্বেশ্বরের কণ্ঠে বিনয়ের ছোঁয়া,

— "আমি স্বল্পজ্ঞানী মানুষ। কঠিন তত্ত্ব কথা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি এটা আমার কর্তব্য। কর্তব্য পালনে কৃতজ্ঞতা থাকে না। ঠিক আপনি যেমন এতদিন আপনার কর্তব্য পালন করে এসেছিলেন রাজ্যের প্রতি। আমিও তা-ই করছি।"

একটু থেমে সর্বেশ্বর রানা বলে উঠলেন, "আপনি বোধ হয় শোনেননি। রঙ্কিনীদেবীর মন্দিরে দেবীর বিগ্রহ নাকি মাঝখান থেকে ফেটে গিয়ে সেখান থেকে কাঁচা রক্ত বেরোচ্ছে। পুরোহিত আর সেবাইতরা বলছে সেদিন রাত্রে নাকি আপনিই মন্দিরে গিয়েছিলেন...। লোকজন ভীষণ ভয় পেয়ে রয়েছে মহর্ষি। ওরা মনে করছে এটা ভয়ংকর অমঙ্গলের ইঙ্গিত।"

পুরো কথাটা যথেষ্ট বিচলিত হওয়ার মতোই। কিন্তু মহর্ষির তরফ থেকে কোনো উত্তর এল না। সর্বেশ্বর বুঝলেন এই ব্যাপারে মহর্ষি কোন কথা বলতে চান না। তিনি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "আমি এখন আসি। আপনি বিশ্রাম নিন। কিছু প্রয়োজন হলে আমায় ডাকবেন।"

* * * * * * * *

সূর্য অস্ত গেলেও সন্ধ্যা হতে এখনো বেশ কিছুটা সময় বাকি। মহর্ষি যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর সামনেই প্রবাহিত সুবর্ণরেখার শীতল ধারা। পায়ের তলায় বড় বড় ভাঙা পাথর। পিছন দিকে খাড়া উঁচু পাহাড় আর তার গায়ে জেগে থাকা ঘনবন থেকে ভেসে আসছে পাখিদের কিচিরমিচির আর বানরের হুপহুপ শব্দ। জায়গাটা লোকালয় থেকে বেশ অনেকটা দূরে হওয়ায় খানিকটা নির্জন বলা চলে। মহর্ষির স্থির দৃষ্টি সুবর্ণরেখার ধারায় নিবদ্ধ। গভীর মনোযোগ সহকারে কিছু একটা ভেবে চলেছেন।

ঠিক এমন সময় আচমকা পেছন থেকে একাধিক পায়ের শব্দে মনোযোগ ছিন্ন হল তাঁর। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন দুটো অবয়ব ফুটে উঠেছে নদী তীরে। তারা ধীর পায়ে মহর্ষির দিকেই এগিয়ে আসছে।

একজন প্রাক্তন মহামন্ত্রী বিপ্রবাহু। আরেকজন মহর্ষি কন্যা লল্লটা।

মহর্ষি আপাদ মস্তক কালো চাদরে ঢাকা ছিলেন। দেখা যাচ্ছিল কেবলমাত্র তাঁর চোখ জোড়া। মহর্ষিকে এই আপাদমস্তক কালো চাদরে মুড়ে থাকা অবস্থায় দেখে খানিকটা অবাক হলেন মহামন্ত্রী। ইনি মহর্ষিই তো?

— "মহর্ষিকে প্রণাম!"

— "রঙ্কিনীর জয় হোক"। স্বর শুনে আশ্বস্ত হলেন মহামন্ত্রী। এই স্বর মহর্ষি ছাড়া আর কারো নয়।

— "দীর্ঘদিন পরে আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে ভালো লাগছে। আমি তো ভেবেছিলাম..."

— "আমি মারা গিয়েছি। তাই তো?"

— "না মানে..." অস্বস্তিতে পড়লেন বিপ্রবাহু। তিনি সত্যিই তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু সে কথা তো স্পষ্ট করে আর বলা যায় না।

— "কেমন আছো লল্লটা? রাজকন্যা তোমার আশ্রয়েই তো...? সুস্থ আছেন তিনি?"

এতক্ষণ লল্লটা চুপ করেই ছিল। পিতার এই অদ্ভুত সাজ তাকেও কম অবাক করেনি।

— "হ্যাঁ, পিতা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। আসলে আমি

তলোয়ার ধরছি দীর্ঘদিন... সেটাই খানিকটা অভ্যাস হয়ে...”

— “অভ্যাস বদলে ফেলো লল্লটা। এরপর তলোয়ার ছেড়ে, যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করে, মা হয়ে ওঠো।”

অবাক হয়ে মহর্ষির দিকে তাকাল লল্লটা।

— “কী বললেন? তলোয়ার ছেড়ে দেব? মা হয়ে উঠব?” আচমকা লল্লটার গলায় স্বর উষ্ণ হয়ে উঠল, “আপনার মনে পড়ে পিতা, একজন সদ্য বিধবা এক রমণীর কোল থেকে একদিন তার সন্তান কেড়ে নিয়ে তার হাতে তলোয়ার ধরিয়ে বলেছিলেন, সংসার, মাতৃত্ব এসব নাকি মানুষকে মায়ায় বেঁধে ফেলে, দুর্বল করে তোলে। আজ আর সেই কথা বলবেন না পিতা?”

মহর্ষি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন। কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, “আমি যা করেছি এই রাজ্যের ভালোর...”

— “আপনার কি একবারও কখনও মনে হয়নি, এই রাজ্যের ভালো করতে গিয়ে আপনার কাছাকাছি যারা ছিল তাদের সঙ্গে আপনি কতটা খারাপ করেছেন? আপনার এই ভালো করার মাশুল কতটা আপনাকে আর আপনার পরিবারকে দিতে হয়েছে?”

জায়গা জুড়ে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। লল্লটা ফের বলে উঠল, “আমার এই স্পর্ধার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন পিতা। আজ পর্যন্ত আপনার কোনো আদেশ অমান্য করিনি। আমি রাজকন্যার প্রতিপালন করব ঠিকই। তবে কখনো রাজকন্যার মা হয়ে উঠতে পারব না। আমার ভেতরের মায়া, মমতা, মাতৃত্ব সাত বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর সেটা শেষ করেছেন আপনি। আমার মধ্যে শুধু আছে, কাঠিন্য। ধলভূমগড়ের যোদ্ধাদের চরিত্রের সঙ্গে যা মানায়।”

— “আমি তোমার অপরাধী লল্লটা। পারলে আমায় শাস্তি দিও। কিন্তু ওইটুকু মেয়েকে শাস্তি দিও না।” একমুহূর্ত থামলেন মহর্ষি, “তাছাড়া আমরা সবাই রাজপরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ। ওকে তোমায় মায়ের মতো করে পালন করতেই হবে। অষ্টমগর্ভের রক্তের টিকে থাকাটা দরকার।” তারপর তিনি

ফিরলেন বিপ্রবাহুর দিকে।

— "আর আপনাকেও সতর্ক থাকতে হবে। আমি যেটুকু বুঝেছি জগন্নাথ দেবের শরীর যেহেতু মুক্তি পেয়েছে সে আবার জন্ম নেবেই। তখন কল্লকেশী চাইবেই জগন্নাথ দেবের নতুন শরীর গ্রাস করে রঙ্কিনীর আসল জিহ্বা লাভ করতেই। আপনি এখানেই থাকবেন। এখানে থেকে বংশপরম্পরায়, কুলদেবীর সিংহাসনের নীচে রক্ষিত সেই জিভ রক্ষা করবেন মহর্ষি। সেটাই আপনার দায়িত্ব।"

— "আপনি থাকবেন না, এখানে?" বিপ্রবাহুর প্রশ্নে মাথা নাড়ালেন শম্ভুপাদ।

— "না। আমার আর এখানে থাকা হবে না। রঙ্কিনীর জিহ্বাকে রক্ষা করার জন্য খুব বড় একখানা কাজের দায়িত্ব নিয়েছি। সেটা শেষ করতেই হবে আমাকে।"

— "এভাবে নিজেকে চাদরে ঢেকে রেখেছেন কেন পিতা? কী হয়েছে আপনার?" লল্লটার কণ্ঠে উদ্বেগ।

— "যেই কাজে নেমেছি, সেই কাজ সহজ নয় লল্লটা। তার অনেক মাশুল গুনতে হবে আমায়। তারই কিছুটা নমুনা।"

কথাটা বলেই পরনের চাদর খানা খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখতেই আঁতকে উঠল বাকি দু-জনে। মহর্ষির সারা শরীর ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছে পুরো।

— "এ কী করে হয়েছে মহর্ষি..." মুখে কথা যোগাচ্ছে না মহামন্ত্রীর। লল্লটার চোখে জল। একটু আগে পিতার সঙ্গে করা খারাপ ব্যাবহার এখন বুকে বড় বাজছে তার।

মহর্ষি চাদর খানা আবার পরিধান করলেন, "আমি রঙ্কিনীর মন্দিরে এমন কিছু উপাচার করেছি, যার শাস্তি আমায় মা নিজের হাতে দিয়েছেন। তবে এগুলো দেখা যাচ্ছে তাই আপনারা বুঝতে পারলেন। এমন কিছু শাস্তি থাকে, যা চোখে দেখা যায় না।মা আমাকে সেই শাস্তিও দিয়েছেন।" কথা বলতে বলতেই মাঝপথে থেমে গেলেন মহর্ষি। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত।

এ কী? এ কী দেখছেন তিনি?

সুবর্ণরেখার জল ধীরে ধীরে লাল হয়ে যাচ্ছে...।

— "ও কী? নদীর জল আচমকা... রক্তে বদলে গেল কেমন করে?" চমকে উঠল উপস্থিত সকলে। ক্ষণিকের মুহূর্তে দেখে তা-ই লাগল, যেন আচমকাই সুবর্ণরেখার স্বচছ জল বদলে যাচ্ছে রক্তে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতে পেরে বিপ্রবাহু বলে উঠলেন, "রাজপ্রাসাদের নিকাশি নালার অপর প্রান্ত, মহল হতে বের হয়ে এই একটু আগেই নদীতে এসে পড়েছে ভুলে গেলেন আপনি? শোনা যাচ্ছিল মহলের মেঝের রক্ত এতদিনেও নাকি শুকায়নি অদ্ভুত কারণে। সারা প্রাসাদ নাকি রক্তে চ্যাটচ্যাট করছিল। সেসবই ধোয়া হচ্ছে। আর সেই রক্ত ধোয়া জলই নিকাশি নালার মাধ্যমে নদীতে এসে পড়ছে। রাজমহল নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হয়েছে তো। চাকুলিয়ার রাজা..."

মহর্ষি সামনের দিকে ছুটে এগিয়ে গেলেন...। সত্যি নিকাশি নালা হতে রক্তধোয়া জল স্রোতের আকারে সুবর্ণরেখায় মিশেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে... কী বলেছিল মর্ত্য গন্ধর্বরা? রক্তে বদলে যাবে সুবর্ণরেখার জল...।

আর ঠিক তখনই তাঁর দৃষ্টি পড়ল দূরের টিলার গায়ে... টিলার ওপরের ভাঙা রাজপ্রাসাদ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কী? ভাঙা রাজপ্রাসাদের ওপর বড় বড় পাথর চলে বেড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

— "ওটা কী হচ্ছে মন্ত্রীমশাই? পাথরেরা প্রাণ পেল নাকি?"

— "না না মহর্ষি। পাথর সরানোর যন্ত্রপাতি এনেছে চাকুলিয়ার সৈন্যরা। সেই যন্ত্র করেই ওরা মহলের ভাঙা পাথর সরাচ্ছে। অবশ্য আপনার কোনো দোষ নেই। এত দূর থেকে দেখলেই মনে হবে পাথরেরা নিজেরাই চলাফেরা করছে।"

শিউরে উঠলেন শম্ভুপাদ। ঠিক কী যেন বলেছিল মর্ত্যগন্ধর্বেরা? "একদিন সুবর্ণরেখার জল রক্তে পরিণত হবে, পাহাড়ের পাথর প্রাণ পেয়ে চলাফেরা করবে, রাত আচমকাই বদলে যাবে দিনে, সেদিন জানবি আসবে আসল প্রলয়। মায়ের ক্রোধ অভিশাপ হয়ে ঝরবে সমগ্র ধলভূমগড়ে। দেবী সেদিন

সত্যি হয়ে উঠবে, রক্তখাকি।"

দুটো মিলে গেল। বাকি রইল শেষেরটি... রাত বদলে যাবে দিনে। এটার মানে কী? এটার অর্থ কী হতে পারে... রাত বদলে যাবে দিনে... দিনের আলোয় বদলে যাবে রাতের অন্ধকার। শিউরে উঠলেন মহর্ষি,

— "আজ পূর্ণিমা না?"

— "হ্যাঁ, মহর্ষি। আজ ভাদ্রপদ পূর্ণিমা..."

এই পূর্ণিমায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে চরাচর প্লাবিত হয় উজ্জ্বল চাঁদের আলোয়। রাতের অন্ধকার হ্রাস পায় উজ্জ্বল চাঁদের আলোয়। মিলে গেল... আজকেই সেই দিন। আজকেই সেই দিন...

তিনি লল্লটার দিকে ফিরে বললেন, "আমায় যেতে হবে লল্লটা। সময় নেই, একদম। তুমি নিজের খেয়াল রেখো। আর যত দ্রুত পারো যত দূরে যাওয়া যায় চলে যাও। এই স্থান রাজকন্যার জন্য আর নিরাপদ নয়। মাথায় রেখো, তাঁকে বাচাতেই হবে।"

লল্লটা মহর্ষিকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন, "আমাদের কি আর কখনও দেখা হবে পিতা?"

"সব রঙ্কিনীর ইচ্ছা। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।"

লল্লটা টের পেল মহর্ষির চোখে জল। এই প্রথমবার নিজের পিতার চোখের কোণে জল দেখল। পিতার চোখে জল দেখে তার নিজের ও চোখের জল বাঁধ মানল না। ধলভূমগড়ের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যাদের চরিত্রে কমনীয়তা মানা, তারা কেমন করে যেন বদলে গিয়ে আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মতো হয়ে উঠল মুহূর্তেই।

* * * * * * * *

— "ঠাকুর... এ... একটু তাড়াতাড়ি করুন..."

আরতিটা শেষ হওয়া মাত্রই, দ্বারের প্রান্ত হতে একটা ভয় মেশানো কণ্ঠ ভেসে এল। কৃষ্ণপাণি মুখুজ্জ্যে ঘাড় তুলে দেখলেন কমবয়সি সেবাইত

ছেলেটি ভয়ার্ত চোখে মন্দিরের বাইরে এদিক ওদিক উঁকি মারছে। বাইরে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সেই আলোয় চারদিক যেন রুপোলি হয়ে উঠেছে। এমন সময় কাছে পিঠে বনের মধ্যে একটা শেয়াল আচমকা ডেকে উঠতেই চমকে উঠলেন পুরোহিতমশাই। এই মুহূর্তে মন্দির প্রাঙ্গণে দু-জন মাত্র উপস্থিত। কৃষ্ণপাণি মুখুজ্জ্যে আর অভয় আদক নামের সেই কমবয়সি সেবাইতটি। বাকি সেবাইতরা মন্দিরে আসবে না বলে দিয়েছে। সেদিনের ঘটনায় প্রচণ্ড আতঙ্কে রয়েছে ওরা। মুখুজ্জ্যে মশাই নিজে যে ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত নয় তা কিন্তু নন। কিন্তু মন্দিরে পুজো, আরতি হবে না তাও কি হয়? এতদিন তিনি মায়ের সেবা করে এসেছেন, আজ পরিস্থিতি অন্যরকম বলে তিনি মায়ের পুজো, আরতি বন্ধ করে দেবেন? সেটা কি খুব উচিত হবে?

তবে এটাও সত্যি, সেদিনের ঘটনা চাউর হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা এত ভয় পেয়েছে যে দিনের বেলাও এই পথ বর্জন করেছে লোকে। এই অভয় আদকের আর কী দোষ? বাচ্চা একটা ছেলে। নেহাত বাধ্য তাই এসেছে। অভাবের সংসার। এই চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে, পরবে কী? তাই সে মুখুজ্জ্যেমশাইয়ের সঙ্গে এসেছে।

— "দাঁড়া বাবা, এই তো আরতি শেষ করলুম। দেবীকে শয়ান দেব না?"

— "কিন্তু মায়ের কাছে যাবেন কী করে? সেদিন থেকে তো একই ভাবে রক্ত পড়েই চলছে ফাটল থেকে। চারদিক তো রক্তে পিছল হয়ে আছে। আমি বলি কী... আরতি তো হয়েছে। কাল সকালে এসে নইলে..."

মুখুজ্জ্যেমশাই হেসে বলে উঠলেন, "দূর বোকা। এত ভয় পায় কেউ? এই নাকি তোর নাম অভয়?"

— "সেদিন যা দেখেছি, তারপর এখনো যা দেখছি... ভয় পাব না? কেউ কখনো শুনেছে, পাথরের মূর্তি থেকে কাঁচা রক্ত গড়াতে?"

— "ওরে... সব মায়ের লীলা। বুঝলি..."

— "না গো... ঠাকুর। এ মায়ের লীলা নয়। এ অন্য কিছু..." সেবাইতের গলায় ভয়।

— "অন্য কিছু আবার কী রে?"

— "লোকজন যখন মা'কে ডাইনি বলে ত্যাগ দিল, ভক্তরা যখন আসা বন্ধ করে দিল মন্দিরে। ভেবে দেখুন তখনও কিন্তু আমি এত ভয় পাইনি। কিন্তু এখন যেন মায়ের দিকে তাকালে সেই মা মা ভাবটা পাই না। বদলে বুকের ভেতরটা কেমন ছমছম করে। আর এই গন্ধটা..."

এই জিনিসটা মুখুজ্জ্যেমশাইও টের পেয়েছেন। মায়ের দিকে তাকালে বুকের ভিতরটা আপনা থেকেই যেন খালি হয়ে যায়। আর এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই পোড়া গন্ধটা। সেদিন থেকে একটানা হয়ে চলছে। যেন চামড়া পুড়ছে কাছাকাছি কোথাও।

— "আচ্ছা, নে। অনেক হয়েছে। এবার গোছা দিকিনি চটপট।"

— "এটা কাল এসে পরিষ্কার করলে হবে না?"

মুখুজ্জ্যেমশাই জিব বের করে বললেন, "এরকম কথা বলতে আছে? মায়ের ঘর অপরিষ্কার করে রাখে কেউ...? নে যা। চটপট গুছিয়ে ফেল। আমি দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছি।"

অভয় খানিকটা ভয় আর খানিকটা ব্যাজার মুখে আরতির জায়গাটা পরিষ্কার করতে লাগল। গুহার পাথুরে মেঝে পিছল হয়ে রয়েছে কাঁচা রক্তে। একমনেই জায়গাটা পরিষ্কার করছিল অভয়, ঠিক এমনসময় দরজার কাছে একটা ধপ করে কিছু ভারী জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হতেই যেই ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকাল, ওমনি একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেল শরীর দিয়ে। প্রদীপের আলোয় দেখা গেল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ভয়ংকর চেহারার কাপালিক। লাল বস্ত্র, পরিধানে। কালো চেহারা। খালি গা। গলায় বিবিধ হাড়ের মালা। কপালে তেল সিঁদুরের ঘন প্রলেপ। ডান হাতে একটা বিশাল বড় খাঁড়া ঝুলছে। আর বাম হাত দিয়ে বুকের কাছে আঁকাড় করে ধরা একটা দ্বিভুজা মূর্তি। মুখে কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ির ঘন আস্তরণ। চোখ দুটো রক্তজবার ন্যায় টকটকে লাল। বিস্ফারিত নয়নজোড়া তাকিয়ে আছে রঙ্কিনী দেবীর মূর্তির দিকে। সেই চোখে জগতের সমস্ত রাগ আর বিস্ময় যেন জড়ো হয়েছে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অভয়ের মনে হল সে মুহূর্তেই ভস্ম

হয়ে যাবে। এর আগে সে মন্দিরে নানান ধরনের সন্ন্যাসী, কাপালিকদের আসতে দেখেছে। কিন্তু এরকম ভয়ংকর কাপালিক এর আগে দেখেনি।

আর ঠিক তারপরেই জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল কাপালিকের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রায় পনেরো কুড়ি জন কাপালিকের দল। আর ওদের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে কৃষ্ণপানি মুখুজ্জ্যের অচৈতন্য দেহ।

"তোদের এত বড় সাহস..." বাঘের গর্জনের মতো গম্ভীর স্বরখানা ছড়িয়ে পড়ল গুহার ভেতরে, "অশুদ্ধ উপাচারে, মায়ের মন্দির নষ্ট করিস তোরা..."

কিছু বলতে গিয়ে অভয় টের পেল তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে যেন।

"এর... এর শাস্তি পাবি তোরা... অবশ্যই পাবি।" সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল মুখুজ্জ্যেমশাইয়ের অচৈতন্য দেহের দিকে।

— "এই সেই পূজারি না... যে এই পাপকাজে লিপ্ত?" কথাটা বলতে বলতেই কাপালিক নিজের ডান পা-খানা তুলে দিলো অচৈতন্য পুরোহিতের বুকের ওপরে। তারপর হাতের ভারী খাঁড়াখানা তুলে ধরল মাথার ওপরে...

— "কোনো অশুদ্ধ উপাচারকারীর বেঁচে থাকার অধিকার নাই।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে নীচের দিকে নেমে এল ভারী খাঁড়াটা। আরতির প্রদীপের আলোয় ঝলসে উঠল খাঁড়ার ধারালো দিকটা। আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ছলকে ছিটকে পড়ল কাপালিকের ভয়ংকর মুখে। আর একপাশে গড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণপাণি মুখুজ্জ্যের কাটা মুণ্ডটা।

গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে অভয় কিছু বুঝে উঠতেই পারল না তার কী করা উচিত। একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘোর ভাঙতেই সে দেখল, কাপালিক তার দিকে ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে রয়েছে। মুখে রক্ত ছলকে পড়ে আরো নৃশংস দেখতে লাগছে তাকে। অভয় বুঝল এক প্রচণ্ড বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এই কাপালিকের দল ভয়ংকর। ঈশ্বরের নাম নিয়ে চোখের পলকে মানুষ মারতে পারে।

ওকে পালাতে হবে, না হলে ওরও নিস্তার নেই।

দরজার একদিক কিছুটা ফাঁকা। সেদিক দিয়েই গলে পালিয়ে যাবে। রোগা

শরীর, খুব তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে নির্ঘাত।

কাপালিক চিৎকার করে উঠল, "তুইও শাস্তি পাবি। এই মন্দিরে আর কোনো অনাচারীর কোনো অধিকার নেই। এই মন্দির আমার মায়ের... আমরাই দেখব এই মন্দিরের মা'কে।"

আর দেরি করল না, সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে দৌড়ে গেল অভয়। আর ঠিক তখনই এমন একটা ভুল হল, যার জন্য সে মোটেই তৈরি ছিল না। রক্ত-পিছল মন্দিরের মেঝেতে পা হড়কে, সঙ্গে সঙ্গে চৌকাঠে ধাক্কা খেল।

আর তারপরেই হুমড়ি খেয়ে মন্দিরের সামনের চাতালে পড়ল। পাথরের মেঝেতে পড়ে সজোরে আঘাত পেল মাথায়। আর ওমনি চেতনা হারাল। চেতনা হারানোর আগের মুহূর্তে সে দেখল, সেই ভয়ংকর কাপালিক তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর একজন কাপালিক তার কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন কথা বলছে। ব্যাস, তারপরেই তার আর কিছু মনে নেই।

* * * * * * * *

একটা বিড়বিড় করা মন্ত্র পাঠের শব্দে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল ছেলেটা। মাথাটা ভার হয়ে আছে। খুব জোরে লেগেছে আঘাতটা। সে খুব ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। নড়তে পারছে না ছেলেটা। কোনোরকমে চোখ মিলে দেখল, মন্দিরের রক্ত পিছল মেঝেতে একপাশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সে।

রঙ্কিনী দেবীর সামনেই মেঝের ওপরেই পদ্মাসনে বসে মন্ত্রপাঠ করছে সেই কাপালিক। তারই বিড়বিড় শব্দ অভয়ের কানে এসে পৌঁছোচ্ছে। অভয় ঘাড় উঁচিয়ে দেখল, রঙ্কিনীর মূর্তির সামনেই সেই দ্বিভুজা দেবীমূর্তি রাখা।

অভয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে সব দেখছে, এরা কী করছে? রঙ্কিনীর মন্দিরে এরা কার পুজো করছে। ঠিক এমন সময়ই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল, যার জন্য অভয় বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কাপালিকের মন্ত্রের লয় একটু দ্রুত

হতেই, সাথে সাথে সেই দ্বিভুজা দেবীমূর্তিতে দপ করে আগুন ধরে গেল। দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে পুরো মূর্তিটা আচমকা বদলে গেল একটা অগ্নিপিণ্ডে। তারপর তা ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে মিশে গেল রঙ্কিনীর বিগ্রহে। আর মিশে যেতেই, সঙ্গে সঙ্গে ফাটল খানা মিলিয়ে গেল এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে। সেই সাথে বন্ধ হল রুধির ধারা।

কাপালিক সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চিৎকার করে উঠল, "তোর মনের সাধ এতদিনে মিটল মা। এতদিনে তুই নিজের দেহ পেলি..." তারপর আচমকাই লাফিয়ে বজ্রাসনে বসল কাপালিক। তারপর শূন্যে অবস্থিত অদৃশ্য কারোর কথা শুনছে, এমন ভাবে বলে উঠল, "হ্যাঁ মা, বল? শুনছি। বল? কী? খিদে পেয়েছে? খাবি তো... খাবি তো... এই তো তোর খাবার।" কথাটা বলেই কাপালিক আঙুল নির্দেশ করল অভয়ের দিকে।

সবটাই হাঁ করে শুনছিল সে। কিন্তু শেষের কথাটা শুনে শিউরে উঠল সে... এ কী বলছে কাপালিক? সে খাবার? মানে কী? তাহলে কি তাকেও বলি দেবে নাকি এরা?

কাপালিক দেরি না করে অভয়ের গলায় একটা জবার মালা পরিয়ে কপালে একটা রক্তচন্দনের তিলক কেটে দিল। তারপর অভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না সেই কাপালিক।

অভয় চিৎকার করতে ভুলে গেল প্রবল আতঙ্কে। এককোণে রাখা জাগ প্রদীপের আলো গুহার ভেতরে টিমটিম করে জ্বলছে। সেই আলোয় গুহার ভেতরে এক অদ্ভুত আলো আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অভয় কোনোমতে চেষ্টা করল পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উঠে বসার। অনেক চেষ্টার পরে সফলও হল। কিন্তু আচমকা সামনের দিকে তাকাতেই তার শরীরে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল আপনা থেকেই। এ কী দেখছে সে? সে দেখল রঙ্কিনী দেবীর পাথরের মূর্তির পেট ফুঁড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে দুটো কালো হাত, তারপর মাথা, বুক, পেট আর সব শেষে পা-জোড়া। পুরোপুরি বেরিয়ে আসার পর, সেই কালো মূর্তিটা নাক তুলে বাতাসে কার যেন একটা ঘ্রাণ

নিল। অভয় পাথরের মতো নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে আছে। কিন্তু এর নজর ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। অভয় দেখল কালো মূর্তিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তারই দিকে একটা অদ্ভুত চলনে। এই চলনকে অভয় হামাগুড়ি বলবে না সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটা বলবে সেটা বোঝার আগেই জাগ প্রদীপের আলো নিবে পুরো ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

*   *   *   *   *   *   *   *

ভগ্ন রাজপ্রাসাদের মেঝেতে সার দিয়ে শুয়ে রয়েছে সৈন্যর দল। এখানে আগে সভাঘর ছিল। কিছুদূরে মিস্ত্রী, মজুর, কুলি, কামিন আর বাকিরা। মাথার ওপর একখানা কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে হিম প্রতিরোধে। একধারে কোদাল, শাবল, গাঁইতি ছাড়াও ভারী ভারী পাথর সরানোর যন্ত্র নির্জীবের মতো ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে মশালের আলো রয়েছে। জায়গাটা টিলার ওপরে আর চারিদিক ফাঁকা হওয়ায় একপ্রকার ঝোড়ো বাতাসে প্রায় নিবে যাওয়ার অবস্থা। একপাশে একাধিক অস্থায়ী উনুন বানানো হয়েছিল রাতের খাবারের জন্য। সেই নিবে যাওয়া উনুনের থেকে... এখনও কুণ্ডলীর আকারে ধোঁয়া বেরিয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

সকলেই সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুম ধরছে না কেবল একজন সৈন্যর চোখে। লোকে বলে যেদিন আক্রমণ হয়েছিল প্রাসাদের ওপর সেদিন নাকি তারা প্রাসাদের ঠাকুর ঘর থেকে এক আলোকময়ী নারীকে বেরোতে দেখেছিল। সেই নারী ঠাকুরঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার যত আক্রমণকারী ছিল, সবাই চোখের নিমেষে ধুলো হয়ে হয়ে বাতাসে মিশে গিয়েছিল। কারো নাকি শরীরের একটা কাটা অঙ্গও পাওয়া যায়নি সৎকারের জন্য। সেই নারীই নাকি প্রাসাদের রক্ষা করে। প্রাসাদের ক্ষতি করলে সেই নারী নাকি ভয়ংকর কুপিতা হয়। এখন তারা তো সকলেই এখানে হাজির হয়েছে প্রাসাদের খোলনলচে বদলানোর জন্য। এখন এই গুজব যদি সত্যি হয় আর সেই নারী যদি সত্যি হয়ে থাকে

তাহলে তাদেরও তো বড় বিপদ...

এসবই ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখটা লেগে গিয়েছিল তার। আচমকা একটা খুঁট করে শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সৈন্যটির। চোখ মেলেই অবাক। কোত্থেকে একখানা সাদা কুয়াশা এসে ঘিরে ধরেছে জায়গাটা। সৈন্যটি বিছানায় উঠে বসল। এমন সময় খুব কাছেই শোনা গেল একটা অন্যরকম শব্দ। ঠিক যেন মাটির ওপর দিয়ে কোনো ভারী বস্তু টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। সময় নিয়ে নিয়ে।

সৈন্যটি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শব্দটা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। গাঢ় কুয়াশায় ভালো করে চোখ চলে না, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আওয়াজটা। এখানে অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে, রান্নার রসদ রয়েছে। চোর-টোর সেসব নিয়ে পালাচ্ছে না তো?

বিছানার পাশ থেকে তলোয়ারটা তুলে সে শব্দের উৎস লক্ষ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে সেইদিকে। চারদিকে কুয়াশার ঘন আস্তরণ। দু'হাত দূরের জিনিসও ভালো করে দেখা যায় না এই কুয়াশায়। কিন্তু তবুও সৈন্যটি থামছে না। সত্যি কোনো জিনিস খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ তাদের মাসোহারা থেকেই কাটা যাবে।

দেখতেই দেখতে সৈন্যটি সভাঘর ছেড়ে ক্রমশ মহলের দক্ষিণের দিকে এসে হাজির হল। এইদিকে কুয়াশা খানিকটা পাতলা বলে মনে হচ্ছে। শব্দটাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। চাঁদের উজ্জ্বল আলো দক্ষিণের অলিন্দে পড়ছে ভাঙা ছাদের ফাঁক-ফোকর থেকে। ওই তো... ওই তো, কী একটা নড়ছে না সামনেই...? এবার... এবার আর নিস্তার নেই চোরের।

"দাঁড়াও... দাঁড়াও বলছি। আর এক পা এগোলে..." সৈন্যটি চিৎকার করে উঠতেই দাঁড়িয়ে পড়ল অবয়বটা...। আর ঠিক তখনই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈন্য। জিনিসটা তার থেকে বড়জোড় হাত পনেরো দূরে, কিন্তু এই আধা অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সামনের একটা কালোরঙের নারীমূর্তি... একহাতে একটা মুণ্ডুহীন ধড়ের পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যহাতে একটা চকচকে খড়্গের সঙ্গে ধরা

রয়েছে একখানা কাটা মুণ্ডু। সারা শরীর শিউরে উঠল অজান্তেই। এ কে?

ঠিক তখনই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো তার মাথায় ধাক্কা মারল সেই গুজবের কথাটা। তাহলে কী গুজবটা সত্যি?

মূর্তিটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার দিকে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সামনের দিকে চুল এসে মুখ ঢেকে দিয়েছে রহস্যময়ীর। সৈনিকের ঘাড়ের একটা একটা করে লোম আতঙ্কে খাঁড়া হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। পালাতে হবে...

পালাতে হবে এই টিলা ছেড়ে। কিন্তু আচমকা যেই তার চোখ পড়ল কাটামুণ্ডুর দিকে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত বোধবুদ্ধি, চেতনা লোপ পেয়ে গেল। সে দেখল নারী মূর্তিটির হাতে যে কাটা মুণ্ডুখানা সেটা আর অন্য কারো না। তারই। তার মানে... তার মানে...

ঠিক তখনই কুয়াশা পুরোপুরি সরে গেল। আর কুয়াশা আস্তরণ সরে যেতেই দেখা গেল অলিন্দের শেষ প্রান্তে একটা উঁচু স্তুপ। সেই স্তুপ পাথরের নয়... সেই স্তুপ ছিল মুণ্ডহীন ধড়ের।

(কঙ্কালীর প্রহরীরা)

— "আমি আর এগোবো না বাবাঠাকুর।", সুবিশাল প্রান্তরের মুখে দাঁড়িয়েই কিশোরটি খানিকটা ভয় পাওয়া গলায় কথাটা বলে উঠতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহর্ষি।

এইমুহূর্তে তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটাকে এক সুবিশাল রুক্ষ মাঠের সম্মুখ বলা চলে। লাল কাঁকুরে মাটির ওপর নামমাত্র ঘাস জন্মেছে। দু-একটা বড় গাছ রয়েছে মাঠে তবে তা সংখ্যায় নিতান্তই কম। ওদের পিছনদিকেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ঘন শালবন। এই শালবন পেরিয়েই তাদের আসতে হয়েছে। সূর্য খুব দ্রুত লয়ে পশ্চিমে অস্তগামী। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো জায়গাটা জুড়ে অন্ধকার নেমে আসবে। লাল কাঁকুরে মাটি চাষাবাদের জন্য অনুর্বর হওয়ায় এই এলাকায় জনবসতি বড়ই কম। যে কয়টি

বাড়ি ঘর রয়েছে তাদের মূলজীবিকা শালবনের মধু আহরণ, আর শালপাতার থালা, বাটি তৈরি করা। দু-একটা স্বচ্ছল জনপদ জনপদ মহর্ষির যে চোখে পড়েনি, তা নয়। কিন্তু তা সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই ছেলেটিকে মহর্ষি জোগাড় করেছেন পথের হদিস বাতলে দেওয়ার জন্য। ছেলেটি তো প্রথমে রাজিই হচ্ছিল না এদিকে আসতে। বরং আগাগোড়া কালোকাপড়ের আড়ালে থাকা মহর্ষির দিকে কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ চোখেই তাকিয়েছিল। কিন্তু পরে স্বর্ণ মোহরের লোভ দেখাতে রাজি হয়ে যায়। পথে মহর্ষির অনেক কথা হয় ছেলেটির সঙ্গে। ধীরে ধীরে ছেলেটির আড়ষ্টতা ভাঙে। কিন্তু মহর্ষি খেয়াল করেছেন মন্দিরের কথা উঠলেই কেমন যেন একটু কুঁকড়ে ওঠে ছেলেটি। ভাবখানা এমন যেন এই ব্যাপারে না কথা বলতে পারলেই সে খুশি হয়।

— "এখান থেকেই ফিরবে...?"

— "হ্যাঁ, বাবা ঠাকুর। এই হল ডাইনিটিকরির মাঠ। এই মাঠের শেষ প্রান্তে একটা গম্ভুজ আকৃতির ছাদভাঙা একটা মন্দির দেখতে পাওয়া যাবে। ওটাই ডাইনিটিকরির মন্দির। সূর্য অস্ত গেলে এই মাঠের ধারে কাছে থাকা মানা।"

— "মন্দিরের কাছাকাছি কোনো পুকুর আছে?"

— "মন্দিরের পিছনেই কাঁসাই নদী রয়েছে। এখন জল খুব বেশি নেই। বড়জোর কোমর অবধি। এবার আমি আসি?"

মহর্ষি কোঁচড়ের খুঁট থেকে একখানা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ছেলেটির হাতে দিলেন। ছেলেটি সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

— "তোমার ফিরতে অসুবিধে হবে না তো?"

ছেলেটি মাথা নাড়াল। সে যেতে পারবে একলা। তারপর কী একটা মনে হতেই বলল, "অন্ধকার নামবে এক্ষুনি। আলো জ্বালানোর মতো কিছু আছে সঙ্গে?"

মহর্ষি বললেন, "নাহ, তবে সে নিয়ে ভেবো না। আমি জোগাড় করে নেব।"

ছেলেটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খানিকটা বিগলিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা পড়ে-থাকা ডাল কুড়িয়ে, তার মাথার একটা গাছের থকথকে আঠা গোছের

কিছু ভালো করে লাগিয়ে দিল। তারপর সেটা মহর্ষির দিকে বাড়িয়ে বলল,
— "এই আঠায় আগুন ধরালে অনেকক্ষণ আলো পাবেন।"

মহর্ষি কিছু না বলে হাত বাড়িয়ে লাঠিটা নিলেন। তারপর ছেলেটির থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত মাঠের পথ ধরলেন। মর্ত্যগন্ধর্বদের কথা একেবারেই ঠিক। পুরো ব্যাপারটা সম্পাদন করতে তাঁর অনেকটা সময় লাগবে। অনেকটা। তা-ই অযথা সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

* * * * * * * *

এই কয়েকদিনেই পুরো ধলভূমগড় যেন বদলে গিয়েছে অজানা পরিবেশে।

যে জায়গা মহারাজা জগন্নাথদেবের সুযোগ্য শাসন, মহর্ষি শম্ভুপাদের নেতৃত্বে, আর রঙ্কিনী দেবীর আশীর্বাদে ধন্য ছিল। যেই জায়গায় যেন আজ শ্মশানের নীরবতা। নরকের ত্রাস।

প্রথমে সাত জন মহিলার মৃত্যু , তারপর লোকেদের রঙ্কিনীর প্রতি অবিশ্বাস, বিকশবাহু দ্বারা বশীভূত , তারপর দল বেঁধে প্রাসাদ আক্রমণ, এক ভয়ংকর যুদ্ধ, মহারানির মৃত্যু, অন্য রাজ্যের এ রাজ্য দখল, দেবী রঙ্কিনীর বিগ্রহের ক্ষতি, রঙ্কিনী মন্দিরের পুরোহিতের হত্যা, একদল নররক্ত পিপাসী কাপালিকের রঙ্কিনী মন্দিরের অধিকার, আর সেদিন রাজপ্রাসাদে যে সৈন্যরা আশ্রয় নিয়ে ছিল তাদের মুণ্ডুচ্ছেদ করে ভয়ংকর গণহত্যা।

উদ্বেগের কারণ হিসেবে এসব তো কম ছিল না রাজ্যবাসীর জন্য... এরই মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আরেক বিপদ। সন্ধে হলেই রোজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নানান গ্রাম থেকে একজন করে লোক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ, মহিলা, শিশু কেউ বাদ যাচ্ছে না। রোজ একজন করে নিখোঁজ হবেই। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সন্ধ্যা নামলেই প্রত্যেকের মনে একটাই ভয়, আজ কার পালা?

আজকাল সূর্য অস্ত গেলে কেউ আর বাড়ির বাইরে বেরোতে সাহস পায় না। সকলের মনে চাপা আতঙ্ক। এই বুঝি, তাদের মধ্যে কেউ একজন

নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এই বুঝি কেউ হারিয়ে গেল চিরতরে। গ্রামে গ্রামে এখন শুধু একটাই কথা। দেবী রঙ্কিনী নাকি এবার সত্যি সত্যি রক্তখাকি হয়ে উঠেছেন। আর তাঁর রক্তক্ষুধা নিবারণের ভার পড়েছে ওরই মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া সেই ভয়ংকর কাপালিকদের দায়ীত্বে। সূর্য অস্ত গেলেই তারা দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর যাকেই নাগালে পায় তাকেই তুলে নিয়ে যায়। এসব ঘটনার যে সবটাই মিথ্যে তা কিন্তু নয়। অন্ধকারে লোকজন লালবস্ত্র পরিহিত অবয়ব প্রায়ই দেখে জানালার বাইরে। আচমকাই যেন সেই কল্লকেশীর আমলের আতঙ্ক ফিরে এসেছে। পার্থক্য শুধু একটাই লোকে আগে কালোরাক্ষসকে ভয় পেত। আজকাল লোকে রঙ্কিনীকে ভয় পায়। এছাড়াও অনেকেই বলে তারা নাকি রাত হলেই ঘরের বাইরে অদৃশ্য কার পায়ের শব্দ আর চাপা হুঙ্কার এর আওয়াজ শুনতে পায়। এসব শুনে লোকজন আরও ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। সবেমাত্র কিছুক্ষণ আগে সন্ধের অন্ধকারটা নেমেছে। আচমকা পলাশতলি গ্রামের রতন পাড়ুইয়ের বাড়ি থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল। রতন পাড়ুই সেই সব অবিশ্বাসীদের দলে ছিল যারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেছিল। সেই রাতের পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রতনের বউ লক্ষ্মী দু'দিন হল একটি ছেলে সন্তান প্রসব করেছে। কম বয়স, তায় রুগ্ন শরীর। খাটের একপাশে ছেলেকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল লক্ষ্মী। ঘরের এককোণে রান্না চাপিয়েছিল, রতনের বিধবা মা। এমন সময় আচমকা জানালার কাছ থেকে একটা খচখচ শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাতেই আঁতকে উঠল প্রৌঢ়া। গরাদবিহীন জানালা গলে একখানা সিঁদুর মাখা ভয়ংকর শরীর লক্ষ্মীর পাশ থেকে অত্যন্ত সাবধানে তুলে নিচ্ছে তার ঘুমন্ত নবজাতক ছেলেটাকে। প্রৌঢ়া সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু কোথায় কী? মুহূর্তের মধ্যে যেন সেই ভয়ংকর লোকটা শিশুকে নিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

*   *   *   *   *   *   *   *

রঙ্কিনী মন্দিরে, বিগ্রহের সম্মুখে পুজায় বসেছে কাপালিক।

তার চোখ বন্ধ। ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে বিড়বিড় ধ্বনিতে মন্ত্রপাঠ। সামনের যজ্ঞবেদীতে চড় চড় করে কাঠ পুড়ছে। সেই আগুণের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ছে গুহার মধ্যে। দরজার বাইরে বজ্রাসনে বসে বাকি কাপালিকেরা।

ঠিক এমন সময় ওদের মধ্যে একজন কাপালিক, এক সদ্যোজাত শিশুর দেহ, সামনের কলাপাতার উপরে রাখতেই চোখ মেলে তাকাল প্রধান কাপালিক।

— "এ কী বলি এনেছিস মায়ের জন্য?" প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। "এইটুকু খাবারে মায়ের ক্ষুধা মিটবে?"

অপর কাপালিক ভয় পেয়ে বলে উঠল, "আজ আর অন্যকিছু পাইনি, গুরুদেব। আজকাল লোকজন সতর্ক হয়ে গেছে। কেউ সন্ধ্যা হলে ঘর থেকে বেরোয় না।"

— "ঘর থেকে না বেরলে, ঘরে ঢুকে টেনে আনবি।" তারপর কী একটা ভেবে বলে উঠল সেই কাপালিক, "এক কাজ কর, ভোগের সামগ্রী রাখার ঘরটা খুলে পরিষ্কার করে রাখ। এরপর এক একটা পরিবারকে উঠিয়ে নিয়ে আয় গ্রামগুলো থেকে। সকলের বলি হয়ে গেলে আবার আরেকটা পরিবার। এতে করে রোজ তোদের গ্রামে যেতে হবে না। তোদের খাটুনি কম হবে।"

— "যথা আজ্ঞা গুরুদেব," অন্য কাপালিক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। গুরুদেবের যা চণ্ডরাগ। এক্ষুনি না তাকেই বলি দিয়ে দেয়। "কাল থেকে তাই করব আমরা..."

— "সে তো কাল থেকে করবি... কিন্তু আজকে মায়ের ভোগ কী হবে? মা আজ খাবে কী?" কাপালিকের চিন্তান্বিত স্বর ছড়িয়ে পড়ল গুহার মধ্যে।

ঠিক এমন সময় গুহার ভেতরে সাপের শিসের মত একখানা হিশহিশে স্বর ছড়িয়ে পড়তেই প্রধান কাপালিক শূন্যে মুখ তুলে বলে উঠল,

— "বল মা?... আমি শুনছি মা... হ্যাঁ মা... খিদে পেয়েছে? কিন্তু কী খাবি মা? ওরা যে আনতে পারেনি..."

তারপর বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা।

আচমকা প্রধান কাপালিকের উদ্বিগ্ন মুখ বদলে গেল এক অদ্ভুত প্রসন্নতায়।

— "তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মা..." দেবী মূর্তিকে নতজানু হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল প্রধান কাপালিক। তারপর অপর কাপালিককে গুহার কোণে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, "যা, ওই কোণ থেকে আমার খাঁড়াটা নিয়ে আয়। আমি বাচ্চাটাকে বলি দেবো।"

অপর কাপালিক দেরী না করে ঘরের নির্দিষ্ট কোণে এগিয়ে গেল। কিন্তু অবাক হল যখন দেখল সেখানে কোনো খড়গ নেই। "এ কী? এখানেই তো..."

এমন সময় দড়াম করে একটা শব্দ হতেই চমকে পিছন ঘুরল সেই কাপালিক। মন্দিরের খোলা দরজাটা আচমকাই বন্ধ হয়ে গেল। গুরুদেব তাকে, গৃহগর্ভে আটকে, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। শিউরে উঠল সে... ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজা ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করে উঠল সে, "গুরুদেব, দরজা খুলুন। দরজা খুলুন। আমায় আটকে রাখছেন কেন? কী দোষ আমার..."

কিন্তু ভারী কাঠের তৈরি দরজা সেই ধাক্কায় নড়লও না।

— "তোর দোষ হল, তুই মায়ের জন্য খাবার আনতে পারিসনি। আমার মা আজ খাবে কী?" দরজার ফাঁকে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল প্রধান কাপালিক। "তাই মা নিজেই নিজের খাবার হিসেবে তোকে বেছে নিয়েছে। যা যা দেরি করিস না। মায়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর... হাঃ হাঃ হাঃ"

এমন সময় একটা হিসহিসে শব্দ আবার শোনা গেল পেছনের মূর্তিটার থেকে। চমকে উঠে কাপালিক পিছন ঘুরে দেখল, একখানা কালো নারীর শরীর একহাতে খাঁড়া নিয়ে রঙ্কিনীর মূর্তির পিছন থেকে টলোমলো পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে সামনে এলোমেলো চুল তাই মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে, সাপের শিসের শব্দটা ওর মুখ থেকেই আসছে। কয়েকমুহূর্ত মাত্র আর তারপরেই একটা ভয়ংকর আর্তনাদ।

অন্যসকল কাপালিক যারা মন্দিরের বাইরে উপস্থিত ছিল, তারা এই

বীভৎসতায় আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ পর ভেতরের চিৎকার থেমে যেতেই প্রধান কাপালিক বাকীদের উদ্দেশে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল,

— "একটা কথা জেনে রাখ সকলে। আমার মায়ের খাওয়ারের কমতি যেন কোনোভাবেই না হয়, বুঝলি। আমার মায়ের এখন শুধু রক্ত চাই। রক্ত। এ তোদের গুরু বিসম্ভর কাপালিকের আদেশ।"

* * * * * * * *

ভেজা পোশাকের থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা মহর্ষির পায়ের পাতার ওপর পড়ছে। ডাইনিটিকরির মাঠটি যে কম বড় নয় সেটা পেরোতে গিয়েই বুঝতে পারলেন মহর্ষি। মাঠের আয়তনের সবেমাত্র অর্ধেকটা পেরিয়েছেন ঠিক তখনই সন্ধ্যা নেমে এল। মাথার ওপর চাঁদ ক্রমাগত আয়তন ক্ষয় করে কায়াহীনতার দিকে এগোচ্ছে। চাঁদের আলো একেবারেই নেই বললেই চলে। মহর্ষি আর দেরী না করে কাঁধের পুঁটুলি হাতড়ে দুটো চকমকি পাথর বের করে আনলেন।

বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় লাঠির আঠাটা জ্বালাতে পারলেন। ভাগ্যিস ছেলেটি এই মশালটি তৈরি করে দিয়েছিল।মহর্ষি আর দেরী করলেন না। এক হাতে মশালের আলো নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। ছেলেটির কথা মত মহর্ষি মাঠের শেষ প্রান্তে এসে দেখলেন একটা ঢালু জমির ওপরে একটা ভগ্ন গম্বুজাকৃতি মন্দির দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ পথ, এত দ্রুত হেঁটে আসায় মহর্ষি হাঁপাতে লাগলেন। একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সে সময় কই?

আশপাশে এই নির্জনে কেউ নেই দেখে শম্ভুপাদ গায়ের চাদর আর কাঁধের পুঁটুলিটা মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামিয়ে, মশাল-হাতে মন্দিরের পিছনদিকে এগিয়ে এলেন। ছেলেটির কথা আবার সত্য হল। সামনেই কংসাবতী নদীর তীর। মশাল-হাতে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেল একখানা জীর্ণ সিঁড়ি যা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। মহর্ষি সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন।

সত্যিই নদীতে খুব বেশি একটা জল নেই। বড় জোর কোমর পর্যন্ত। মহর্ষি মশালখানা ঘাটের একপাশে নরম মাটিতে গেঁথে নদীতে গিয়ে তিনখানা ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে উঠে এলেন। নদীর জল এমনিই ঠান্ডা, তার ওপর হেমন্ত শুরুর মুখে ফাঁকা প্রান্তরের হাওয়া। ভেতর পর্যন্ত কাঁপুনি দিতে লাগল তাঁর। তিনি দ্রুত পায়ে মন্দিরের সামনে এসে পুঁটুলিটা তুলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মন্দিরটি বড়জোর হাত পনেরো বর্গক্ষেত্রের। পাথরের চাঁই দিয়ে গড়া গম্বুজাকৃতি মন্দিরটির জায়গায় জায়গায় দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন এতে সংস্কারের ছোঁয়া পড়েনি। পড়বেই বা কী করে? লোকে যে কতটা ভয় পায় জায়গাটাকে তার নমুনাতো একটু আগেই নিজের চোখে দেখেছেন। পাথরের চৌকাঠে কাঠের পাল্লার কোনো চিহ্ন নেই আর। মহর্ষি মন্দিরের ভেতরে সাবধানে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক চামচিকে কিচিরমিচির করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এইসব পোড়ো মন্দিরের ভেতরে বিষধর সাপ-খোপ ছাড়াও নানারকম বিষাক্ত পোকা থাকতে পারে। সাবধানে পা ফেলতে হবে।

মশালের আলোয় মন্দিরের ভেতরখানা দৃশ্যমান। মাথার ওপর সত্যি ভাঙা ছাদ। তার ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। চারদিকে মাকড়শার ঝুল। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর ভাস্কর্য কিন্তু সেই সব জিনিসে বৃষ্টির জল পড়ে শ্যাওলা গজিয়েছে। মহর্ষি মশালের আলোটা বাড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগলেন। বিগ্রহহীন এই মন্দির বড়ই সাধারণ গোছের। এই রঙ্কিনীর পরিত্যক্ত শক্তিপীঠ?

খানিকটা ধন্দে পড়লেন মহর্ষি। কিন্তু বেশিক্ষণ সেই ধন্দ স্থায়ী হল না, আচমকা শম্ভুপাদের ষষ্ঠইন্দ্রিয় যেন তাকে জানান দিল, ঠিক তার পেছনে, মন্দিরের অন্ধকার কোণে কেউ বুঝি দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরলেন। কিন্তু না, সেখানে কিছুই ছিল না... আর তখনই তার মনে পড়ল, মর্ত্যগন্ধর্বের দ্বিতীয় সতর্কবার্তা, "রঙ্কিনী নিজের অধিষ্ঠান স্থান এমনি এমনি শূন্য ছেড়ে আসবে না। নিশ্চয়ই সেখানে এমন কিছু থাকবে

যা এতদিন ধরে সেই পীঠ পাহারা দিচ্ছে। সে তোমায় বাধা দেবেই। তাই জাদুগোড়া আর ঘাটশিলা বাদে বাকী ছয়টি পিঠে সাবধানে থেকো...”

মহর্ষি দেরি না করে কাঁধের পুঁটুলি থেকে টেনে বের করে আনলেন দেবীর স্বর্ণ খড়গ। নাহ, সাবধানের মার নেই। তিনি নিশ্চিত এখানে কেউ একটা ছিল। এতটা ভুল তার হওয়ার কথা নয়। আর ঠিক তখনই তার নজর পড়ল, পুটুলির ভেতর রাখা চন্দন কাঠের বাক্স থেকে এক অদ্ভুত নীল আভা বিকীর্ন হচ্ছে।

তড়িঘড়ি দেওয়ালের খাঁজে মশালখানা গুঁজে পুঁটুলিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন মহর্ষি। তারপর ধীরে ধীরে পুঁটুলির কাপড় চোপড়ের আড়াল থেকে বাক্সটা বের করে আনলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নীল আলোর তেজটা বাড়ছে ক্রমশ। মহর্ষি চন্দন কাঠের বাক্সটা খুলতেই দেখলেন, সেখানে আটটা লালশালুর মোড়কে ছোট ছোট আটটা বস্তু। এই এক একটা মোড়কের ভেতরে একটা করে জিহ্বা খণ্ড আর একটা করে নাভিকুণ্ডলী রাখা আছে। তবে এই আটটা টুকরোর মধ্যে কেবলমাত্র একটি মাত্র টুকরো হতেই অদ্ভুত এক নীল আভা বেরিয়ে আসছে। মহর্ষি সেই মোড়কটি বের করে বাকী খণ্ডগুলো চন্দন কাঠের বাক্স সমেত পুটুলিতে চালান করে দিলেন। তারপর কাঁধে পুঁটুলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওদিকে মশালের আলো প্রায় নিবে যাওয়ার অবস্থায়।

মহর্ষি অবাক, এই খণ্ড এমন নীল আলো বিকিরণ করছে কেন? একটু আগেও তো তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা দেখেননি। তাহলে কি এই খণ্ডটার সঙ্গে এই রঙ্কিনী পিঠের কোনো সম্পর্ক আছে? বেশি ভাবতে হল না তাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মোড়কের ভেতর থেকে নীল আভাটা পুরো মন্দিরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। আর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাথরে পাথর ঘষা লাগার শব্দটা আচমকাই যেন বেড়ে গেল মন্দিরের ভেতরে।

তিনি টের পাচ্ছেন কিছু একটা হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে খড়গর হাতলখানা শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি। আচমকা তিনি দেখলেন মন্দিরের চারটি দেওয়াল ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল। দেওয়ালগুলো যত পিছোতে লাগল তত বড় হতে লাগল মন্দিরের পরিধি। একটা সময় দেওয়ালগুলো

পিছোতে পিছোতে নীল আলোর পরিধির বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল যেন। আর মহর্ষি নিজেকে আবিষ্কার করলেন একটা অন্ধকার অন্তহীন শূন্যকক্ষে।

এবার? এবার কী করবেন তিনি? কোনদিকে যাবেন? বামহাতে এখনও উঁচিয়ে রেখেছেন সেই মোড়ক। এখনো সেখান থেকে আলোক বিকরণ হচ্ছে?

আচ্ছা যা ঘটছে সব সত্যি তো? নাকি এসব তারই মনের ভুল? আর ভাবতে পারলেন না মহর্ষি। তিনি এক হাতে রঙ্কিনীর খড়গ চেপে আর অন্যহাতে সেই আলোকখণ্ড উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,

"জয় মা রঙ্কিনী!"

তারপর হাতের খড়গটা দিয়ে আলোকিত জিহ্বা খণ্ডটি স্পর্শ করতেই একটা প্রচণ্ড নীল আলোর বিস্ফোরণ হল আর সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষী আবিষ্কার করলেন তিনি ডাইনিটিকরির অন্ধকার মন্দিরগর্ভেই দাঁড়িয়ে আছেন। ওহ! তাহলে এগুলো সত্যি ছিল না? তাঁর ভ্রম ছিল।

মহর্ষি আর দেরি করলেন না। খাঁড়াখানা পাশে রেখে মেঝের ধুলোর পুরু আস্তরণ একহাত দিয়ে সরাতে লাগলেন। এই খণ্ডকে যত দ্রুত সম্ভব গৃহগর্ভের মেঝেতে পুঁতে দিতে হবে।

কিন্তু মন্দিরের গৃহগর্ভ শক্ত পাথরের। এ পাথর সরাবেন কী করে? সঙ্গে সঙ্গে তার নজর গেল হাতে ধরা খাঁড়াটির দিকে। তিনি বুঝলেন তাঁকে কী করতে হবে। তিনি খড়গখানা দিয়ে একটা কোপ মারলেন পাথরের মেঝেতে। নড়ে উঠল পুরো মন্দির। শম্ভুপাদ বুঝলেন তিনি মন্দিরের ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। তিনি খড়গখানা আবার মাথার ওপরে তুললেন। কিন্তু মাটিতে আরেকটা কোপ মারার সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে মন্দিরের আরেক কোণে ছুড়ে ফেলল। হাত থেকে ছিটকে পড়ল জিহ্বার খণ্ডখানা। আর তারপরেই কে যেন একটা খিলখিলে হাসিতে ভরিয়ে তুলল চারদিক।

সঙ্গে সঙ্গে খড়গখানা চেপে উঠে দাঁড়ালেন শম্ভুপাদ। জিহ্বা খণ্ডটা মেঝেতে

পড়ে এখনও আলো বিকরণ করছে। মহর্ষি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন সেটিকে তুলে নিতে কিন্তু আচমকা মনে হল, কে যেন পা জোড়া টেনে রেখেছে। চমকে উঠে, দেখলেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছে দু-খানা রাক্ষুসে হাত। সেটাই চেপে ধরেছে তার পা জোড়া। এক মুহূর্ত দেরি না করে, হাতের খড়গখানা চালিয়ে দিলেন মহর্ষি। সাথে সাথে হাত দুটো কেটে ছিটকে পড়ল একদিকে।

আর তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়তেই কেঁপে উঠলেন তিনি। মেঝের ফুঁড়ে জেগে উঠল অনেকগুলো দেহ। দেহ না বলে হাড়ের খাঁচা বলা ভালো। কোনোরকমে মাংস লেগে রয়েছে সেই হাড়ের খাঁচাতে। ন্যাড়া মাথায় নাক কান মুখ কিছুই নেই... রয়েছে শুধু একজোড়া সাদা চোখ।

মহর্ষি দেরি না করে... ছুটে গিয়ে সেই জিহ্বা খণ্ডটা তুলে নিলেন। তারপর তৃতীয় কোপটা মারলেন একই জায়গায়। আবার নড়ে উঠল পুরো মন্দির। কিন্তু ওদিকে ততক্ষণে সেই ভয়ংকর প্রাণীরা মহর্ষির প্রায় একেবারে কাছে চলে এসেছে। মহর্ষি একমুহূর্ত দেরি না করে তৃতীয় কোপটা মারার সঙ্গে সঙ্গেই... মেঝের পাথর আপনা থেকেই সরে গিয়ে একটা ছোট গহ্বর উৎপন্ন হল সেখানে।

আচমকা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন শম্ভুপাদ। সেই ভয়ংকর প্রাণীদের একজন শম্ভুপাদের কাঁধ চেপে ধরেছে। আর ধরার সঙ্গে সঙ্গেই জায়গাটা আগুনে পোড়ার মতো জ্বালা করে উঠল। তারপরে দেখতেই দেখতে বাকিরাও মহর্ষিকে চেপে ধরতেই মহর্ষির মনে হল তার সারা শরীরে কেউ যেন লোহা গরম করে চেপে ধরেছে। একটা প্রবল আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল, ডাইনিটিকরির গৃহগর্ভে।

মহর্ষির মনে হতে লাগল তিনি বুঝি যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাবেন। দু-চোখে তার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কিন্তু তিনি মহর্ষি শম্ভুপাদ। মা রঙ্কিনীর সৎ সেবক, তিনি হারতে পারেন না কিছুতেই।

সেই মুহূর্তে যখন মহর্ষির মনে হতে লাগল এই যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। ঠিক তখনই কন্যাসম মহারাণী কঙ্কাবতীর মুখটা ভেসে

উঠল তার সামনে। সাথে সাথে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে তিনি হাতে ধরে রাখা মোড়কটা মেঝের গর্তের দিকে তাক করে ছুঁড়ে দিলেন। মুহূর্তেই জিনিসটা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর বিস্ফোরণ ঘটল যেন জায়গাটা জুড়ে। আর সেই সঙ্গে গৃহগর্ভের ভিতরে একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল যেন। ঘূর্ণিঝড়ে মহর্ষি ছিটকে পড়লেন মন্দিরের একপাশে। চোখের সামনে যেন অচমকাই অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও তাঁর চোখের সামনে সরে যেতে লাগল একটার পর একটা দৃশ্য। দৃশ্যগুলো একটা পথ নির্দেশ করছে। দেখতেই দেখতে দৃশ্যপট গুলো সরতে সরতে তা স্থির হল, একটা ভৈরবের মূর্তির সম্মুখে। এটা ওড়গোন্দায় অবস্থিত রঙ্কিনী মন্দিরের ভৈরব মূর্তি। মহর্ষি শম্ভুপাদ, পরবর্তী খণ্ড কোন্ পীঠে নিয়ে যাবেন তার নির্দেশিকা পেয়ে গেলেন দৈবিকভাবেই। কিন্তু তারপর তাঁর আর কিছু মনে রইল না। কারণ ততক্ষণে তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন।

(দীর্ঘায়ু ভবঃ)

একে শনিবার। তার ওপর অমাবস্যা। এমন মহেন্দ্রক্ষণগুলোতে মন্দিরে সারাদিনই উপচে পড়া ভিড় থাকে। পুরোহিত, জোগাড়ি, সেবাইতদের কালঘাম ছুটে যায় ভক্তদের পুজো সামাল দিতে দিতে। মন্দির এর দেখাশোনার দায়িত্ব এখন জামশেদপুরের একটি ট্রাস্টের হাতে। প্রণামির টাকায় ট্রাস্টের ভালোই অর্থ উপার্জন হয়। এখন যেহেতু রাস্তাঘাট আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, তাই বহুদূর দূর থেকে ভক্তরা গাড়ি নিয়ে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে আসে। জামশেদপুর, আদিত্যপুর, ঝাড়গ্রাম এমনকি খড়গপুর থেকেও। কলকাতা থেকেও ভক্তরা আসে, তবে তা সংখ্যায় বেশ কম।

একটু আগেই মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়েছে। এখন সময় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ভরা শীতকাল। তাই সন্ধ্যা আরতি দেখতে ভক্তদের ভিড় এই

সময় কমই হয়। মন্দিরের দু-জন পুরোহিত আরতি সেরেই বাড়ি চলে যায়। সেবাইতরা জিনিসপত্র গুছিয়ে পরে রওনা হয়।

মন্দিরের সেবাইত পুরন্দর পাণ্ডে সবে মাত্র মন্দিরের দরজায় তালা লাগিয়েছেন, ঠিক এমন সময় পেছন ভটভট করে একটা মোটরসাইকেল এসে দাঁড়াল মন্দিরের ঠিক সামনে। রঙ্কিনী মন্দিরের গা ঘেঁষেই একটা চওড়া চওড়া উত্তর হতে দক্ষিণে চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে। বাইকে উপবিষ্ট একটা লম্বা চওড়া যুবক। পরনে পুলওভার, হাতে গ্লাভস, গলায় মাফলার। বাইকে বসা যুবকটা চেঁচিয়ে উঠল, "আপকা, হো গয়া পাণ্ডেজী?"

— "তনিক ঠয়রিয়ে..." কথা বলতে বলতেই মন্দিরের চৌকাঠে মাথা ঠেকালেন পুরন্দরবাবু। "মাতা কো পরণাম তো কর লেনে দিজিয়ে..."

— "সারাদিন পরণাম কম করতে হ্যা কা?" কথাটা বলেই হেসে উঠল বাইকে বসা যুবকটি। এই ছেলেটির নাম বিকাশরাও ত্রিপাঠি। পুরন্দর পাণ্ডে আর বিকাশরাও দু-জনেই রঙ্কিনী মন্দিরের সেবাইত। দু-জনেরই বাড়ি রাকামাইনস এর ওদিকে হওয়ায় পুরন্দরবাবু বিকাশের গাড়িতেই যাতায়াত করেন। মন্দিরের বাইরে একটা উজ্জ্বল নিয়নআলো জ্বলছে। তারই হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের সামনের পিচের রাস্তার ওপরে।

বিকাশ গাড়ি স্টার্ট দিতেই পুরন্দরবাবু উঠে বসলেন বাইকের পেছন দিকে, কিন্তু গাড়ি গড়ানোর মুখেই পুরন্দরবাবু বিকাশের কাঁধটা খামচে ধরলেন, "এক মিনিট!"

বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল, "ক্যায়া হুয়া?"

মন্দিরের উলটোদিকে, পীচের রাস্তার ধার বরাবর কতগুলো গাছ সার দিয়ে দাঁড়ানো। গাছগুলোর পেছনেই খাঁড়া ঢাল ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ওরা এখন সেই ঢালের পাশেই দাঁড়িয়ে।

পুরন্দরবাবু, অন্ধকার গাছগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এইসা লগা, উহা পর কোই খড়া থা..."

— "আপ ভি না পাণ্ডে জী!" বিকাশ মুখে বিরক্তির শব্দ করে গাড়ি গড়িয়ে দিলো, "খালি পিলি ডরা দিয়ে..."

দেখতেই দেখতে বিকাশের গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যেতেই জায়গাটা নির্জন হয়ে গেল। অন্যদিন রাস্তার ধারে দু-একটা কুকুরকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আজ তা-ও অনুপস্থিত।

ঠিক এমন সময় সত্যি সত্যি গাছের আড়াল থেকে একটা কালো চাদরে মোড়া শরীর বেরিয়ে এল। পুরো শরীর কালো চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা। নুয়ে পড়া শরীরটা দেখলেই বোঝা যায়, এককালে এই শরীরের মালিক যথেষ্ট লম্বা ছিলেন। লোকটির হাতে একটা প্যাঁচানো লাঠি ধরা।

লোকটি ঘাড় উঁচিয়ে একবার রাস্তার আলোগুলোর দিকে তাকাল। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে হাতে ধরা লাঠিটা রাস্তার ওপরে ঠুকতেই একটা আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল।

এক একবার লাঠি ঠোকার সঙ্গে সঙ্গেই... এক একটা করে রাস্তার আলো নিবে যেতে লাগল। এই করতে করতে মন্দিরের কাছাকাছি যতগুলো আলো জ্বলছিল সবগুলোই একটা একটা করে নিবে যাওয়ায় জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। লোকটা এই অন্ধকারেই লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেল রঙ্কিনী মন্দিরের দরজার কাছে। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই মন্দিরের প্রধান ফটকের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসল সেই রহস্যময় ব্যক্তি। শরীর ঢাকা দেওয়ার চাদর খানা খুলে একপাশে জড়ো করে রাখল। তারপর হাতের লাঠিটাকে মুখের সামনে ধরে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্রপাঠ করতেই, হাতের লাঠিটা অদৃশ্য মন্ত্রশক্তিতে বদলে গেল একটা কাঁটাওলা চাবুকে।

লোকটি আর দেরি করল না। হাতের চাবুকটা শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পিঠে সপাৎ করে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল মন্দির চত্বর জুড়ে। আর্তনাদ কমলে, লোকটি কোনোরকমে গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলে উঠল, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা।"

প্রতি অমাবস্যায় মন্দির প্রাঙ্গণ নির্জন হয়ে গেলে লোকটি আসে। জায়গাটা অন্ধকারে ঢেকে লোকটি মন্দিরের সামনে বসে নিজেই নিজেকে আঘাত দেয়। আর চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, এই বলে যে, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা।" এই আঘাত ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না তার পিঠ ফেটে

রক্ত বেরোয়। মনে হয় যেন গর্হিত কোনো অপরাধের শাস্তি সে নিজেকে এই অত্যাচারের মাধ্যমে দিয়ে চলছে।

এইভাবে দশবার সজোরে চাবুক মারার পর লোকটির গলা দিয়ে একটা অস্ফুট গোঙানি ছাড়া যখন কিছু বেরচ্ছিল না, ঠিক তখনই লোকটা টের পেল, তার পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। অন্ধকারেই লোকটির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। দুঃখে নয়, যন্ত্রণায় নয়। বরং আনন্দে। এবার আর তাকে ক্ষুধার তাড়নায় জ্বলতে হবে। মুখে অন্ন তুলতে পারবে সে। আর কী চাই?

ঠিক এমন সময় কী একটা দেখতে পেয়েই চমকে লোকটি। বহু দূরের পথবাতি আপনা থেকেই জ্বলে উঠেছে... এটা কী করে হয়? সে যে মন্ত্র পাঠ করে নিবিয়ে দিয়েছিল আলো। তার না চলে যাওয়া পর্যন্ত এ আলোর তো জ্বলার কথা নয়।

পথবাতির আলোগুলো উত্তর দক্ষিণ দু-দিক থেকেই ক্রমশ জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করে চাবুকটাকে আবার লাঠিতে পরিণত করে দিল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে চাদরটা তুলে গায়ে ঢাকা দেওয়ার আগেই মন্দিরের মাথার উজ্জ্বল নিয়ন বাতিটা আপনা থেকেই জ্বলে উঠল। আর ঠিক তখনই দেখা গেল চাদরে ঢাকা রহস্যময় লোকটার চেহারা।

একটা বেঁকে দাঁড়ানো লম্বা শরীর। সারা শরীরে ফোঁড়া, সেই ফোঁড়া থেকে পুঁজ গলে গলে পড়ছে। শরীরের চামড়ার যেটুকু অংশ বাকি রয়েছে সেখানে শিকড়ের মতো করে গাছ গজিয়েছে। লোকটির কপালে একটা হাতের সাইজের বড় মাংসপিণ্ড, নিয়ন আলোয় দেখা গেল, সেখান থেকে পোকা খসে পড়ছে। এরকম ঘৃণ্য চেহারা দেখলে সাথে সাথে বমি আসতে বাধ্য। নিজের ঘৃণ্য চেহারা আলোয় প্রকাশ করতে চায় না তাই সে অন্ধকারে ঢেকে আসে চারদিক। কিন্তু আচমকা তার মন্ত্র বিফল হওয়ায় সে যতটা না বিহ্বল তার চেয়েও বেশি অবাক। এটা কী করে হল?

আর ঠিক তখনই একজনকে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল লোকটা।

একটি সুদর্শন যুবক চোখ বন্ধ করে মুখ আকাশের দিকে তুলে দেহের দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি এই যুবকে এর আগে দেখেনি। কিন্তু আমরা এই যুবকে চিনি। এ হল সাগর। যার মধ্যে এখন শয়তান প্রভু কল্লকেশীর বাস।

সাগর হাত নামিয়ে তাকাল লোকটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল লোকটি। এ কে? ছেলেটি এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিল বলে বোঝা যায়নি, কিন্তু এতক্ষণে দেখা গেল ছেলেটির চোখের তারা সম্পূর্ণ রূপে কালো। একফোঁটাও সাদা অংশ নেই।

সাগর পা পা করে এগিয়ে এল লোকটির কাছে।

— "কে? কে তুমি..."

লোকটির প্রশ্নে সাগরের ঠোঁটের কোলে খেলে গেল, একটা চোরা হাসি।

— "তুই আমায় চিনিস না। কিন্তু আমি তোকে চিনি..." নিয়ন বাতির আলোয় সাগরের করাতের ফলার মতো দাঁতের ফাঁক থেকে মাঝে মাঝেই উঁকি মারছে কালো চেরা জিবটা...

— "তুই সেই ব্যক্তি যাকে আজও লোকে কিংবদন্তীর অভিশাপ নামে চেনে...। কিন্তু তোর আসল পরিচয় অন্য। সে পরিচয় আজ আর কেউ জানে না। কী? ঠিক বলছি তো বিসম্ভর কাপালিক?"

দীর্ঘদিন পরে নিজের নামটা শুনে চমকে উঠল অতীতের সেই ভয়ংকর কাপালিক। কিন্তু আজ এ কী দশা হয়েছে তার?

— "তুই সেই ব্যক্তি যে, রঙ্কিনীকে রক্তকঙ্কালী তে পরিণত করেছিলি। তুই সেই ব্যক্তি যার ত্রাসে লোকে ভয়ে কাঁপত, তুই সেই ব্যক্তি যে শয়ে শয়ে লোকেদের বলি দিয়েছিলি, তুই সেই ব্যক্তি যাকে দীর্ঘায়ু হওয়ার অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল..."

বিসম্ভর মাথা নাড়াল, "হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি। যে আজও সেই পাপের শাস্তি বহন করে চলছি। কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কী করে? সে তো বহু বহু বছর আগেকার কথা... কে তুমি?"

— "আমি?" সাগর হাসল। হাসলে ওকে ভয়ঙ্কর দেখায় আজকাল,

"আমি কল্লকেশী।"

— "কল্লকেশী!" বিস্মিত বিসন্তর অবাক চোখে তাকাল, সাগরের মুখের দিকে। তাহলে সে কী সত্যি সত্যি দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়েছে?

— "তুমি কল্লকেশী?"

সাগর মাথা নাড়াল সম্মতির সুরে।

— "কিন্তু তুমি এখানে কেন এসেছ? কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?"

— "তুই রঙ্কিনীকে রক্তকঙ্কালীতে বদলেছিলি, আমি জানতে কীভাবে রক্তকঙ্কালী ফের পালটে গেল রঙ্কিনীতে? কী হয়েছিল সেদিন এখানে?"

বিসন্তর এবার বুঝতে পারল সাগরের এখানে আসার কারণ। সে মাথা নেড়ে বলল, "না। আমি তোমায় কিছুই বলব না। কিছু না...।" সাগর এগিয়ে এল বিসন্তরের আরো নিকটে নিকটে। তারপর তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "বলতে হবে না। আমিই দেখে নেব।"

সঙ্গে সঙ্গে সাগর চেপে ধরল বিসন্তরের চোখ দুটো। বিশন্তর প্রবল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। রাস্তার সমস্ত আলোগুলো ভয়ংকর ভাবে দপদপ করে উঠল। কিন্তু সাগর তাকে ছাড়ল না। সাগরের চোখের সামনের তখন সিনেমার মতো একটার পর একটা দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

এরকমই এক অমাবস্যার রাত্রি। রঙ্কিনী মন্দিরের ভেতরে পুজোয় বসেছে বিসন্তর কাপালিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের খাঁড়াখানা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে কাপালিক। মন্দিরের বাইরে হাঁড়িকাঠ স্থাপন করা হয়েছে নরবলির উদ্দেশ্যে। বলির জন্য একটি কিশোরী মেয়ে গলায় জবার মালা পরিয়ে, সিদ্ধি খাইয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। মেয়েটির পরিবারের বাকি সদস্যদের আগেই রক্ত কঙ্কালীর ভোগ হিসেবে নিবেদন করেছে বিসন্তর। বাকি রয়েছে কেবল এই মেয়েটি। আজ অমাবস্যার বিশেষ পুজো, তাই এই বিশেষ বলির আয়োজন।

ঠিক সময়ে বিসন্তর নিজের খাঁড়াখানা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাকি কাপালিকেরা মেয়েটিকে হাঁড়িকাঠে তুলল।

"মা... মা রে... তুই তোর বলি গ্রহণ কর মা।" চিৎকার করে ডেকে উঠল

বিসন্তর। বাকি কাপালিকেরা, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহযোগে ডেকে উঠল, মা... মা করে... সে এক বীভৎস দৃশ্য। বিসন্তর তার বিরাট খাঁড়াখানা তুলে যেই কোপ মারতে যাবে ওমনি একখানা বজ্রকণ্ঠ ঘোষিত হল এই কোলাহল ছাপিয়ে,

"জয় মা রঙ্কিনীর জয়..."

চমকে দেখার সময়টুকু পেল না বিসন্তর। ততক্ষণে মহর্ষি শম্ভুপাদ রঙ্কিনী দেবীর সোনার খড়গদিয়ে একখানা কোপ মেরেছেন মাটিতে। আর এক চোখ ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল ছিটকে পড়ে গেল চতুর্দিকে... সাগরের চোখের সামনে দৃশ্যপট পরিবর্তন হল।

মন্দিরের বাইরে সকল কাপালিক ভুলণ্ঠিত। কেউ মৃতপ্রায়, কেউ আহত হয়ে কাতরাচ্ছে। বোঝাই যায় একটু আগে একটা তাণ্ডবযুদ্ধ ঘটে গেছে জায়গাটা জুড়ে। ওদিকে বিসন্তর কাপালিকের চোখ-মুখ-নাক ফেটে রক্ত গলগল করে পড়ছে। তারও অবস্থা করুণ। কোনোরকমে নতজানু হয়ে বসে আছে সে দরজার বাইরে। মহর্ষি শম্ভুপাদ তার গলায় স্বর্ণ খড়গখানা চেপে চিৎকার করে বললেন, "পাপী! নরাধম! নিজেকে এই তুই মায়ের সন্তান বলিস? মায়ের সন্তান হলে তুই কখনওই মায়ের মন্দির অপবিত্র করতে পারতিস না। তুই টের পেয়েছিলি মায়ের মূর্তি শক্তিহীন হয়ে গেছে, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তোর আরাধ্যা রক্তপিপাসী ডাকিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিস মায়ের বিগ্রহে। তুই যা অপরাধ করেছিস, তার শাস্তি ভয়ংকর। তবে এই শাস্তি তোকে আমি নয়। তোকে মা-ই দেবে।" আবার দৃশ্যপট পরিবর্তন।

মহর্ষি গৃহগর্ভের মেঝেতে তিনবার স্বর্ণ খড়গের কোপ মারতেই পুরো মন্দিরটা নড়ে উঠল। ঠিক যেন পায়ের নীচে কোনো ভূমিকম্প। আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মেঝেতে একখানা গহ্বর উৎপন্ন হল। মহর্ষি দেরী না করে কাঁধের পুঁটুলি থেকে একটা নীল আলোকোজ্জ্বল বস্তু বের করে তাকালেন কাপালিকের দিকে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "তুই ভালো করেই জানিস, এটা কী, এরই সুযোগ নিয়ে তুই মা'কে অপবিত্র করেছিলি না? এবার এরই শক্তিতে দেখ তোর আরাধ্যা কেমন ধ্বংস হয়।"

মহর্ষি সঙ্গে সঙ্গে সেই নীল আলোক খণ্ডটা গর্তের মধ্যে ফেলতেই একটা সাদা আলোর ঝলকানি। রঙ্কিনীর কালো পাথরের মূর্তি এক অদ্ভুত চোখ ধাঁধানো আলো বিকিরণ করছে। পরক্ষনেই এক তীব্র নারী কণ্ঠের চিৎকার বেরিয়ে এল রঙ্কিনীর মূর্তি থেকে। তারপরেই দেখা গেল রঙ্কিনীর তেজ সহ্য করতে না পেরে রঙ্কিনীর বিগ্রহ থেকে বেরিয়ে এল সেই ভয়ংকরা নগ্ন নারী। কিন্তু মূর্তি হতে বাইরে বেরতেই মেয়েটির সারা শরীরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এক আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল মন্দিরের মধ্যে। আর তারপর মেয়েটি একটি অগ্নি গোলকে পরিবর্তিত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই শূন্যে মিলিয়ে গেল। আবার দৃশ্যপট পরিবর্তন,

গৃহগর্ভের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহর্ষি শম্ভুপাদ, দ্বারের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে বিসম্ভর। রঙ্কিনীর বিগ্রহ থেকে তেজ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এ জ্যোতি দেবী রঙ্কিনীর শক্তির তেজ। এই তেজে পাপ বিনাশ হয়। এই তেজে অধর্ম নাশ হয়।

আচমকা নারীকণ্ঠের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল মন্দির জুড়ে। সেই কণ্ঠের তেজ ধারণ করার ক্ষমতা সকলের নেই।

— "তুই যে দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এই অনাচার করেছিস, সেই দীর্ঘায়ুই তুই ভোগ করবি। কিন্তু সেটা আশীর্বাদ হবে না, সেটা হবে তোর জীবনের অভিশাপ... তোর সারা শরীরে শিকড় গজাবে, শরীরে পচন ধরবে, পোকা হবে। তুই প্রতিনিয়ত মৃত্যু চাইবি কিন্তু তুই সময়ের আগে মরবি না। প্রতি অমাবস্যায় এই দ্বারে বসে নিজেকে আঘাত করে রক্ত না ঝরালে তুই খাবার মুখে তুলতে পারবি না। আশীর্বাদ চেয়েছিলি না? নে তোকে দিলাম, দীর্ঘায়ু হওয়ার অভিশাপ। দীর্ঘায়ু ভবঃ!"

আর তারপরেই সাগরের চোখের সামনে থেকে সব কিছু সরে গেল। একটা জোরে ঝটকা অনুভব করতেই সাগর ছেড়ে দিল বিসম্ভরকে। বিসম্ভর কাপালিক পিচের রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মাটিতে পড়ে কুকুরের মতো জিব বের করে হাঁপাচ্ছে বিসম্ভর।

সাগর তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল, "শম্ভুপাদ, শম্ভুপাদ মন্দিরের গর্ভে

কী রেখেছিল ওটা? কী হল বলো? কী রেখেছিল ওটা?”

বিসম্ভর কোনোরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে তাকাল সাগরের মুখের দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, “আমি জানতাম না তখন। তবে পরে আন্দাজ করেছিলাম। রক্ত কঙ্কালীকে রঙ্কিনীতে বদলে দিতে পারে একমাত্র দেবীর শক্তিঅঙ্গ। ওটা ছিল দেবীর শক্তি অঙ্গ। রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা...”

ধ্বংসযজ্ঞ
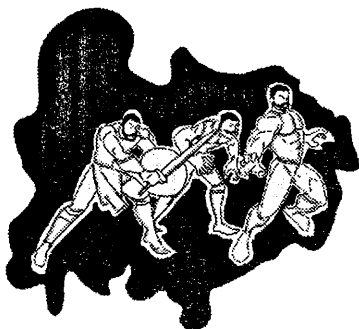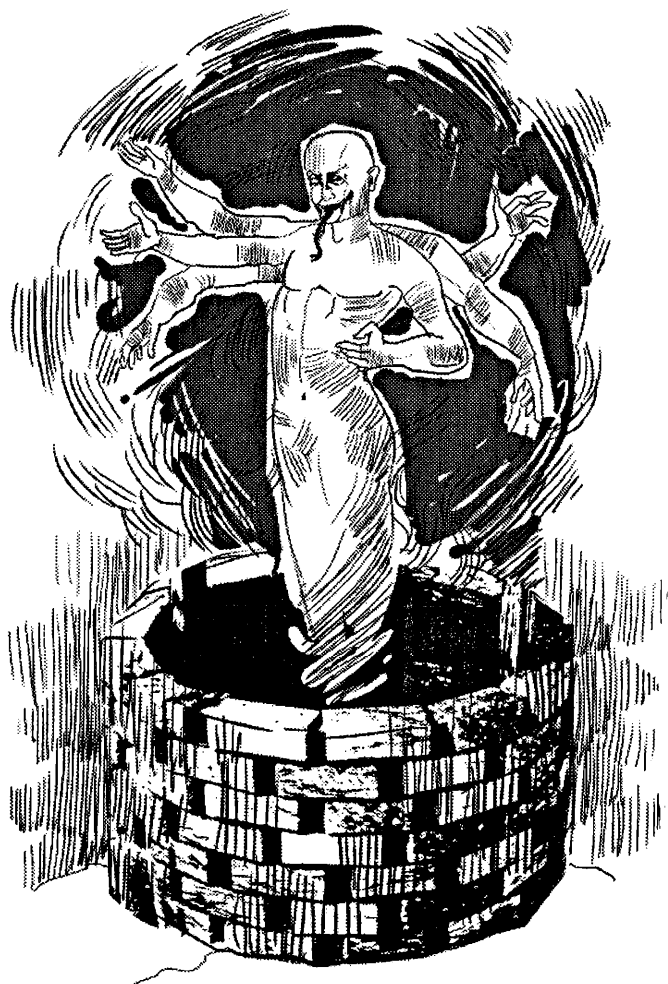
(শাপভ্রষ্ট দেবতা)

অন্ধকার রাত্রি। জানালার বাইরে হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ হওয়ায় ঘরের ভেতর সেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডাটা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। সাত বছরের বাচ্চা মেয়েটা বিছানার ওপর আধশোয়া হয়ে, পশমের গরম চাদরের তলায় একমনে একখানা গল্পের বই পড়ছিল। বিছানার পাশের টেবিলেই একখানা লণ্ঠন জ্বলছিল। সেই লণ্ঠনেরই উত্তাপ কিছুটা তার মুখে এসে পড়ছে।

ঠিক এমন সময়ই দরজার বাইরে কাঠের সিঁড়ির ওপরে হালকা মচমচ শব্দ পেয়েই বাচ্চা মেয়েটা বই বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। সে ঠিক শুনল? নাকি...?"

হ্যাঁ, ওই তো। কাঠের সিঁড়ির ওপর পায়ের চাপে তৈরী হওয়া মচমচ শব্দ। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে, গল্পের বইটাকে বালিশের নীচে চালান করে হাতটা বাড়িয়ে যেই লণ্ঠনের আলোটা কমাতে যাবে, ঠিক সেই সময়ই ঘরের বন্ধ দরজায় একটা খুট করে শব্দ।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবখানা এমন যেন ঘুমিয়ে একেবারে কাদা।

"ক্যাঁচ!" দরজা খোলার শব্দ হল। আর তারপরেই ঘরের কাঠের মেঝেতে কারো এগিয়ে আসার শব্দ। মেয়েটা চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। মোটেও জানানো চলবে না, সে জেগে রয়েছে।

ধীরে ধীরে সেই পায়ের শব্দ বিছানার পাশে এসে থেমে গেল। তারপর তারই বিছানার ডান পাশে এসে কেউ যেন বসল। না... না সে মোটেও জানতে দেবে না সে জেগে ছিল। ঠিক এমন সময় দুটো আঙুল দিয়ে কেউ একজন মেয়েটির চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে দিতেই দেখা গেল একটা মহিলার মুখ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

— "খুব ঘুম হচ্ছে না?"

বলেই মহিলাটি বাচ্চাটির পেটে কাতুকুতু দিতেই, মেয়েটির খিলখিলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

— "বদমাশ, ঘুমোয়নি এখনও..."

মেয়েটি কাতুকুতুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে উঠে বসল বিছানার ওপরে, "মা... তুমি কী করে বুঝতে পেরে যাও যে আমি জেগে থাকি...?"

— "কারণ আমি মা। মায়েরা সব বুঝতে পারে।" মহিলাটি নিজের মেয়ের কপালের সামনের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে প্রশ্ন করল, "এখনো ঘুমোওনি কেন?"

বাচ্চা মেয়েটা বড়দের মতো কাঁধ নাচিয়ে বলে উঠল, "ঘুম আসছিল না।"

মহিলাটি নিজের ছোট মেয়ের বড়দের মতো আবভাব দেখে হেসে উঠল। "ঘুম আসছিল না? তাহলে কী করতে হবে যাতে ঘুম আসে?"

বাচ্চাটি মায়ের কথা শুনে, গালে আঙুল দিয়ে ভাবতে বসল। উফ! কত্ত ভাবনা ভাবছে। তারপর আচমকাই বাচ্চাটি বলে উঠল, "গল্প বলতে হবে।"

মহিলাটি ঘাড় নেড়ে বলল, "গল্প বললে ঘুম চলে আসবে?"

বাচ্চা মেয়েটি মাথা নাড়াল। হ্যাঁ।

— "তা কী গল্প শুনবে?"

— "ওই যে ওই গল্পটা। সকলে মিলে ঠাকুরটাকে শাস্তি দিল...। আর ঠাকুরটা..."

— "আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এল, শয়তান হয়ে।" মহিলাটি নিজের মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। মেয়েটির চোখ জোড়া আচমকাই যেন চকচক করে উঠল।

— "হ্যাঁ, এই গল্পটা।"

— "কালকেই তো শোনালাম... আবার?"

মায়ের প্রশ্নে মেয়েটি মাথা নাড়াল। তারপর বিছানায় শুয়ে বুকপর্যন্ত চাদরটা টেনে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলল, "এটা শুনেই ঘুমিয়ে পড়ব। একটুও জাগব না তার পরে।"

মহিলাটি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল।

— "অনেকদিন আগে যখন কোথাও কিছু ছিল না। তখন আকাশের দেবতারা ঠিক করলেন তাঁরা পৃথিবী বানাবেন। যাতে থাকবে মানুষেরা। মানুষেরা দেবতাদের আরাধনা করবেন। দেবতারা সেই পুজোয় খুশি হয়ে মানুষদের সমৃদ্ধ করবে। সেই মতো সমস্ত দেবতারা মিলে নিজের নিজের শক্তি দিয়ে এই পৃথিবী বানালেন। সমস্ত দেবতারা নিজেদের শক্তি দিয়ে পৃথিবী বানালেন তাই পৃথিবীর সমস্ত শক্তির দেবতা আলাদা আলদা, যেমন জলের দেবতা বরুণদেব, হাওয়ার দেবতা পবনদেব, আগুণের দেবতা অগ্নিদেব, সূর্যের দেবতা সূর্যদেব। এইসব দেবতাদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দেবতা ছিলেন অগ্নিদেব। এই অগ্নিদেব এমনিতে ভীষণ ভালো, কিন্তু রেগে গেলেই মুশকিল হত। চারদিক জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। তো এই অগ্নিদেবের অনেক অনেক অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। অগ্নিদেব সবাইকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু একটু বেশি স্নেহ করতেন নিজের ছোটছেলে কল্লকেশীকে। তার কারণও ছিল। কল্লকেশীকে তার বাকি ভাইবোনেরা ঠিক পছন্দ করত না।"

— "কেন পছন্দ করত না?" মেয়েটি অবাক গলায় প্রশ্ন করতেই মহিলাটি আবার মেয়ের দিকে তাকালো। যতবারই গল্পটা শোনে মেয়ে ততবারই এই জায়গায় এসে এই প্রশ্নটাই করে। যেন প্রত্যেকবারই সে নতুন করে অবাক হয় চেনা গল্পে...

— "কারণ... কল্লকেশীকে দেখতে তার বাকি ভাইবোনদের মতো সুন্দর ছিল না। আর তার অনেক শক্তি থাকলেও কিন্তু দেবতাদের যে গুনগুলো থাকে সেরকম কোনো গুন ছিল না। বদলে তার মধ্যে ছিল লোভ। হিংসা।

অন্যকে দমিয়ে রাখার ইচ্ছা, নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা, অপরকে হেয় করা। অথচ এরপরেও সে সব সময় চাইত লোকে বাকিদের মতো তাকেও পুজো করুক। কিন্তু মানুষেরা তো দেবগুণ থাকলে তবেই দেবতাদের পুজো করবে। তাই পুজো না পেয়ে, সে ভেতরে ভেতরেই ফুঁসতে লাগল। আর বাকি দেবতাদের খুব হিংসে করতে লাগল। সে ভাবল বাকিদের শেষ করে দিলেই সেখানে সে ছাড়া আর কেউ থাকবে না। উপরন্তু ভাই বোন আর অন্যান্য

দেবতাদের শক্তি সে পেয়ে যাবে। আর হয়ে উঠবে বলীয়ান। তাহলে মানুষেরা তারই পুজো করবে। এই মনে করে কল্লকেশী নিজের বাকি ভাইবোনদের আক্রমণ করল। তার আক্রমণে একে একে তার সব ভাইবোন মারা গেল। সে তাদের ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে বাকি দেবতাদের আক্রমণ করতে গেল। আর তখনই সমস্ত দেবতা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আক্রমণ করল। সম্মিলিত আক্রমণে অগ্নিদেব যখন বুঝতে পারলেন কল্লকেশী মারা পড়তে পারে, তখন ভয় পেয়ে তিনি নিজের একমাত্র জীবিত পুত্রকে এক আশীর্বাদের অভেদ্য বর্ম প্রদান করলেন। তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন এই বলে যে, আগুনে পোড়ে এমন কোনো অস্ত্রেই তিনি মরবেন না। আগুনে পোড়ে না এমন কোনো অস্ত্র যদি বানানোও হয়, তাহলে তা কল্লকেশীকে নিজের হাতে ছুঁতে হবে। দেবতাদের সকল অস্ত্র আগুনে পোড়ে তাই তাদের আক্রমণ সেই আশীর্বাদের কাছে ব্যর্থ হল। তখন দেবতারা সকলে মিলে কল্লকেশীকে চিরকালের জন্য স্বর্গ থেকে নির্বাসন দিলেন।"

— "তারপর?"

— "তারপর, কল্লকেশী স্বর্গ থেকে নেমে এল মর্তে। মর্ত্যে নেমে আসার পরেও সে বদলাল না। মর্তের কিছু লোক তার ক্ষমতায় ভয় পেয়ে তার পুজা করতে লাগল। তাদের বলা হত বিকশবাহু। কল্লকেশী তখন চাইল মর্ত্যের সকলে স্বর্গের দেবতাদের ছেড়ে তার উপাসনা করুক। কিন্তু মর্ত্যবাসীরা যখন সেই প্রস্তাবে রাজি হল না, তখন সে নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ বিকশবাহুদের বলীয়ান করে তুলল। তারা তখন মর্ত্যবাসীদের নানান উপায়ে নিপীড়ন করতে শুরু করল। এই নিপীড়নে মানুষদের দুর্দশা চরমে উঠল। মানুষদের এই দুর্দশা দেখে তখন সমস্ত দেবতারা, দেবী মহামায়াকে স্মরণ করলেন, যিনি সকল দেবতাদের তৈরী করেছিলেন। তিনি তখন মর্ত্যে রঙ্কিনী দেবীর অবতারে নেমে এসে কল্লকেশীকে নিজের ক্ষমতায় চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে পাতালে পাঠিয়ে দিলেন।"

— "পাতাল কোথায় মা?"

— "পাতাল পৃথিবীর অনেক নীচে, মর্ত্যর যা কিছু খারাপ তা সব ওখানে

থাকে।”

— “দেবী রঙ্কিনী যদি সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তো তাহলে খুব শক্তিশালী। তিনি কেন কল্পকেশীকে মারতে পারলেন না?”

— “তিনি মারতে পারলেন না। কারণ কল্পকেশীকে রক্ষা করছিল তার বাবার অভেদ্য বর্ম। ওটা শুধু তো একটা আশীর্বাদ নয়, ওটা ছিল অগ্নিদেবের তার ছেলের প্রতি ভালোবাসা... আর ভালোবাসার থেকে বড় কবজ আর হয় না। সেখানে কারোর জোর খাটে না। দেবী রঙ্কিনীরও না।” তারপর কী মনে পড়তেই মহিলাটি তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “অনেকক্ষণ হয়েছে। পুরো গল্পটা শুনলে, এবার তুমি চুপটি করে ঘুমোবে...”

— “কল্পকেশী যদি জেগে ওঠে তাহলে কী হবে?” মেয়েটি কৌতূহলী প্রশ্ন করতেই মহিলাটি মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে বলে উঠলেন, “তাহলে দেবী রঙ্কিনী আবার তাঁকে আটকাবেন। নাও, এরপর আর একটা কথা নয়। একদম চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে যাবে।” কথাটা বলেই মহিলাটি মেয়ের বালিশের তলা থেকে বের করে আনল সেই গল্পের বইটি। তারপর লন্ঠনের বাতিটা কমিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, “এটা নিয়ে গেলাম। নইলে তুমি আবার পড়তে শুরু করে দেবে।” কথাটা বলেই দরজারটা টেনে বাইরে বেরিয়ে এল মহিলাটি।

কিন্তু এগোতে পারল না। ধপ করে দরজার বাইরেই বসে পড়ল। এই গল্পটা যতবার সে মেয়েকে শোনায় ততবার তার চোখের সামনে দৃশ্যপটের মত সমস্তটা ভেসে ওঠে। কতদিন হল? সময়ের হিসেবে সাড়ে পাঁচ বছর কিন্তু আজও সে সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনে রেখেছে। রাঢ়ভূম, ঢলভূমগড়, রঙ্কিনীর মন্দির, সুবর্ণরেখা, পাহাড় জঙ্গল থেকে মহারানি কঙ্কাবতীকে পর্যন্ত। সে এদের ভুলবে কী করে? ভোলা তো তাদের যায় যাদের অস্তিত্ব স্মৃতিপটে মলিন হয়ে যায়। কিন্তু যা তাঁকে জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, সেই প্রতিশ্রুতি সে ভুলবে কেমন করে?

হ্যাঁ, সে পিতাকে দেওয়া কথা রেখেছে। সে রাঢ়ভূম থেকে বহু দূরে এসেছে। শুধু তাই নয় যোদ্ধার বেশ ত্যাগ করে সে মা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যি সে শিবদ্যুতির মা হয়ে উঠতে পেরেছে কি? নাকি ভালো মা হওয়ার

নিরন্তর অভিনয়টুকু করে যাচ্ছে? উত্তর খুঁজে পেল না লল্লটা। হ্যাঁ, লল্লটা। এই সেই লল্লটা যে শম্ভুপাদের নির্দেশ মেনে সেই রাত্রেই রাজকন্যা শিবদ্যুতিকে নিয়ে রাঢ়ভূম ছেড়েছিল। সে অক্ষরে অক্ষরে পিতার নির্দেশ পালন করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। পিতার নির্দেশ ছিল, অষ্টমগর্ভের রক্তকে রক্ষা করা। আর সে সেটার প্রয়োজনে যা যা করার সব করবে। নতুন এক পরিচয় নিয়েছে সে নিজের। পুরোনো খোলোনচা সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছে। চুল বড় করেছে, শরীরে রুক্ষতা ঢেকে গিয়েছে নারীসুলভ নমনীয়তায়। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও সে তার ভেতরে লুকিয়ে-থাকা এক মায়ের অস্তিত্ব সে আজও বদলাতে পারেনি। যে মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার দুধের শিশুকে। সেই মায়ের মন আজ এত কিছুর পরেও রোজ রাত্রে কাঁদে। আর এ কান্না মৃত্যুর আগে থামবে না।

* * * * * * * *

সাগরের ঠোঁটের কোলে ফুটে উঠল একটা কুটিল হাসি। তাহলে? তাহলে শম্ভুপাদ এখানে লুকিয়ে রেখেছে রঙ্কিনী দেবীর জিহ্বা।

মাটিতে পড়ে বিসন্তর তখনও হাঁপাচ্ছিল। সাগর তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই নিশ্চিত, ওটা রঙ্কিনীর জিহ্বাই ছিল..."

— "এছাড়া আর কী এমন হতে পারে যা দেবীর শক্তিকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারে?" বিসন্তর খানিকটা ধাতস্থ হতে গায়ে কালো কাপড়টা জড়িয়ে লাঠি হাতে উঠে দাঁড়াল।

নিয়নবাতির আলোয় সাগরের মুখটা আরো ভয়ংকর লাগছে।

— "তুই, আমায় অনেক দরকারি একটা তথ্য দিলি। এতে আমি খুশি হয়েছি। বল তোর কী চাই..."

বিসন্তর সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সাগরের দিকে,

— "আমি এখন একটাই জিনিস চাই, সেটা হল মৃত্যু। আমি আর এই দীর্ঘায়ু হওয়ার অভিশাপ বইতে পারছি না।" তারপর কয়েকমুহূর্ত থেমে বলল,

"কিন্তু এই অভিশাপ খোদ দেবী রঙ্কিনীর দেওয়া। রঙ্কিনীর অভিশাপ কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। তুমিও না।"

— "পারব," সাগরের ঠোঁটের কোলে কুটিল হাসি, "খুব তাড়াতাড়ি আমি আমার আগের শক্তি পেতে চলেছি। তখন তোর অভিশাপ আমি খণ্ডন করতে পারব।"

— "পারবে?" বিসন্তরের চোখ জোড়া নতুন প্রত্যাশায় চকচক করে উঠল।

— "হুম। শুধু একটা ছোট্ট কাজ আছে। সেই কাজটা করতে হবে। এক কাজ কর পাহাড়ে জঙ্গলে আর লুকিয়ে না থেকে, এখান থেকে সোজা চলে যা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। মহুতনী নামে একটা গ্রাম পড়বে। সেই গ্রামের পাঁচ জন লোক রঙ্কিনীর অভিশাপে তোর মতোই দীর্ঘায়ু। তাই তারা তোকে দেখে অবাক হবে না। সেই গ্রামে মনুর মা নামে আমার এক ভক্ত আছে। তার কাছে আমার নাম বলবি। সে তোকে আশ্রয় দেবে।"

বিসন্তর অবাক চোখে তাকাল সাগরের দিকে। সাগর তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু কেন? সাগর তার মনের কথা টের পেয়ে বলে উঠল, "তোকে আশ্রয় দিচ্ছি। কারণ ভবিষ্যতে তোকে আমার দরকার। যা এবার। আর দেরী করিস না।"

যে বিসন্তর একটু আগেই দেবী রঙ্কিনীর মন্দিরের সামনে দেবীর ক্ষমা ভিক্ষা চাইছিল, শাপখণ্ডন হওয়ার সামান্যতম প্রলোভন প্রতিশ্রুতিতেই তার আনুগত্য বদলে গেল। সে সাগরকে প্রণাম করে বলে উঠল, "প্রভু কল্লকেশীর জয় হোক!"

আর তারপর আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতরে হারিয়ে গেল।

বিসন্তর চোখের আড়াল হতেই, প্যান্টের পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে আনল সাগর। একখানা শিঙা। তারপর দেরী না করে শিঙায় ফুঁ দিতেই আবার সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

রাস্তার আলোগুলো দপ দপ করে জ্বলে উঠল ভয়ংকর ভাবে। তারপর

ধীরে ধীরে এক একটা আলো বদলে যেতে লাগল মায়াবী নীল আলোয়। একটা মায়াবী শিসের শব্দ, আর সেই সঙ্গে এক বিকট মাংসপচা দুর্গন্ধ। পরক্ষণেই সাগরের সামনে দেখা গেল একখানা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলী, সেটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে এক নারীর অবয়বে। আর পিচের রাস্তা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে তিনখানা ভয়ঙ্কর হায়না। ভয়ংকর অবিনাশী হায়না।

যারা অবধ্য। অপরাজেয়।

— "মড়ন্তিকা!"

সাগরের সামনে সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়েছিল রাঢ়ভূমের ভয়ংকর পিশাচিনী মড়ন্তিকা।

— "প্রভু কল্লকেশীর জয় হোক।"

— "আমি রঙ্কিনীর আসল জিহ্বার সন্ধান পেয়ে গেছি।" সাগরের চোখে নরকের কুটিলতা।

কথাটা শুনেই চোখ জোড়া চকচক করে উঠল পিশাচিনীর, "সত্যি প্রভু? কথায় আছে সেটা..."

— "মন্দিরের গর্ভগৃহে।" সাগরের গলার স্বর বিষধর সাপের মতো হিসহিস করে উঠল, "শম্ভুপাদ, রঙ্কিনীর আসল জিহ্বা। মন্দিরের গর্ভগৃহের মেঝের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল।"

— "তাহলে আর দেরি কীসের প্রভু...?" বাচ্চাদের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল মড়ন্তিকা, "চলুন, রঙ্কিনীর জিহ্বাখানা বের করে আনি।"

— "দাঁড়া, এখানে দুটো ব্যাপার রয়েছে।" আচমকা সাগরের স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, "এক আমরা দু-জনের কেউই রঙ্কিনীর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারব না। কারণ আমাদের দু-জনের মধ্যেই এমন শক্তি রয়েছে যা রঙ্কিনীর মন্দিরে ঢুকতে আমাদের বাধা দেবে। এখানে এমন কাউকে ঢুকতে হবে যে আমাদের অনুগত, কিন্তু সে সাধারণ মানুষ..."

— "মনুর মা?"

— "সেটা সমস্যা নয়। আমরা কাউকে বশ করেও কাজটা করাতে পারি।"

— "তাহলে সমস্যা কোথায় প্রভু?" মড়ন্তিকার কণ্ঠে উদ্বেগ।

— "সমস্যা হবে জিহ্বাটা বের করে আনার পর। তোকে আগেই বলেছিলাম অষ্টমগর্ভের রক্ত বেঁচে থাকলে, আমার পক্ষে কখনওই সম্ভব হবে না সেই জিহ্বা ছোঁয়া। ছুঁলেই তুই আর আমি পাথর হয়ে যাব। কারণ আজও রঙ্কিনীর জিহ্বা রক্ষা করছে অবশিষ্ট অষ্টমগর্ভের রক্ত।" সাগর মড়ন্তিকার দিকে তাকাল। সাগরের চোয়াল আপনা থেকেই শক্ত হয়ে যাচ্ছে, "তোকে বলেছিলাম, অষ্টমগর্ভের খোঁজ করতে। তুই অষ্টমগর্ভের সন্ধান পেয়েছিস?"

— "কঙ্কাবতীর কন্যা শিবদ্যুতিকে নিয়ে অনেক আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শম্ভুপাদের পালিতা কন্যা লল্লটা। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়েছে তারা মারা গিয়েছে।"

— "শিবদ্যুতির কোনো সন্তান হয়নি? অষ্টমগর্ভের তো বংশ থাকার কথা। শিবদ্যুতির পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চয়ই রয়েছে। তার সন্ধান পেয়েছিস কী?"

মড়ন্তিকা সাগরের কণ্ঠে উষ্ণতা টের পেল, তীরের এতকাছে এসে তরী ডুবলে প্রভু তাকে যে শেষ করে দেবে তা সে বিলক্ষণ জানে। তাই সে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছে, ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে মড়ন্তিকা বলে উঠল, "পেয়েছি, প্রভু। অষ্টম গর্ভের শেষ প্রজন্মের সন্ধান পেয়েছি।"

— "কে সে?" সাগরের চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল

— "সে আপনারই পরিচিত।"

— "আমার পরিচিত? কে সে? কী নাম তার?"

সাগরের প্রশ্নে মড়ন্তিকার চোখ জোড়া নীল আলোয় চকচক করে উঠল, "সে আর কেউ নয়। আপনারই বান্ধবী। মিলি দত্ত।"

*   *   *   *   *   *   *   *

কাজ করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকাল মিলি। এগারোটা দশ। ইশ! এত দেরী হয়ে গিয়েছে?

সে নিজের ডেস্কের বাইরে ঘাড় তুলে অফিসের চারিদিক চোখ বোলাল। এখনো অফিসে দু-চারজন রয়েছে। তবে বেশীর ভাগই চলে গিয়েছে। মিডিয়া

লাইনে কাজ করার এই হল অসুবিধে। যখন কাজের চাপ থাকে তখন সময়ের হিসেব থাকে না।

একটা বিশাল চত্বর কাচের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ছোট ছোট কেবিন মতো করা রয়েছে। এখানে রাশ আওয়ারে লোকজন গিজগিজ করে। কিন্তু রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন যখন বেরিয়ে যায় জায়গাটা কেমন যেন অদ্ভুতভাবেই নীরব হতে শুরু করে। মিলি দ্রুত হাতে, কম্পিউটার অফ করল।

ঠিক এই সময়ই। ডেস্কের ক্লিপবোর্ডে আটকে-রাখা একটা ছবির দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল। সেই ছবিতে গলা জড়াজড়ি করে তিন জনের একখানা ছবি। তার, অনিকেতের আর সাগরের। কতদিন হল? বছর দেড়েক?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মিলির বুকের ভেতর থেকে।

অনিকেতকে সে পছন্দ করত। কিন্তু অনিকেতকে সে এই কথা বলে ওঠার আগেই সে ছিল থেকে নেই হয়ে গেল আচমকা।

অনিকেতের সঙ্গে তার আলাপ ফেসবুকে। এমনিতে মিলি কখনওই নিজের আশপাশে কাউকে বেশি ঘেঁষতে দেয়নি। কারণ বংশপরম্পরায় তার অতীত একটু রহস্যময়। সে বংশগতভাবে মায়ের দিক থেকে এমন একটি রক্তের ধারা বহন করে আনছে, যা কিনা দৈবিক। তাই অনিকেতের বন্ধুত্বের প্রস্তাব সে প্রথমে একটু অবহেলাই করেছিল। কিন্তু অনিকেতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে বুঝল অনিকেত ভালো মানুষ। বেশ ভরসাযোগ্য। তারপরে কথা প্রসঙ্গে আচমকা একদিন অনিকেত যখন জানাল সেও এমন একটি বংশ থেকেই এসেছে যাদের বংশপরম্পরায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সেটা হল কল্লকেশী নামক সেই অপদেবতার পুনর্জন্মের অপেক্ষা করা আর সে জন্ম নিলে তাকে নজরে নজরে রাখা, তখন প্রথমবার মিলির যেন এই বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে আর একলা লাগল না। অনিকেত যেহেতু মিলির সমস্ত কথাই জানত সে মনে করেছিল মিলিকে সাগরের হাত থেকে বাঁচানোর সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল মিলিকে সাগরের খুব কাছে কাছে রাখা। মানুষ দূরের জিনিস আগে দেখে, আর কাছের জিনিস পরে। যদি কখনও এমন

দিন আসে, যে সাগরকে পুরো কল্লকেশী গ্রাস করে ফেলল, আর সে অষ্টমগর্ভের বিনাশ করার কথা ভাবে তাহলে মিলির দিকে যাতে দেরী করে নজর পড়ে। আর মিলি যাতে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে সময় পায়। সেই জন্য সে মিলিকে তাদের অফিসেই চাকরি নিতে বলে। কিছুদিনের মধ্যেই অনিকেতের প্রভাবেই মিলি সাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে। সময় ভালোই কাটছিল কিন্তু আচমকা একদিন সাগর তাদের জানায় সে ঝাড়খণ্ডে যেতে চায় একটি কাজের জন্য।

অনিকেত, মিলি নিজেদের সাধ্য মতো বারণ করে সাগরকে, কিন্তু সাগর তাদের কথা শোনে না।

আর ঠিক তারপরেই একদিন সন্ধ্যের মুখে সে একটা ফোন আসে ঝাড়খণ্ড থেকে। অনিকেত দেরি না করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশে। মিলি যেতে চেয়েছিল অনিকেতের সঙ্গে কিন্তু অনিকেত সেদিন মিলিকে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। গাড়িতে থাকতে থাকতেই সেদিন শেষ কথা বলেছিল অনিকেত। বলেছিল সে খুব তাড়াতাড়ি সাগরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তারপর সাগর ঝাড়খণ্ড থেকে ফিরে এলেও, অনিকেত ফিরতে পারেনি। শুনেছিল একটা বিস্ফোরণে...।

মিলি অফিসের ভারী কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরোতেই দেখল,তাদেরই ফ্লোরের উলটোদিকের কর্পোরেট অফিসের কাচের দরজার ওপারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মিলি একটা লিফটের সুইচটা টিপে ঝটপট ক্যাবটা বুক করে নিল। আর ঠিক তখনই তার মাথার ওপর জ্বলতে থাকা আলোটা দপ দপ করে উঠল, আপনা থেকেই। অবাক চোখে ওপরের দিকে তাকাল সে। এই তো এতক্ষণ ঠিক ভাবে জ্বলছিল। হঠাৎ কী হল?

লিফটের দরজার মাথার ডিজিটাল সংখ্যাটা ১,২,৩ করে পালটাতে লাগল ধীরে ধীরে। বাড়িতে গিয়ে সে একটা টানা ঘুম দেবে। সারাদিন খুব ধকল গেছে! মোবাইলে খুটখুট করতে করতে এইসবই ভাবছিল মিলি এমন সময় আচমকা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল কেউ যেন খুব কাছ থেকে তাকে দেখছে। চমকে উঠে উলটোদিকের কর্পোরেট অফিসের কাচের দরজার দিকে

তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা যেন আপনা থেকেই খালি হয়ে গেল। কেউ ছিল না সেখানে, কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কাচের দরজায় একটা জায়গায় বাষ্প জমে উঠেছে। কাচের দরজার খুব কাছে দাঁড়িয়ে মুখের ভেতরের গরম ভাপ ছাড়লে যেমন হয় ঠিক তেমন।

তার মানে বন্ধ দরজার ওপারে কেউ এখানে ছিল। যে তাকে দেখছিল। ঠিক এমন সময় টুং করে একটা শব্দ আর সামনের লিফটের দরজাটা খুলে গেল। মিলি সঙ্গে সঙ্গে লিফটের মধ্যে ঢুকে ফার্স্ট ফ্লোরের সুইচটা টিপে দিল। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। লিফটের দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময় মিলি আবার এমন কিছু দেখল, যা তার হৃৎস্পন্দন ফের বাড়িয়ে দিলো। দরজাটা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই মিলির যেন মনে হল, লিফটের বাইরে দাঁড়িয়ে সাগর তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দভাবে ঘাড় হেলিয়ে টাটা করছে। সাগর? ওটা সাগরই ছিল তো? কিন্তু সাগর এখানে কীভাবে আসবে?

এসব ভাবতে ভাবতেই সে ফার্স্ট ফ্লোরে এসে পৌঁছোল। মিলি লিফটের বাইরে বেরিয়ে আসতেই একমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। গোটা ফার্স্ট ফ্লোর ঘুটঘুটে অন্ধকার আর একেবারে নির্জন। মেনগেটের কাচের দরজার মাথার একটা আলো জ্বলছে মাত্র। মিলির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ফার্স্ট ফ্লোর এরকম অন্ধকার আর ফাঁকা তো কোনোদিন হয় না। মেন দরজার কাচের পাল্লার বাইরে আলো, গাড়ি, শব্দ সব রয়েছে। কিন্তু কাচের পাল্লার এপারে সব অন্ধকার, নির্জন, শব্দহীন। নাহ, আর একমুহূর্ত এখানে না। কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে। মিলি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল মেন দরজার দিকে।

কিন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল সে... এই যে ভেতর থেকে সে দেখছিল বাইরে এতো গাড়ি, লোক চলাচল করছে অফিসের সামনের রাস্তায়। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কোথায় কী? একটাও গাড়ি নেই। একটাও লোক নেই। সকলেই যেন মন্ত্রবলে উবে গিয়েছে হঠাৎ করে। গোটা চত্বরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে একলা। একটা ভয় গ্রাস করল তাকে। আচমকা সামনের চত্বরের আলোগুলো দপদপ করতে করতে নিবে যেতে লাগল। মিলি

একমুহূর্ত দেরি না করে ছুটল রাস্তার দিকে...

কিন্তু রাস্তার অবস্থাও একই। দু'দিক থেকেই ক্রমান্বয়ে আলো নিবতে নিবতে অন্ধকার যেন গিলে খেতে আসছে মিলিকে।

এবার? এবার? কী করবে সে...? সামনেই ছিল কর্পোরেশনের একটা নিয়নবাতির আলো। মিলি গিয়ে তার নীচে দাঁড়াল। কিন্তু এই আলোও কতক্ষণ থাকবে? ওদিকে দু-দিকের সব আলো নিবে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। বাকি বলতে মাথার ওপর জ্বলতে-থাকা নিয়নবাতির আলোটা। ঠিক এমন সময় ব্যাগের মধ্যে ফোনটা বেজে উঠল।

দ্রুত হাতে ফোনটা বের করতে দেখল, ক্যাবের ড্রাইভার ফোন করেছে তাকে... সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করল, "হ্যালো, হ্যালো..."

ফোনটা কানে নিয়ে চিৎকার করে উঠল মিলি। নাহ! উলটোদিক থেকে কোনো শব্দ আসছে না।

— "হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন...?"

আর তারপরেই টুঁ টুঁ করে ফোনটা কেটে গেল। আর ফোনটা কেটে যেতেই মাথার ওপর হলুদ আলোটা দপদপ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ওই নাম্বারে রিং ব্যাক করলও মিলি। হাত পা তার কাঁপছে ঠকঠক করে।

রিং হচ্ছে... ফোনের ওপারে। ক্রিং ক্রিং... ক্রিং ক্রিং... যান্ত্রিক শব্দ। "প্লিজ! প্লিজ ফোনটা ধরো..."

ওই তো...ওই তো রিসিভ হয়েছে,

— "হ্যালো হ্যালো... হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন..." ফোনের ওপারে একটা জড়ো জড়ো করা যান্ত্রিক শব্দ...

— "হ্যালো... দাদা...কী হল দাদা জবাব দিন..."

কথাটা বলতে বলতেই মাথার ওপরের আলোটা দপ করে নিবে গেল। আর ঠিক তখনই ফোনের ওপার থেকে কেউ একজন খুব টেনে টেনে যান্ত্রিক স্বরে বলে উঠল, "হ্যালো... ইলি... মিলি..."

মিলি কথাটা শুনে এমন ভাবে শিঁউরে উঠল যে... হাত থেকে ফোনটা টুক করে ফুটপাতের ওপরে পড়ে গেল।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো বলতে পায়ের কাছে পড়ে-থাকা মোবাইলের নিম্নমুখী আলোটা।

— "ইলি মিলি!" এই নামে... এই নামে তো সাগর ডাকত তাকে... তার মানে। আচমকা মিলি টের পেল, কেউ যেন অন্ধকার ফুঁড়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অস্তিত্ব। তারপর ধীর হাতে... মোবাইলটা তুলে... সেই মোবাইলের আলো মুখের ওপরে ফেলতেই মিলির সারা শরীর প্রবল আতঙ্কে জমে গেল।

মোবাইলের আলোটা যার মুখের ওপর পড়ছে, সেটা অন্য কেউ না। খোদ সাগর। কিন্তু কী ভয়ানক লাগছে তাকে দেখতে। চোখের পুরোটাই কালো... চওড়া হাসির মাঝেই দেখা যাচ্ছে করাতের ফলার মতো ঝকঝকে দাঁতের সারি, আর তার ভেতরে লকলক করতে থাকা মাঝখান থেকে চেরা কালো জিবটা।

সাগর মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে একদিকে ঘাড় কাত করে বলে উঠল, "হ্যালো ইলি মিলি..."

প্রবল ভয়ে আর্তনাদ করে যেই দু-পা পিছিয়ে গেল মিলি, আর ওমনি ফুটপাতের ধারে পা হড়কে রাস্তার ওপরে আছাড় খেয়ে পড়ল... আর ঠিক তখনই ধক করে জ্বলে উঠল চারদিকের আলো... সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তা গিজগিজ করছে লোকজন গাড়িতে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেই দৃশ্য দেখতে হল না... মিলিকে। কারণ রাস্তার মাঝে আচমকা পড়ে যাওয়া মিলির পানে ছুটে এসেছে চলন্ত বাসের একজোড়া হেডলাইট। পরক্ষণেই একটা আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে... রাস্তায় চাকা ঘষে যাওয়ার বিকট শব্দ। আর একটা সজোরে ব্রেকের ঝাঁকুনি।

রে রে করে লোকজন জমা হল জায়গাটায়...

বেশ কিছুক্ষণ পরে, অ্যাম্বুলেন্সের লোক এসে যখন মিলিকে বাসের তলা থেকে বের করল মিলিকে, তখন দেখা গেল মিলির তন্বী শরীরটা পরিণত হয়েছে একটা রক্ত মাংসের দলায়।

অ্যাম্বুলন্সের চারিদিকে লোকজনের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে ধীরে

ধীরে একপাশে সরে এল। একজন মহিলা, একজন পুরুষ। একটু আগের তাদের ভয়ংকর চেহারার সঙ্গে এখনকার সাধারণ চেহারার কোনো মিল নেই।

পুরুষটি দু-হাত দেহের দু-দিকে প্রসারিত করে বাতাসে নাক উঁচিয়ে একটা স্বস্তির শ্বাস নিল।

তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "কাজটা এত সোজা হবে ভাবতে পারিনি। এরপর আর রঙ্কিনীর জিহ্বা স্পর্শে কোনো বাধা রইল না।"

— "আপনি বাকিদের মতো নিজের হাতে ওকে মারলেন না কেন প্রভু?" পাশে দাঁড়ানো মহিলাটি অবাক গলায় প্রশ্নটা করে উঠতেই পুরুষটির মুখে এক কুটিল হাসি ফুটে উঠল।

— "শম্ভুপাদ হলেও এটাই চাইত। আমি যাতে মিলিকে নিজের হাতে শেষ করি। আগের বারেও তাই করেছিলাম। শম্ভুপাদ চাইলে আমায় গতবারই আটকাতে পারত কিন্তু ও তা করেনি। আমায় নিজের হাতে সব কটাকে মারতে দিয়েছিল। মিলিকে নিজের হাতে মারলে আমার শক্তিক্ষয় হত। ঠিক আগের বারে যেমন হয়েছিল। আর আমি সেটা চাই না।"

— "এরপর...? এরপর কী করবেন প্রভু...?"

— "আমরা জাদুগোড়া ফিরব। এবার রঙ্কিনীর জিহ্বা সংগ্রহ করে পূর্ণশক্তিতে ফেরার পালা... বুঝলি?" কথাটা বলে উঠতেই লোকটির চোখজোড়া এক আদিম উল্লাসে চকচক করে উঠল।

(শক্তিগ্রহণ)

পশ্চিমের আকাশের সাদা মেঘটা বিকেলের পর থেকেই টের পেয়েছে বিকাশরাও।

বুঝেছিল রাত হলে বৃষ্টি নামতে পারে। পুরোহিতরা সন্ধ্যা-আরতির পর পরেই বেরিয়ে পড়েছিল। একটু আগে আকাশের বুক চিরে নীল আলোর

ফলা দেখে সে পাণ্ডেজীকে অনুরোধ করেছিল তাড়াতাড়ি হাত চালাতে। কিন্তু পাণ্ডেজীর বয়স হয়েছে। তাড়াতাড়ি বললেই কী তার আর হাত চলে তাড়াতাড়ি? সমস্ত কাজ যখন গুছিয়ে তিনি যখন মন্দিরে দরজা দিলেন তখন টিপটিপ করে বৃষ্টিপড়া শুরু হয়ে গেছে। অনেকটা পথ নির্জন রাস্তা।

রাস্তার ধারে তেমন বাড়িঘর নেই বললেই হয়। মাঝরাস্তায় বৃষ্টির প্রকোপ বাড়লে পুরোটাই ভিজতে হবে তাদের। তাই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর ঠিক তারপরেই দেখতেই দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল।

বিকাশরাও এর গলায় বিরক্তি। আর হওয়ারই কথা। পাণ্ডেজী চাইলে এতক্ষণ ঘর পৌঁছে যেত তারা। এ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে আদেও এ বৃষ্টি তাড়াতাড়ি থামবে কিনা কে জানে? আর তা ছাড়া একটু পরেই জায়গাটা জুড়ে অন্ধকার নামবে। বৃষ্টি হলে এই অঞ্চলে লোডশেডিং তো পাকা।

— "এ বিকাশ, চল আ অন্দর আ..."

— "ফিরসে তালা খোলিয়েগা?"

পুরন্দর হেসে বলল, "ইহা খড়া রাহেগা তো ভিগ জায়েগা। চল... অন্দর চল।"

পুরন্দর খানিকটা পিতার মতো শাসন করল বিকাশকে। বিকাশ আর কথা বাড়াল না। এই বৃষ্টির যা ছাট আসছে তাতে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে সত্যি ভিজে একসা হবে। তার চেয়ে মন্দিরের ভেতরে আশ্রয় নেওয়াই ভালো। রঙ্কিনীর মূল মন্দির ছাড়াও আশপাশে দু-একটা মন্দির বানানো হয়েছে ইদানীং, কিন্তু সেগুলোতে তালা খুলে আশ্রয় নিতে গিয়ে ভিজে একসা হতে হবে। আর ঠিক তখনই যা ভেবেছিল তাই হল। ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল।

পুরন্দর দেরি না করে অন্ধকারেই দরজার তালা খুলে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এল। ভেতরে তখনও প্রদীপের উজ্জ্বল আলো বিকিরণ হচ্ছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে, দমকা হাওয়ার প্রদীপের শিখাটা খানিকটা কেঁপে উঠল।

আর এমন সময় খোলা দরজার বাইরে ঠিক ওদের পেছনের অন্ধকারে কে যেন খিলখিল করে ভয়ংকরভাবে হেসে উঠল।

চমকে উঠল ওরা দু-জনেই। বিকাশরাও তাড়াতাড়ি পকেটের মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা জ্বালাতে যাবে তার আগেই কেউ একজন বৃষ্টির জমা জলের উপর ছপাক ছপাক শব্দ তুলে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল। দরজার বাইরে ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা গিয়ে পড়ছে। কিন্তু এত ভারী বৃষ্টিতে বেশিদূর চোখ চলে না। চারদিক পুরো সাদা হয়ে আছে।

বিকাশ গলা উঁচু করে চিৎকার করে উঠল, "কোউন হ্যায়?"

কিন্তু কোনো সাড়া এল না... কয়েক মুহূর্তেই চারিদিক আবার নীরব। বিকাশ অবাক হয়ে পাণ্ডেজীর মুখের দিকে তাকাল। পাণ্ডেজী নিজেও অবাক...

ঠিক তখনই আবার সেই ভয়ঙ্কর খিল খিল করে হেসে ওঠার শব্দ... সেই সঙ্গে জলের ওপর দিয়ে ছুটে পালানোর। এবার দু-জনেই ভয় পেল।

— "কোই মজাক কর রাহা হ্যায় বিকাশ।"

— "ইসসময়..?" বিকাশরাও এর গলায় সন্দেহ। মোবাইলের ফ্ল্যাশটা বাড়িয়ে সে দেখা চেষ্টা করল বাইরের দিকে কিন্তু কারোর দেখা পাওয়া গেল না। "ম্যায় দেখকে আতা হু।"

বিকাশরাওকে থামিয়ে পাণ্ডেজী বলে উঠলেন, "নহি, তু রুক। ম্যায় যাতা হু। তু লাইট দিখা।" ঠিক তখনই মন্দিরের ডান দিক থেকে ফের সেই খিলখিলে হাসি। পুরন্দর সোয়েটারটা খুলে বিকাশের হাতে দিল। ভিজে গেলে শুকানো মুশকিল হবে এই সময়। তারপর মন্দিরের এককোণে রাখা একটা লোহার শাবল তুলে নিল নিজের হাতে। কে বলতে পারে, যদি কোনো বিপদ হয়। তারপর দেরি না করে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে... বিকাশরাও এর মোবাইলের ফ্ল্যাশের আলো পুরুন্দরের পিঠে এসে পড়ছে। লোহার শাবলখানা উঁচিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরুন্দর। এদিক থেকেই খিলখিলে হাসিটা ভেসে আসছিল একটু আগেই।

— "যাদা দূর মত যাইয়ে..." মন্দিরের দরজা থেকেই চেঁচিয়ে উঠল বিকাশ কিন্তু সে বোধয় শুনতে পেল না। একটা সময় আলোর বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে সাদা বৃষ্টির ছাটের ভেতরে হারিয়ে গেলেন পুরন্দর পাণ্ডে।

— "পাণ্ডেজী...?" বিকাশ এর বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করতে লাগল।

কোথায় গেলেন পুরুন্দর? "পাণ্ডেজী?"

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা কানফাটানো প্রচণ্ড চিৎকার। পাণ্ডেজীর গলা... ভয় পেয়ে চমকে উঠল বিকাশ তারপর দৌড়ে সঙ্গে সঙ্গে পুরুন্দর যেদিকে এগিয়ে ছিল সেই দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু কোথায় পাণ্ডেজী?

— "পাণ্ডেজী..." চিৎকার করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল বিকাশ, "পাণ্ডেজী? কাঁহা হ্যায় আপ?" মোবাইলে জল পড়ছে। কিন্তু সেদিকে যেন তার ভ্রুক্ষেপ নেই। এইভাবে অনেকক্ষণ ছোটাছুটির পর যখন কোনো সুরাহা হল না তখন মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল বিকাশ রাও। পাণ্ডেজী নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন। পুলিশ থানে যেতে হবে। এসবই ভাবতে ভাবতে মন্দিরের দরজার কাছে প্রায় এসে পড়েছিল সে ঠিক এমন সময় পেছন থেকে একটা খুট্‌ করে শব্দ।

ঘুরে দেখার সময়টুকুও পেল না বিকাশ তার আগেই অন্ধকারে তার মাথার পেছনে একটা কেউ যেন জোরে কিছু দিয়ে বাড়ি মারল। পিচের রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বিকাশ। মোবাইলটা হাত থেকে ছিটকে দূরে পড়ল।

আর তখনই সেই আলোয় দেখা গেল, এক হাতে লোহার শাবলটা হাতে নিয়ে তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পুরন্দর পাণ্ডে। কিন্তু এ কে? এ তো পুরন্দর পাণ্ডে নয়।

সে আবছা আলো পুরন্দরের মুখে এসে পড়ছিল, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বিকাশ আঁতকে উঠল। গালের একপাশের মাংস কে যেন খাবলে তুলে খেয়েছে। চোখের তারা বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে। এলোমেলো, টলোমলো পায়ে এই ভাবে সে এগোচ্ছিল যেন কেউ তার কাঁধ খামচে ওপরে দিকে টেনে তুলে রেখেছে। মুখ দিয়ে গোঙানির মতো করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। পাণ্ডেজীকে বশীভূত করেছে কেউ। এ তারই ইঙ্গিত। বিকাশ মাথার পেছনে হাত দিয়ে বুঝল, রক্ত বেরোচ্ছে। পালাতে হবে। পাণ্ডেজীর হাত থেকে পালাতে হবে। কিন্তু পালানোর জন্য যেই উঠতে যাবে বিকাশ ওমনি পুরন্দর হাতের শাবলখানা দিয়ে সজোরে বিকাশের পায়ের ওপরে মারতে লাগল। লোহার বাড়ি খেয়ে পায়ের হাড়গুলো যেন গুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

তবুও পুরন্দর পাণ্ডে থামছে না।

প্রবল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বিকাশ রাও। কিন্তু সে চিৎকার এই নির্জনে শোনার মতো কেউই ছিল না। ঠিক এইরকম যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বিকাশ দেখল একখানা শরীর অন্ধকার ফুঁড়ে ঠিক তার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। মন্দিরের ভেতরে জ্বলতে থাকা প্রদীপের ঈষৎ আভা লোকটির মুখে এসে পড়ছে। আর সেই মুখ দেখে ওই প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও আতঙ্কে শিউরে উঠল বিকাশ। এ কে? এ মানুষ না কোনো অপদেবতা?

ওদিকে বিকাশের দুই পায়ে প্রবল যন্ত্রণা। তার মনে হচ্ছে, সে আর পারবে না এই যন্ত্রণা সহ্য করতে। এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ঠিক সেই সময়ই বিকাশরাও এর কানে এল পায়ের দিকের অন্ধকার থেকে ভেসে আসা এক মন্ত্রমোহী শিসের শব্দ। আর তারপরেই এক দমবন্ধকরা বিকট মাংস পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। বিকাশরাও আর পারল না এসব নিতে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে সে দেখতে পেয়েছে, তিনখানা হায়না ঝকঝকে দাঁতের পাটি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তাদের গলার ভেতর থেকে জান্তব গরগর চাপা আওয়াজ। মড়ন্তিকার অবিনাশী হায়না। এরা দীর্ঘদিনের বুভুক্ষ। আজ এদের ভোজ খুব ভালো করেই সমাপন হবে।

* * * * * * * *

রঙ্কিনীর মন্দিরের দরজা হাট করে খোলা।

বৃষ্টির বেগ কমেছে বেশ কিছুক্ষণ। দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সাগর, আর মড়ন্তিকা। প্রদীপের আলোয় রঙ্কিনীর পাথুরে বিগ্রহটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের পেছনেই পীচরাস্তার ওপরে পড়ে রয়েছে বিকাশরাও এর আধখাওয়া মৃতদেহটা। যেটা খুব দ্রুততার সঙ্গে খুবলে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে মড়ন্তিকার হায়নারা।

— "প্রভু এরপর?"

— "এরপর...?"

কথাটা বলেই আকাশের দিকে মুখ তুলে গলার ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বের করল সাগর। খানিকটা সাপের শিসের মতো। কিন্তু ভীষণ টেনে টেনে। বিকাশরাও এর পায়ের হাড়খানা গুঁড়ো গুঁড়ো করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল পুরন্দর পাণ্ডে। ভাবখানা এমন ছিল যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল সে...

আচমকা সাগরের গলার আওয়াজ পেয়ে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল সে। তারপর একই ভাবে টলমল পায়ে এগিয়ে এল সাগরের দিকে। সাগর এক অবোধ্য ভাষায় কী একটা নির্দেশ দিতেই সে দেরি না করে একইরকমভাবে টলোমলো পায়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করল। মন্দিরের ভেতরে তাকে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে দেখেই সাগরের ঠোঁটের কোলের কুটিল হাসিটা আবার ফিরে এল।

সাগর জানে মেঝের ঠিক কোন জায়গায় শম্ভুপাদ রেখেছিল রঙ্কিনীর জিহ্বাটিকে। পুরন্দরকে সে ঠিক সেই জায়গাটিই খুঁড়ে দেখতে নির্দেশ দিল। পুরন্দর এখন সম্পূর্ণরূপে তার বশীভূত হলেও সে এখনও মানুষই। তাই সে নির্দ্বিধায় মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে। আর এই মুহূর্তে সেটাই তো সাগরের দরকার...

ঠং করে একটা আওয়াজ হল। দেবী বিগ্রহের সম্মুখেই পুরন্দর পাণ্ডে মেঝেখানা খুঁড়তে শুরু করেছে লোহার শাবলখানা দিয়ে। পুরন্দর পাণ্ডে বয়স্ক হলেও এইমুহূর্তে সে কেল্লকেশীর শক্তি দ্বারা বশীভূত। তার মধ্যে এখন ভর করেছে আসুরিক ক্ষমতা। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হল না, অচিরেই মন্দিরের মেঝেতে একটা গর্ত দেখা গেল।

চিৎকার করে উঠল মড়ন্তিকা, "তোল... তোল... জিনিসটা তুলে নিয়ে আয়..."

কিন্তু সেই নির্দেশে কাজ হল না, পুরন্দর পাণ্ডে বাসি মড়ার মতো ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মড়ন্তিকার দিকে। ঠিক তখনই সাগরের গলা ঠেলে বেরিয়ে এল, আবার সেই হিসহিসে স্বর। সঙ্গে সঙ্গে

কাজ হল।

পুরন্দর পাণ্ডে গর্তে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একখানা লাল শালুর মোড়ক। যা থেকে এক উজ্জ্বল নীলচে সবুজ আভা বেরিয়ে আসছিল।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওদের দিকে। কিন্তু আচমকাই পুরন্দর সেই মোড়কটা সাগরকে দেওয়ার বদলে মড়ন্তিকার দিকে বাড়িয়ে দিল।

চমকে উঠে এক-পা পিছিয়ে গেল মড়ন্তিকা।

এটা যদি সত্যই রঙ্কিনীর জিহ্বা হয়, আর গর্ভপ্রাচীরের সকল বেষ্টনী যদি ধ্বংস হয় তাহলে সে এটাকে সহজেই ধরতে পারবে। কিন্তু যদি গর্ভপ্রাচীরের সকল বেষ্টনী যদি না ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে? যদি কেউ একজনও জীবিত রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো সেটা এটা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাথর হয়ে যাবে।

মড়ন্তিকা বুঝল পুরন্দর এটা কল্লকেশীরই নির্দেশেই তার দিকে বাড়িয়েছে। এতে করে একসঙ্গে দুটো জিনিস হবে। সত্যি এটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিপদ হয় তাহলে সেই বিপদ সরাসরি আঘাত করবে মড়ন্তি কাকে। সাগর নিরাপদে থাকবে। আর যদি সত্যি এটা হয় তাহলে অষ্টমগর্ভ সম্পর্কিত ভুল তথ্য পরিবেশনের শাস্তিটাও সেই ভোগ করবে।

— "কী হল? ধর..."

সাগরের মুখটা আচমকা গম্ভীর হয়ে উঠল।

— "প্রভু... না মানে আমি। আমি কেন?"

— "অষ্টমগর্ভের খবর তুই এনেছিলি না? আমি সেই খবরের সত্যতা যাচাই করছি শুধু। নে... এবার এটা ধর। আমার হাতে নষ্ট করবার সময় নেই।"

মড়ন্তিকা কাঁপা কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে জিনিসটা ধরল। আর সত্যি সত্যি তার দেহের কোনো পরিবর্তন হল না। সাগর দ্রুত তার হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিল। গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ভয়ংকর অট্টহাসি।

— "এতদিন? এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সমাপ্ত হয়েছে। আমি আবার আমার শক্তি ফিরে পাব। হাঃ হাঃ হাঃ!" আর তখনই একটা অবাক করা কাণ্ড ঘটল। রঙ্কিনীর পাথরের বিগ্রহ থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকস্রোত বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করল পুরন্দর পাণ্ডেকে। ক্ষণিকের মুহূর্ত

মাত্র, একটা গগনভেদী তীব্র আর্তনাদ আর চোখের পলকে ছাই হয়ে মেঝেতে পড়ে রইল পুরন্দর পাণ্ডে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মড়ন্তিকা আর সাগর দু-জনেই অবাক।

— "এটা কী হল?" কয়েক মুহূর্ত পর মড়ন্তিকা অবাক গলায় প্রশ্নটা করে উঠতেই সাগর বলল, "তোর কী মনে হয় শম্ভুপাদ কোনো সুরক্ষা বলয় ছাড়া এমনি এমনি এই রঙ্কিনীর জিহ্বা এখানে রেখে যাবে? ওই গর্ত থেকে যেই তুলবে এই জিহ্বাকে সে সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

মড়ন্তিকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভাগ্যিস প্রভু তাকে জিহ্বার খণ্ড তুলে আনতে বলেননি। নইলে সেও পুরুন্দরের মতো...

ওদিকে সাগর ততক্ষণে লাল শালুর মোড়ক খুলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু কয়েকটা ভাঁজ খোলার পরেই শালুর মোড়কের ভেতর থেকে কী একটা ছোট কালো মতো সাগরের হাতে উঠে আসতেই সাগর আলগোছে সেটা রঙ্কিনীর মূর্তির দিকে ছুড়ে দিল।

তারপর আরো দু-তিনটে ভাঁজ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই... বেরিয়ে এল কালো জিহ্বার টুকরোটা।

একটা কুটিল হাসি খেলে গেল, সাগরের চোখে মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই তার কপালের ভাঁজ দৃঢ় হল। রঙ্কিনীর জিহ্বা তো সোনার আর বেশ বড় ছিল। এটা এত... ছোট কেন? কী করেছে শম্ভুপাদ এর সঙ্গে?

ভাবতে না ভাবতেই আবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। লাল শালুর মোড়ক থেকে বের করে রঙ্কিনীর জিহ্বাটিকে সাগর হাতের তালুর মধ্যে ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা নীল আলোকবিন্দু জিহ্বার খণ্ড থেকে বেরিয়ে সাগরের বুকের ভেতরে প্রবেশ করল আর ঠিক তখনই সাগরের চোখের সামনে সিনেমার মতো ফুটে উঠল একাধিক দৃশ্য। তারপর একটার পর একটা দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে লাগল আপনা থেকেই।

বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃশ্যপট গুলো আপনা হতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারপরেই প্রচণ্ড রাগে দাঁত দাঁত ঘষে চিৎকার করে উঠল সাগর,

"শম্ভুপাদ!"

ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল মড়ন্তিকা। এই তো প্রভু খুশি ছিলেন জিহ্বা পেয়ে। তাহলে কী এটাও আসল জিহ্বা নয় আগেরবারের মতো?

— "কী হয়েছে প্রভু? এটাও কী আগেরবারের মতো আসল জিহ্বা নয়?"

সাগর চোয়াল শক্ত করে বলে উঠল, "নাহ। এটা আসল জিহ্বা। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ জিহ্বা নয়।"

— "সম্পূর্ণ জিহ্বা নয়?" মড়ন্তিকা অবাক, "মানে?"

— "শম্ভুপাদ আসল জিহ্বাকে আটটা খণ্ডে ভেঙে রঙ্কিনীর আট পীঠে লুকিয়ে রেখেছে। আমরা সবেমাত্র একটা পেয়েছি। এখনও বাকি সাতটা। সমস্ত খণ্ডগুলো না পেলে আমি কোনোদিন পূর্ণশক্তি পাবো না।"

মড়ন্তিকা ভয় পাচ্ছে। সে টের পাচ্ছে প্রভু ধীরে ধীরে রেগে যাচ্ছে, "তাহলে... তাহলে এখন উপায়?"

— "বাকি সাতটা খণ্ড সংগ্রহ করতে হবে।"

— "সংগ্রহ যখন করতেই হবে। তখন আর দেরি কীসের? চলুন সেগুলোকে সংগ্রহ করি..." মড়ন্তিকা সগোক্তির সুরে কথাটা বলে উঠতেই, সাগর বলে উঠল, "না। তুই যাবি না। ওই খণ্ডগুলো জোগাড় করে আমিই আনব।"

— "আর আমি?" মড়ন্তিকা অবাক, "আমি কী করব প্রভু?"

— "যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যারা লুকিয়ে আছে তাদের টেনে বার কর। যারা এতদিন অপেক্ষা করছে তাদের গিয়ে বল প্রভু ফিরছে খুব তাড়াতাড়ি তার পূর্ণশক্তি নিয়ে। সবার প্রথমে রঙ্কিনীর এই মন্দির ধ্বংস করব। এই মন্দির ধ্বংস হলে রঙ্কিনীও ধ্বংস হবে। আর রঙ্কিনী ধ্বংস হলে তবেই লোকেরা আমার ক্ষমতায় ভয় পেয়ে আমার পুজো করবে।"

ওরা দু-জন ভবিষ্যতের পরিকল্পনার এতই বিভোর হয়ে রইল যে কেউই খেয়াল করলও মন্দিরের ভেতরে খুব অলক্ষ্যে একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। লাল শালুর মোড়কে পাওয়া কালো টুকরো যেটাকে সাগর আবর্জনা ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেটা খুব মৃদু একখানা জ্যোতি বিকরণ করে মন্দিরের বায়ুতে বিলীন হয়ে গেল।

(সপ্তজিহ্বার সন্ধানে)

সময় ভোর তিনটে।

সন্ধ্যে থেকেই যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখনও থামার কোনো লক্ষণ নেই। তবে মাঝে বৃষ্টির বেগ কমে ছিল। তখন মনে হয়েছিল বৃষ্টিটা থেমে যাবে, কিন্তু কোথায় কী? আধঘণ্টা আগে আবার শুরু হয়েছে। ঘাটশিলার রঙ্কিনী মন্দিরের উলটোদিকে চারখানা বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশের একখানা চালা। চালার নীচে একখানা ঠেলাগাড়ি। এই চালাটি জয়রামের। ঠেলাগাড়িটিও তারই। এই ঠেলা গাড়িতে করে জয়রাম চা, আর নিরামিষ কচুরি তরকারী বিক্রি করে। দিনের বেলা সে ঠেলা গাড়িটাকে বাইরে বের করে দেয় চালার ভেতর থেকে। ভেতরে তখন তিনখানা বেঞ্চি পাতা থাকা। খদ্দেররা ওতে বসেই খাওয়া দাওয়া করে। রাত হলেই বেঞ্চিগুলোকে জড়ো করে ঠেলাখানা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

শনি, মঙ্গলবার আর অমাবস্যায় মন্দিরে খুব ভিড় হয়। পুজো দিয়ে ফেরার পথে লোকেরা তার দোকানে ভিড় জমায়। আগে এখানে একটাই দোকান ছিল। ইনকাম ভালই হত। ইদানীং তার দেখাদেখি তার পাশাপাশি আরো দু-তিনটে দোকান হওয়ায় ইদানীং উপার্জন কিছুটা কমেছে।

রাস্তার নিয়ন বাতির আলোয় মন্দিরের সামনেটা ভালোই পরিষ্কার। জয়রাম ছাতা মাথায় দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। বিকেল থেকেই বৃষ্টির একটা আন্দাজ পাচ্ছিল জয়রাম। তাই চালাখানা চারদিক থেকে ভালো করে ত্রিপল দিয়ে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। সে ছাতাটাকে ঘাড়ে চেপে ত্রিপলের দড়িগুলো আলগা করতে লাগল। আজ এত জোরে বৃষ্টি পড়ছিল দেখে বউ বারণ করেছিল। বলেছিল রোজকার মতো ভোর তিনটায় উঠে দোকানের উনুন নাই বা ধরালে। কিন্তু এ তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ঘড়িতে আড়াইটা বাজলে আর তার ঘুম ধরে না। রঙ্কিনী মাতার কৃপায় মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা লেগেই থাকে সব সময় কিন্তু আজ শনিবার। ভিড় একটু বেশিই হবে। আজ কী তার শুয়ে থাকলে চলবে? তাই স্নান সেরে হনুমান চালিশা

পাঠ করে ছাতা মাথায় দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে।

নিয়নবাতির হলুদ আলোয় বৃষ্টিমাখা রাস্তাটা বড়ই খাঁ খাঁ করছে। জয়রাম মুখে হনুমান চালিশার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ত্রিপলের বাঁধনগুলো আলগা করছিল, ঠিক এমন সময় রাস্তার সবকটা নিয়নবাতি একসঙ্গে দপ দপ করে উঠল।

চমকে পেছন ঘুরল জয়রাম। কী হল এটা? এতক্ষণ তো ঠিক জ্বলছিল।

তার দোকানের উলটোদিকেই মন্দিরের উঁচু প্রাচীর আর বিশালবড় মন্দিরের ফটকখানা। ফটকের মাঝখানে উঁচু লালরঙের একখানা লোহারগেট। আলোর থামগুলো রাস্তার উলটোদিকে মন্দিরের প্রাচীরের গা ঘেঁষে। জয়রাম অবাক হয়ে আলোগুলোর দিকে তাকাল, সব ক'টা এক সঙ্গে এভাবে জ্বলছে-নিবছে কেন?

ঠিক এমন সময় তার চোখ আটকে গেল মন্দিরের বড় লালগেটের কাছে।

একটা লোক মন্দিরের গেটের বাইরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমনিতে এটা দেখে খুব একটা অবাক হত না জয়রাম। বহুলোক থাকে যারা ব্যস্ততায় মন্দিরে ঢোকার সময় পায় না। তারা গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই প্রণাম সেরে বিদায় নেয়। কিন্তু এই লোকটি, ছাতা না নিয়ে এই ঝমঝমে বৃষ্টি উপেক্ষা করে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কী করছে? ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল জয়রামের। এর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো...

গেটের পাশেই সিকিউরিটি দীনদয়ালের অফিস। মালটা চেয়ারে বসে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। জয়রাম, ঠেলার পাশ থেকে একটা লাঠি তুলে পা পা করে এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। গিয়ে জিজ্ঞেস করেই দেখা যাক যাক না...

লোকটার কাছে যেতেই জয়রাম বুঝল লোকটা বেশ লম্বা চওড়া। কিন্তু ওর দিকে পিছন ঘুরে থাকার জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না।

"ওহ, ভাই, ক্যায়া চাহিয়ে। এইসে বারিস মে ভিগ কাহে রহে হো?"

জয়রাম চিৎকার করে প্রশ্ন করল। কিন্তু লোকটির তরফ থেকে কোনো উত্তর এল না। ওদিকে আরো ভয়ঙ্কর ভাবে দপ দপ করে উঠল রাস্তার

আলোগুলো।

জয়রাম আবার চিৎকার করল। "ওহ্ ভাই, জবাব কাহে নহি দেতে, ব্যাহরে হো কা?" না। একই ভাবে নিরুত্তর লোকটি। জয়রাম নিশ্চিত হল। নির্ঘাত এর কোনো খারাপ উদ্দেশ্য রয়েছে।

সে হাতের লাঠিখানা তুলে লোকটার পেছনে একটা খোঁচা দিল, "এই নিকলো... নিকলো ইহা সে..." কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না, তার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে সাগর। উফ! কী বিভৎস হয়ে যাচ্ছে তাকে দেখতে।

সাগরের ভয়ংকর চেহারা দেখে হাতের লাঠি ফেলে গোঁ গোঁ করে গুঙিয়ে উঠল জয়রাম। কিন্তু কিছু বলাবার বা করবার আগেই রাস্তার সবকটা আলো একসঙ্গে নিবে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হল।

* * * * * * * *

— "দে... দে... দে ওটা ছুঁড়ে দে। ছুঁড়ে দে আমার দিকে।" মন্দিরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সাগর পাগলের হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর ভেতর কার কুৎসিত রূপটা আর কোনোভাবেই ওর বাইরের আবরণ ঢাকতে পারছে না। কিন্তু ভেতরে জয়রামের অবস্থা তখন শোচনীয়। বশীভূত জয়রাম কল্লকেশীর পরিকল্পনা মতোই মন্দিরের গৃহগর্ভ খুঁড়ে বের করে তুলে এনেছিল আরেকটা আলোকিত লালশালুর মোড়ক। দেবীর জিহ্বার দ্বিতীয় খণ্ডটি। কিন্তু মোড়কটি গহ্বর থেকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই গহ্বরের ভেতর থেকে একখানা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে ঘিরে ধরল জয়রামকে। কয়েকমুহূর্ত মাত্র, তারপরেই সেই কালো ধোঁয়া আপনা থেকেই উবে গেলে দেখা গেল প্লাস্টিকের জিনিস আগুনে পোড়ালে যেমন গলে যায়, তেমনই জয়রামের সারা শরীরের মাংস যেন গলে যাচ্ছে, শুধু গলছে না শরীর থেকে মাংস খসে খসে পড়ছে। আর সেটা হতেই একটা ভয়ংকর চিৎকার বেরিয়ে এল জয়রামের গলা চিরে।

জয়রাম মন্দিরের বাইরে বেরোতে না পারলে সাগর কখনোই জিহ্বা-খণ্ডটি

সংগ্রহ করতে পারবে না, তাই তাকে শেষ হয়ে যেতে দেখে সাগর দরজার কাছে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে উঠল। সে জানত, আটটি জায়গার মধ্যে এই দুটি পীঠেই রঙ্কিনীর সক্রিয় বসবাস। বাকি ছ-টি পীঠ পরিত্যক্ত। তাই শম্ভুপাদের রক্ষাকবচ এই দুটো পীঠেই কার্যকরী। কিন্তু এখন কী হবে?

দেখতেই দেখতে জয়রামের শরীরের হাড় মজ্জা মাংস গলে মেঝেতে জমা হল, আর তার হাত থেকে গড়িয়ে রঙ্কিনীর জিহ্বা-খণ্ডটা মন্দিরের গৃহগর্ভের মেঝেতে পড়েই আলো বিকরণ করতে লাগল।

প্রবল রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ঘষতে লাগল সাগর। কিছু একটা করতেই হবে। ওই জিহ্বা-খণ্ডটি এক্ষুনি তার চাই। কিন্তু সে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। তাহলে উপায়?

ঠিক এই সময় ডান দিকে গেটের পাশের সিকিউরিটি রুমের দিকে নজর পড়ল তার। ছোট্ট রুমের ভেতরে সাদা রঙের এলইডি একখানা আলো জ্বলছে।

সেই আলোয় দেখা গেল ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মন্দিরের সিকিউরিটিগার্ড দীনদয়াল। মন্দিরে ঢুকেই বশীভূত জয়রাম যাকে সবার আগে নিকেশ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রূর হাসি খেলে গেল সাগরের ঠোঁটের কোলে। সিকিউরিটি অফিসের দিকে হাত বাড়িয়ে একখানা বিশেষ মুদ্রা করতেই, সঙ্গে সঙ্গে শূন্যেই উঠে দাঁড়ালো দীন দয়ালের মৃত শরীরটা। তারপর ধীরে ধীরে টলোমলো পায়ে সাগরের কাছে এগিয়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে সেই জিহ্বার মোড়কটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সাগরকে নিজে প্রবেশ করতে হল না মন্দিরের ভেতরে। মৃত দীন দয়ালের নির্জীব শরীরটাকে কাজে লাগিয়েই সে বের করে আনল রঙ্কিনীর জিহ্বার দ্বিতীয় খণ্ড।

রঙ্কিনীর জিহ্বার লালশালুর মোড়ক খুলতেই সে আবার পেল সেই একইরকম কালো বস্তু। সাগর বুঝতে পারল না এটা কী? সে আবার সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিল মন্দিরের গৃহগর্ভে। লালশালুর মোড়ক উন্মোচন করে, রঙ্কিনীর জিহ্বা-খণ্ডটিকে হাতের তালুতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে একটা

নীল আলোকবিন্দু রঙ্কিনীর জিহ্বার ভেতর থেকে বেরিয়ে সাগরের বুকের মধ্যে মিশে গেল। আর আলোকবিন্দুটা সাগরের শরীরে মিলিয়ে যেতেই সাগর যেন নতুন করে নিজের মধ্যে এক আসুরিক শক্তি টের পেল।

ওদিকে ভোরের আলো ফুটতে যায়। সাগর দ্রুত মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে একেবারে। কিন্তু রাস্তার আলোগুলো এখনও জ্বলছে না। সাগর আকাশের পানে মুখ তুলে একটা জোরে শ্বাস নিল। দুটো জাগ্রত পীঠ থেকে সে রঙ্কিনীর মুখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তার শক্তিঅঙ্গ। এই দুটো পীঠ এখন শক্তিঅঙ্গের অভাবে শক্তিহীন। হঠাৎ সাগরের নিজেকে বিজয়ী বলে বোধ হতে লাগল দীর্ঘদিন পরে। এরপরের লক্ষ্য ডাইনিটিকরির পীঠ। ওখানে আশাকরি খুব একটা অসুবিধে হবে না। কথাটা ভেবেই মনে মনে একবার হেসে নিল সাগর। তাকে এবার আটকাবে, এমন সাধ্যি কার আছে?

* * * * * * * *

অন্ধকার নির্জন রুক্ষ প্রান্তর। স্থানীয়রা বলে এই প্রান্তর নাকি অভিশপ্ত। সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ এই প্রান্তরে। রাত হলেই নাকি এই প্রান্তরের মাঝে মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে প্রেতপর্বত নামের এক সুউচ্চ টিলা। যেখানে বসবাস করে রাঢ়ভূমের শতাব্দীপ্রাচীন প্রেত সাধক গুণীনেরা। এরা ভয়ংকর ধূর্ত, শঠ আর লোভী। এদের থেকে কেউ কিছু জানতে চাইলে তার জন্য দ্বার প্রবেশের মূল্য হিসেবে খুব অমূল্য কিছু নিবেদন করে এদের তুষ্ট করতে হয়।

অন্ধকার রাত্রি। মাথার ওপর কালো ঘন মেঘের জটা। চতুর্দিক এতই ঘুটঘুটে অন্ধকার যে একহাত দূরের বস্তুও এই অন্ধকারে ভালো করে ঠাওর করা যায় না। এইরকম এক পরিস্থিতিতে অন্ধকার প্রেত পর্বতের চূড়ায় ভাঙা আশ্রমের মুখে হাজির হয়েছে মড়ন্তিকা। সেই সঙ্গে ওর অবিনাশী তিন হায়না। মন্দিরের চূড়ায় পা রাখার সাথে সাথেই ভাঙা আশ্রমের প্রধান ফটক আপনা থেকেই খুলে গেল ঘড়ঘড় শব্দ করে। দরজা ফাঁক হতেই দেখা গেল দু-জন

সম্পূর্ণ উলঙ্গ মানুষ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার চৌকাঠে। সারা অঙ্গে ঘা, খোশপাঁচড়া ওঠা মানুষ দুটি মড়ন্তিকাকে দেখেই খনখনে গলায় বলে উঠল,

— "এসো মড়ন্তিকা। কিন্তু দ্বার প্রবেশের মূল্য কী?"

মড়ন্তিকা জানে এই পর্বতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সে শক্তিহীন হয়ে গিয়েছে। এই পর্বতে কেবল প্রেত সাধকদের শক্তি খাটে। এদের কে ঘাঁটালে চলবে না। অন্য কোথাও হলে এদের দ্বার প্রবেশের মূল্য চাওয়া জন্মের মতো খুঁচিয়ে দিত।

— "আমি কিছু জানতে আসিনি।" তার কণ্ঠে যথেষ্ট দৃঢ়তা। "একজনের হয়ে একটা খবর তোমাদের জানাতে এসেছি।"

দু-জন প্রেত সাধক একে অপরের মুখের দিকে তাকাল একবার তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "এসো আমাদের পিছনে।" কিছুক্ষণ পরে মড়ন্তিকাকে দেখা গেল ভাঙা আশ্রমের উঠোনে নতজানু হয়ে বসে থাকতে। সার দিয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাকি প্রেত সাধক গুনীনেরা।

— "বল।" ওর সামনেই দাঁড়ানো একজন প্রেতসাধক কথাটা বলে উঠল। হাবেভাবে তাকেই গুনীণদের দলপতি গোছের লাগছে। "কার হয়ে কী বলতে এসেছ?"

— "আমি মহান প্রভু কল্লোকেশীর তরফ থেকে বার্তা এনেছি, তিনি খুব শীঘ্রই নিজের পুরোনো চেহারায় ফিরতে চলছেন। আর ফিরলেই তাঁর প্রধান কাজ থাকবে রঙ্কিনীর মন্দির ধ্বংস। এই কাজের জন্য তিনি নিজের অনুগত সেনানী বানাচ্ছেন। তোমরা, প্রেত পর্বতের প্রেত সাধকেরা তার এই সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তার চিরকালীন আনুগত্য লাভ করো। এতে সর্বদা প্রভুর কৃপাদৃষ্টি তোমাদের ওপরে বর্ষিত হতে থাকবে।"

কথাটা বলা শেষ করতেই চারদিকে যেন একখানা মৃদু গুঞ্জন উঠল। বোঝা যাচ্ছে শেষের কথাটা ওরা কেউই ভালো ভাবে নেয়নি।

— "তোমার এত বড় সাহস..." সেই প্রধান প্রেত সাধক রাগে কেঁপে উঠল যেন, "তুমি আমাদের আশ্রমে দাঁড়িয়ে আমাদের কে এই কথা বলো।"

ভয় পেল মড়ন্তিকা। এরা চটলে বিপদ ভারী। গলা স্থির রেখে কোনোরকমে বলে উঠল, "আমি শুধুমাত্র একজন দূত। আসল বার্তা প্রভুর।"

— "তোমার প্রভুকে গিয়ে বলে দাও... এই রাঢ়ভূমের শতাব্দীপ্রাচীন প্রেত সাধক আমরা... আমরা কখনওই কারো আদেশে কাজ করি না।"

— "বেশ, আমি তোমাদের শেষ ইচ্ছের কথা জানিয়ে দেব প্রভুকে....।"

— "সেই সঙ্গে ওকে এটাও জানিয়ে দিও... রঙ্কিনীর মন্দির ধ্বংস করা সোজা হবে না ওর জন্য।" প্রেত সাধকদের মধ্যে আরেকজন কথাটা বলে উঠতেই মড়ন্তিকা অবাক চোখে তাকাল ওদের দিকে।

— "রঙ্কিনীর বিগ্রহ শক্তিহীন। ওর সমস্ত অনুগতরা কালের নিয়মে শেষ হয়ে গিয়েছে। রঙ্কিনীর শক্তিঅঙ্গ রক্ষা করছিল যে অষ্টম গর্ভের রক্ত সে-ও মারা গিয়েছে প্রভুর কৃপায়, প্রভু এক এক করে সবকটা জিহ্বা সংগ্রহ করছেন। সবকটি জিহ্বা সংগ্রহ হলেই তিনি পূর্ণশক্তি ফিরে পাবেন..."

— "কখনও ভেবে দেখেছ, সবকটা জিহ্বা গ্রহণ করলেই যদি কল্লকেশী পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসবে... তাহলে ও রঙ্কিনীর মন্দির এত মরিয়া হয়ে ধ্বংস করতে চাইছে কেন? আদপেই কী আক্রোশ? নাকি অন্য কোনো গূঢ় কারণ আছে?" একজন প্রেত সাধক কথাটা শেষ করতেই আরেকজন বলে উঠল, "তোমার কপালে খুব দ্রুত একই সঙ্গে অবমাননা আর কল্লকেশীর সমান শক্তিশালী হয়ে ওঠার যোগ দেখতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু সেই শক্তি কীভাবে লাভ করবে তুমি?"

— "কল্লকেশীর সমান শক্তিশালী?" নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মড়ন্তিকা, "কীভাবে? কীভাবে হব? আমি প্রভুর সমান শক্তিশালী?"

মড়ন্তিকার মরিয়া হয়ে প্রশ্নকরার ভঙ্গি দেখে প্রেত সাধকেরা খিল খিল করে এক পৈশাচিক ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

— "কিছু মূল্য না দিয়েই এসব কথা জেনে নেবে..." প্রধান প্রেত উপাসক নেমে দাঁড়াল তার মুখোমুখি।

— "কী চাও? কী চাও তোমরা? কী দিলে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে? আমার কাছে এখন দেওয়ার মতো কিছুই নেই"

প্রেত উপাসক মড়ন্তিকার থেকে চোখ সরিয়ে ওর পিছনের দিকে তাকাল। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ওর তিনখানা অবিনাশী হায়না।

— "আছে। দেওয়ার মতো আছে তো। তোমার তিনখানা অবিনাশী হায়নার মালিকানা..." কথাটা বলেই প্রেত উপাসকের বিশ্রী মুখে একখানা কুটিল হাসি খেলে গেল, "সেটা দিয়ে দাও তুমি আমাদের..."

* * * * * * * *

ময়নাগড় রাজবাড়ির এদিকের অংশটা বেশ খানিকটা ভাঙাচোরাই বলা চলে।

বন আগাছায় পরিপূর্ণ জায়গাটা জুড়ে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। রাজবাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারীরা রাজবাড়ির এদিকের অংশটা তেমন ব্যবহার করেন না। তাঁরা রাজবাড়ির একাংশ সংস্কার করে বর্তমানে বসবাস করছেন। রাজাবাড়ির এদিকে লোকেদের তেমন যাতায়াত না থাকলেও ভাঙাচোরা গড়ের বিভিন্ন জায়গায় দামি পাথরের তৈরি মূর্তি আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। সেগুলি চোরেদের অনুকপম্পায় লুঠ না হয়ে যায় তাই রাজবাড়ির এদিকটা পাহারা দেওয়ার জন্য দু'জন সিকিউরিটি গার্ড মোতায়ন করা হয়েছে। তারা দিনে ও রাত্রে যথাক্রমে পালা দিয়ে এদিকটা পাহারা দেয়।

আজ রাত্রে রাজবাড়ির এই অংশে পাহারার দায়িত্ব সনাতন বাউরীর। সনাতন বাউরীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলে কী হবে? পেটানো চেহারা বলিষ্ঠ, হাত পা দেখলে সে কথা মালুমই হয় না।

পাঁচ সেলের টর্চটা হাতে নিয়ে সামনের উঠোনে নেমে দাঁড়াল সনাতন। ঠিক এমন সময় বিদ্যুৎ-এর ঝিলিকে চারদিক যেন সাদা হয়ে গেল, তার তারপরেই কান ফাটানো একখানা বাজপড়ার শব্দ। সনাতন আকাশ পানে মুখ তুলে দেখল মাথার ওপরে কালো মেঘের ঘনঘটা। গত কয়েকদিন ধরেই আকাশের মুখ ভার ছিল, কিন্তু বিকেলের পর যেন একটু বেশিই খারাপ হতে শুরু করেছে। রাতে বৃষ্টি নামবে নাকি?

গায়ের শালটা ভালো করে জড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সনাতন।

ঠিক এমন সময় চোখে বিভ্রম দেখার মতো থমকে দাঁড়াল সে। জায়গাটা গড়ের ভিতর হলেও বেশ একটা বড় চত্বর। এই চত্বরেরই একপাশে, গড়ের সবচেয়ে প্রাচীন দেবতা শ্রী শ্রী লোকেশ্বর জিউ-এর মন্দির। মন্দিরের বাইরে টেরাকোটার কাজের টানে বহু দূর দূর হতে পর্যটকেরা আসে। এই শিবমন্দিরে শ্রী শ্রী লোকেশ্বর ছাড়াও, রঙ্কিনী নামের এক কালী মূর্তি অবস্থান করছে। লোকে বলে, শতাব্দীপ্রাচীন আগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাউসেন নাকি এই দেবীকে নিজের হাতে পুজো দিতেন। সনাতনের অবশ্য এসবে আগ্রহ কম। সে জানে এটা রাজ পরিবারের বানানো শিবঠাকুরের থান। যেখানে সন্ধ্যার পর রাজবাড়ির গেট লাগানো হয়ে গেলে কোনোরকম ভাবেই সাধারণ লোকজন ঢুকতে পারে না।

এই মুহূর্তে মন্দিরের সামনে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছে। কিন্তু সেই কম আলোতেও সনাতন দেখল একটা লোক ধীরে ধীরে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল। এখন এখানে কে থাকবে? সে কী সত্যি কাউকে দেখল? নাকি এ শুধু তার বিভ্রম...

মন্দিরের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে এক ফুল বেলপাতায় ঢাকা শিবলিঙ্গ। তারই সামনে টিমটিম করে জ্বলছিল একখানা শ্বেতপাথরের প্রদীপ। সেই আলোয় কিছুটা আভা মন্দিরের গৃহগর্ভে ছড়িয়ে পড়েছে। দরজা ঠেলে সাগর মন্দিরের ভিতরে ঢুকতেই সেই আলোয় আভায় সাগরের চেহারাটা ফুটে উঠল।

সারা শরীরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে ইতিমধ্যেই। শরীরের পুরুষালী পেশীগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠেছে। চেরা জিবখানা থেকে থেকেই সাপের জিবের মতো মুখের বাইরে বেরিয়ে আসছে। বোঝাই যায় এই কয়েকদিনে সে যা শক্তি আহরণ করেছে তা তাকে একটু একটু করে পালটে ফেলছে কল্লকেশীতে। অবশ্য এই পরিবর্তন তো হওয়ারই কথা। রঙ্কিনীর সাতখানা জিহ্বা খণ্ডর শক্তিই এখন তার অধীনে।

এখন বাকি শুধু এই শেষ জিহ্বাটি সংগ্রহ করা।

তবে শুনতে যতটা সোজা লাগছে ব্যাপারটা ছিল ঠিক ততোটাই ভয়ংকর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন হয়েছে সাগর প্রায় মরতে মরতে বেঁচেছে। জাদুগোড়া আর ঘাটশিলার পীঠে রঙ্কিনীর অবস্থান ছিল, তাই সেখানে শক্তিঅঙ্গের পাহারায় শম্ভুপাদের নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল। কল্লকেশী ভেবেছিল বাকি পীঠগুলো হয়তো বেষ্টনী মুক্ত থাকবে। আর সেটাই ছিল তার ভুল। রঙ্কিনী নিজে ওইসব স্থানে অবস্থান না করলেও সেই সব পীঠের পাহারায় এমন কিছু ছেড়ে এসেছিল, যা সাঙ্ঘাতিক ভয়ংকর।

আর প্রত্যেকের সঙ্গে লড়াই করে তবেই জিহ্বার খণ্ডটি উদ্ধার করতে পেরেছে সে...

যেমন ডাইনীটিকরির পীঠ রক্ষা করছিল, মন্দিরগাত্রের যক্ষরা। তেমনই ওড়গোন্দার পীঠ পাহারায় ছিল স্বয়ং ভৈরবের সেনানী, খেজুরির পীঠ পাহারায় ছিল মন্দিরের ভেতরকার রাক্ষুসে মাংসাশী লতাদল, পঞ্চকোট রাজবাড়ির পিঠ পাহারায় ছিল স্বয়ং মায়া আর ভ্রম, এখানেই তো তার মনে হয়েছিল সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। কখনও মনে হচ্ছে জিহ্বা হাতের কাছে আবার কখনও মনে হচ্ছে সে পড়ে রয়েছে অন্ধকার কোনো গহ্বরে। ভাগ্যিস তার কাছে ছিল জিহ্বার শক্তি। তবে সবচেয়ে বেশি নাকাল হয়েছিল শ্যামরূপার গড়ে। এই গড় পাহারা দিচ্ছিল এক শতাব্দীপ্রাচীন বৃহদাকার সাপ। কী ভয়ংকর লড়াই করে মন্দিরের গৃহগর্ভ থেকে বের করে এনেছিল জিহ্বা খণ্ড, সেটা একমাত্র কল্লকেশীই জানে। শম্ভুপাদকেও ঠিক এইসবগুলোর মুখোমুখি নিশ্চয়ই হতে হয়েছিল যখন সে এই পীঠে জিহ্বাখণ্ডগুলো লুকিয়ে রাখতে এসেছিল। তবে একটা জিনিস সাগর খেয়াল করেছে, জিহ্বা খণ্ডের শক্তি তার শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটি পীঠের রক্ষাকারী শক্তিগুলো কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এই পীঠগুলোতে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই।

বুদ্ধি, আর তার ক্ষমতার জোরে সব কিছুকে হারিয়ে হারিয়ে আজ সে হাজির হয়েছে শেষ রঙ্কিনীর পিঠে... এখন দেখার এই পীঠ কী বা কারা পাহারা দিচ্ছে।

গৃহগর্ভের ডান দিকে আলমারির খোপের মতো একটা অংশ তৈরি করা। সেই খোপের সামনে টিমটিম করে একখানা প্রদীপ জ্বলছে। দরজাটা ভেজিয়ে সাগর সরে এল সেই খোপের কাছে। এসে দেখল সেখানে একখানা বেদির মতো অংশ। আর সেই বেদীর ওপরেই রাখা পাথরের একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি। দেবী মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল সাগর। ওকে আজকাল হাসলেই বড় বেশি ভয়ংকর দেখতে লাগে।

সে বেদীর সামনে বসে মূর্তিটাকে দেওয়ালের দিকে উলটো করে প্রদীপের আগুন দিয়ে মূর্তির পেছনের একটি বিশেষ জায়গায় তাপ দিতে লাগল। আগে হলে এই প্রক্রিয়া সে সম্পাদন করতে পারত না। কিন্তু জিহ্বার এতগুলো শক্তি সংগ্রহের পর সে আপনা আপনিই বুঝে যায়, কী করতে হবে পরবর্তী জিহ্বা সংগ্রহ করার জন্য।

কিছুক্ষণ তাপ দেওয়ার পরেই, মন্দিরের ভেতরে কোথাও যেন একটা ঘড়ঘড় শব্দ হল। ঠিক যেন পাথরে পাথরে ঘষা লাগছে।

বেদীর ওপর প্রদীপখানা রেখে সোজা উঠে দাঁড়ালো সাগর। ঘড়ঘড়ে শব্দটা বাড়তে বাড়তে দেখা গেল, দেওয়ালের মধ্যে খোপের মতো যে অংশটি করা রয়েছে, সেটা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। সেটা পিছিয়ে যাওয়ায় যেখানে বেদীর মতো অংশটা ছিল সেখানে একটা কালো চারকোনা অন্ধকার গহ্বর তৈরি হয়েছে। সাগর প্যান্টের পকেট থেকে একটা টর্চলাইট বের করে সেই অন্ধকার গহ্বরের মুখে ফেলতেই দেখা গেল খাড়া সিঁড়ি নেমে গিয়েছে, অন্ধকার গহ্বরের মুখ থেকে। সকলে ভাবে লাউসেন কর্তৃক পূজিতা রঙ্কিনীর এই মূর্তি বোধ হয় এটা। কিন্তু তা নয়। তার অবস্থান এই গোপন পথের একেবারে শেষ মাথায়। আর তারই গর্ভগৃহে রয়েছে রঙ্কিনীর শেষ জিহ্বা-খণ্ডটি। সাগর আর দেরি না করে অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথ বরাবর নীচে নেমে গেল। এই তাড়াহুড়োতে সাগর খেয়াল করল না কেউ একজন দরজার ফাঁকে চোখ রেখে পুরো ব্যাপারটা দেখে নিচ্ছে।

* * * * * * * *

"আমার কপালে অবমাননা রয়েছে এ কথা কেন বললে তোমরা?"

মড়ন্তিকা নতজানু হয়ে বসে রয়েছে উঠোনের মাঝখানে। আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ধূর্ত, লোভী, স্বার্থপর প্রেতসাধকের দল। মড়ন্তিকার প্রশ্ন শুনে একজন প্রেত সাধক বলে উঠল, "কেউ তোকে কল্লকেশীর কাছে ছোট করে নিজেকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। সে তোর ব্যর্থতাগুলোকে বড় করে দেখিয়ে কল্লকেশীকে বোঝাবে সে তোর চেয়ে যোগ্য। আর কল্লকেশী সেটা বিশ্বাস ও করবে। তোর ক্ষমতা হরণ হবে।" কথাটা শুনেই ভ্রু জোড়া আপনা থেকেই কুঁচকে গেল মড়ন্তিকার। কে করবে তার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা।

— "কল্লকেশী কেন ধ্বংস করতে চায় রঙ্কিনীর মন্দির?"

— "কল্লকেশী নিজের পুরোনো শরীর পেয়ে গেলেও সে খুব ভালো করেই জানে সেই শরীরে ওর পূর্ণশক্তির বিকাশ ঘটবে না। রঙ্কিনী যখন কল্লকেশীকে ঘুম পাড়িয়েছিল কালের গহ্বরে, তখন সে তার শক্তির অর্ধেক হরণ করে নিজের মূর্তির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই কল্লকেশীকে নিজের পূর্ণশক্তি ফেরত পেতে গেলে রঙ্কিনীর মূর্তি ধ্বংস করতে হবে। আর রঙ্কিনীর মূর্তি ধ্বংস করবার জন্য ওকে ধ্বংস করতে হবে ওই মন্দির...। এই জন্যই ও মরিয়া হয়ে রঙ্কিনীর মন্দির ধ্বংস করতে চাইছে।"

— "এই শক্তি সে কীভাবে গ্রহণ করবে?" এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা একটু একটু করে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

— "কল্লকেশীকে আলাদা করে কিছুই করতে হবে না। যেহেতু এই শক্তি কল্লোকেশীর অর্ধেক, তাই সেই মূর্তি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অর্ধেক শক্তি আপনা থেকেই কল্লকেশীর শরীরে প্রবেশ করবে...। কল্লকেশীকে শুধু পুরোভাগে থেকে এই মূর্তি ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু এই মন্দির ধ্বংস করা এতো সোজা নয়।"

— "কেন? কেন সোজা নয়?" মড়ন্তিকার গলায় ভয়ংকর কৌতূহল।

— "কারণ তোদের পথ অবরোধ করবে রঙ্কিনীর সোনার খাঁড়া। সেই খাঁড়ার ছোঁয়ায় তোরা ধুলো হয়ে বাতাসে মিশে যাবি।"

— "তোমরা বললে আমার নাকি কল্লকেশীর সমান ক্ষমতা লাভের যোগ রয়েছে। কীভাবে আমি সেই ক্ষমতা লাভ করব?"

মড়ন্তিকার কণ্ঠে আনন্দের চাপা ঢেউ। যে ক্ষমতার জন্য কল্লকেশী বছরের পর বছর অপেক্ষা করে রয়েছিল সেই ক্ষমতা ওর বশীভূত হবে। তাকে আর কল্লকেশীর অনুগত হয়ে থাকতে হবে না। সে হয়ে উঠবে রাঢ়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পিশাচিনী। কিন্তু মড়ন্তিকা দেখল, তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রেত সাধকেরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করছে।

তারপর আলোচনা থামিয়ে মড়ন্তিকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রধান পিশাচ গুণীন বলে উঠল, "তোমার দ্বারের প্রবেশ মূল্য হিসেবে আমরা তোমায় চারখানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এরপর আমাদের কাছ থেকে কিছু জানতে হলে তোমায় আরো এমন কিছু দিতে হবে যা দুর্মূল্য। তোমার অবিনাশী হায়নার মতো..."

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মড়ন্তিকার, "আমার আমার কাছে আর সত্যি দেওয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমি অবশ্যই এমন কিছু নিয়ে আসব যা দুর্মূল্য।"

— "ধার-বাকির কারবার আমরা করি না মড়ন্তিকা।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশ্রী কুটিল হাসি খেলে গেল লোভী গুনীণদের ঘা ভর্তি ঠোঁটের কোলে।

— "আমরা একটাই তত্ত্বে বিশ্বাস করি, আর সেটা হল, একহাতে জিনিস দাও... এক হাতে প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও।"

* * * * * * * *

পাথরের সিঁড়িটা যেখানে শেষ হল সেটা খানিকটা পাথরের তৈরি করিডোরের মতো। টর্চলাইটের আলো ফেলতে ফেলতে সামনে এগোতে লাগল সাগর। বড় জোর কুড়ি পঁচিশ পা সেই করিডোর ধরে এগিয়েছে সাগর ঠিক এমন সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। টর্চের আলো গিয়ে পড়ছে

করিডোরের একেবারে শেষ মাথায়। সেখানে রয়েছে সিঁদুর মাখানো এক পাথরের মূর্তি। কিন্তু দেখে মনে হল দেবীমূর্তি যেন উলটে রয়েছে।

নীচের দিকে মাথা উপরের দিকে পা। এরকম সে এর আগেই দেখেইনি কোথাও। সাগর আরও দেখল মূর্তির সামনের মেঝেটা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। টর্চ লাইটের আলো পড়তেই মেঝেটা চকচক করে উঠল। সাগরের ঠোঁটের কোলে সেই পৈশাচিক হাসি। সে দেরি না করে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে একখানা মন্ত্র পড়ল। আর তারপরেই হাতে ধরা টর্চলাইট খানা বদলে গেল একটা ভাঙা কালো বস্তুতে, যেখান থেকে উজ্জ্বল নীলাভ সবজে আভা বেরোচ্ছিল। এই হল সেই সপ্তম খণ্ডটি, যেটা সে শ্যামরূপার গড় থেকে সে জীবনবাজী রেখে সংগ্রহ করে ছিল। শম্ভুপাদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শেষ খণ্ডটি এইটিই তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

সে আলোকিত জিহ্বা-খণ্ডটিকে মশালের মতো করে মাথার ওপর উঁচিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দেবী মূর্তির সামনে স্ফটিকমেঝের ওপর সে যেই পা রাখল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্ফটিক মেঝে নীলচে সবুজ আলো বিকরণ করতে লাগলো। অবাক সাগর... তাহলে... তাহলে কী এই স্ফটিক মেঝের নীচে রয়েছে জিহ্বার শেষ খণ্ড? কিন্তু কীভাবে উদ্ধার করবে সেই খণ্ড? ভাঙতে হবে নাকি মেঝে?

আনমনা হয়ে খানিকটা এইসবই ভাবছিল সে ঠিক এমন সময় তার সামনের নীল স্ফটিকের মেঝেখানা ফুঁড়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল একখানা অদ্ভুত দর্শন নীলাভ জীব। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। এই করতে করতে তারা সাগরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তাদের মুখের হিংস্রতা... নৃশংসতা দেখে চমকে উঠল সাগর। এরা এরা... তো পাতালের নীল দৈত্য! আগত বিপদের আভাসে সাগরের মুখ ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল সেই বীভৎস রূপে। চেরা কুচকুচে কালো জিভ, আকর্ণ বিস্তৃত মুখগহ্বরের ভেতরে ঝকঝকে করাতের ফলার মতো দাঁতের সারি দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। সাগর দেরি না করে জিহ্বার টুকরোকে পকেটে চালান করতেই ওরা একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল সাগরের ওপর। টেনে ছিঁড়ে ফেলল পরনের জামা। আঁচড়ে কামড়ে

রক্তাক্ত করে তুলল ওকে, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সাগর। সে জানে এদের গ্রাসে তার শক্তি কাজ করবে না। এরা শক্তি শোষণ করে নেয়। সে তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে নিজের দেহের আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করল। সঙ্গে সঙ্গে যারা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল তারা ছিটকে পড়ল দূরের দেওয়ালে। কিন্তু এদের গ্রাস থেকে মুক্তি পেল না সাগররূপী কল্লকেশী। কারণ ততক্ষণে পায়ের নীচের স্ফটিক মেঝে বদলে গিয়েছে নীল দৈত্যদের লক্ষ লক্ষ করোটিতে। তারা ক্রমশ তাঁকে নীচের দিকে টেনে নামাচ্ছে, ঠিক যেন চোরা বালি। এদের নাগাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাগর মরিয়া চেষ্টা করতে লাগল। সে জানে এই সময় রঙ্কিনীর জিহ্বার শেষ খণ্ডটি তার হাতে আসলেই এদের মায়া লুপ্ত। কিন্তু কীভাবে পাবে সে সেই শেষ খণ্ড? সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো মাথায় ধাক্কা মারল। শেষবারের মরিয়া চেষ্টা করার মতো করে শ্যামরূপার গড়ের জিহ্বা-খণ্ডটিকে পকেট থেকে বের করে ছুড়ে দিল সামনের সিঁদুর মাখানো রঙ্কিনী দেবীর মূর্তির দিকে। আর ওমনি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। মাথার ওপর থেকে একটা ভয়ংকর আওয়াজ। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও সাগর ঘাড় তুলে দেখল ওপরের ছাদের পাথর আপনা থেকেই সরে গিয়ে একটা গর্ত তৈরি হল। আর ওর ভেতর থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর মোড়ক সাগরের দিকে নেমে এল। এক মুহূর্ত দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেই, যখন নীল দৈত্যরা তাকে প্রায় টেনে নামিয়ে নিয়েছে কোমর পর্যন্ত তখন শরীর সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে একটা মরণ লাফ দিয়ে লুফে নিল আলোর মোড়ক খানা। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড নীলচে সবুজ আলোর বিস্ফোরণ। আর তারপরেই সাগরের মনে হল সে শক্ত মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

আলোর তেজটা কমে যেতেই... সাগর যা দেখল তাতে রীতিমতো অবাক হল। পায়ের নীচের স্ফটিক মেঝে কোনো এক মায়াবলে মাথার ওপরের ছাদে বদলে গিয়েছে, আর পাথুরে ছাদটা পায়ের নীচে চলে এসেছে।

সাগর ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে যেই রঙ্কিনীর মূর্তির দিকে তাকাল তখনই দেখল যে মূর্তিটা এতক্ষণ উলটো হয়ে ছিল, সেটা এখন সোজা লাগছে।

অর্থাৎ, এতক্ষণ সে উলটোদিক বরাবর ঝুলছিল। সাগর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্কিনীর মূর্তির পায়ের কাছ থেকে সপ্তম খণ্ডটি তুলে নিল। তারপর ধীরে ধীরে শেষ খণ্ডটির শালুর মোড়কখানা খুলতে লাগল। আবার সেই কালো জিনিসটা... কী এটা? বিরক্ত সাগর কাপড় শুদ্ধ মোড়ককে পাথুরে মেঝের একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে শেষ খণ্ডটিকে হাতের তালুর মধ্যে রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটা নীল আলোর বলয় উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে সাগরকে ঘিরে ধরল যেন। সারা শরীরে এক অফুরন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ টের পাচ্ছে সাগর। সে পেয়ে গিয়েছে তার অর্ধশক্তি। আর, আর কোনো বাধা নেই... এবার শুধুমাত্র একটা উপাচার। শেষ উপাচার।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই ঘুরে তাকাল রঙ্কিনীর মূর্তির দিকে। কী নিষ্প্রাণ লাগছে রঙ্কিনীর এই পরিত্যক্ত মূর্তিখানা। সেটা দেখেই প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল সে হাসির ভয়াবহতা শুনে।

ঠিক এমন সময় সিঁড়িখানা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে সনাতন চিৎকার করে উঠল, "কে? কে? তুমি...? এখানে কী করছ?"

হ্যাঁ, সাগর'কে অনুসরণ করে সে এই গোপন কুঠুরি পর্যন্ত নেমে এসেছিল। আর এসে সে যখন সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা দেখল তাতে কয়েকমুহূর্তের জন্য সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ সময় লাগল তার ধাতস্থ হতে। আর তারপরেই লাঠি বাগিয়ে সে রুখে দাঁড়াল সাগরের বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃদ্ধ সিকিউরিটি গার্ডটা বোঝেনি তার সামনেই এই ভয়ংকর দর্শন লোক কোনো ভূতে পাওয়া অপদেবতা নয়... অগ্নির শাপ ভ্রষ্ট পুত্র কল্পকেশী। যার চোখে নরকের অন্ধকার।

সাগর পিছন ফিরে বৃদ্ধ লোকটাকে ঘাড় হেলিয়ে দেখল। অনেকক্ষণ পেটে খাবার পড়েনি তার। তাছাড়া একটু আগের ধস্তাধস্তিতে খিদেটাও চাগাড় দিয়ে উঠেছে। এই খাবার ছাড়া যাবে না মোটেও। সাগর অপেক্ষা না করে চেরা জিবের নাল টেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সনাতনের দিকে।

(ধ্বংস যজ্ঞ)

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।
দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

গুহার ভেতরে দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে এখন মশাল জ্বলছে। তারই উজ্জ্বল আলো গুহার ভেতরে। সেই আলোয় দেখা গেল গুহার ভেতরে থিকথিক করছে ভিড়ে। কিন্তু এ কোনো মানুষের ভিড় নয়। আজ এখানে যারা জমা হয়েছে, তাদের ডেকে এনেছে মড়ন্তিকা। তারা এতদিন লুকিয়ে ছিল কালের গহ্বরে। তাঁরা কল্লকেশীর অনুগামী অপদেবতারা, শুধু কী অপদেবতা? নরপিশাচ, পিশাচ, মানুষখেকো, প্রেতযোনি থেকে জন্ম নেওয়া অমানুষ, ভূত, প্রেত, আজ কল্লকেশীর আহ্বানে জড়ো হয়েছে। মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছে বিকশবাহুদের আধপচা, গলা শরীর। তারা অপেক্ষা করছে আজ এক মাহেন্দ্রক্ষণের যখন তাদের প্রভু মহান কল্লকেশী জেগে উঠবে।

আজ তাদের আনন্দের দিন। আজ তাদের উল্লাস ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা প্রভুর জেগে ওঠার অপেক্ষা করছিল। আজ সেই দিন। গুহার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মড়ন্তিকা, কাপালিক বিসম্ভর আর মনুর মা। মনুর মায়ের চোখ জলে চক চক করছে। গুহার একপাশে দাঁড়ানো পাঁচ খানা জীর্ণ, শিকড় গজানো শরীর গলায় কোনোরকমে মাদল ঝুলিয়ে সেই রহস্য বোলখানা বাজিয়ে চলছে। আর তারই বোল গুহার বাইরে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ছে।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রিমি দ্রিমি দম।"

যে দীর্ঘ অভিশাপে মনুর মায়ের পূর্বপুরুষেরা জর্জরিত। যারা কায় মনোবাক্যে এখন অপেক্ষা করছে শুধু মৃত্যুর। কল্লকেশীর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিশাপ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ তারা শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে

পারবে।

ঠিক এমন সময় গুহার ভেতরের সমস্ত কোলাহল, মাদলের বোল যেন মুহূর্তের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেল। গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা নরকঙ্কাল। যার হাড়ে তখনও মাংস-রস লেগে ছিল। এই কঙ্কাল আর কেউ নয়। একজন বিকশবাহু। যে কল্পকেশীকে ঘুম থেকে জাগানোর উপাচারটা পালন করবে। এই কঙ্কালেরই পিছনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাগর। তার দু-হাতে ধরা রঙ্কিনীর পূর্ণ জিহ্বা। হ্যাঁ, জিহ্বার সব টুকরোগুলো আবার নতুন করে জোড়া লাগিয়ে কল্পকেশী সেটাকে সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু স্বর্ণ জিহ্বা বদলে গিয়েছে কালো জিহ্বায়। সেখান থেকে আবার টুপ টুপ করে রক্ত ঝরে পড়া শুরু হয়েছে আবার। বুকের সেই কাটা জায়গায় ফের নতুন করে ক্ষত তৈরি করা হয়েছে। আর সেখান থেকে চুইয়ে পড়ছে রক্ত। উপাচারকারী বিকশবাহুর কঙ্কালের পিছন পিছন সাগর এগিয়ে যাচ্ছে গুহার শেষ মাথার ইঁদারার দিকে। সেখানে ইঁদারাটিকে ঘিরে একটি বিশেষ মুদ্রায় সাতখানা কঙ্কাল উপবিষ্ট। এই মুদ্রা এর আগেও আমরা দেখেছি। একদম বাইরের দিকে চার জন। ঠিক যেন চতুর্ভুজের চারটি কোণ। তারপর তিন জন, ঠিক ত্রিভুজের তিনটি কোণ। আর মাঝখানে তো রইল ইঁদারাটি। এ কল্পকেশীর জাগরণের প্রতীক।

ধীরে ধীরে তারা দু-জন ইঁদারার প্রাচীরে ওপর উঠে আসতেই ফের বাজতে লাগল মাদলের বোল।

"দ্রিমি দ্রিমি দম দম
দ্রমি দ্রমি দম।"

মাদলের বোলের সঙ্গে সঙ্গে গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এক অদ্ভুত অবোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ। সেই মন্ত্রের তালে তালে গুহার বিকশবাহুদের কঙ্কালরা দুলছে। সেই মাদলের তালে তালে অপদেবতারা আনন্দে লাফালাফি করছে। সাগরের চোখের একটা ইশারায় গুহার ভেতরকার মশালের হলুদ আলো বদলে গেল নীল আলোয়। এই তো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। উপাচারকারী বিকশবাহুর কঙ্কাল গুহার গা থেকে টেনে নিয়ে এল একটা মশালের আলো।

তারপর সেটাকে ইঁদারার ভেতরে ফেলে দিতেই এক উজ্জ্বল নীল আভা ইঁদারার ভেতর থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা গুহায়। সাগর একবার তাকাল পাশে দাঁড়ানো বিকশবাহুর দিকে, তারপর রঙ্কিনীর জিহ্বাটাকে বুকে আঁকড়ে ঝাঁপ দিল নীল আভায় উদ্ভাসিত ইঁদারার মধ্যে। পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড নীল আলোর বিস্ফোরণ। আর তারপরই সেই আলো গুহা থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

* * * * * * * *

উঁচু পাহাড়ের এক গোপন গুহায় বিচালির আসনে পদ্মাসনে বসেছিলেন একজন ব্যক্তি। সামনে পাথরের উঁচু বেদীর ওপরে রাখা রাজবাড়ির প্রাচীন কুলদেবী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনীর স্বর্ণমূর্তি। মূর্তির সামনে একখানা মাটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। তারই আভা ছড়িয়ে পড়ছে দেবী মূর্তির সারা শরীরে। গুহার ভেতরে আলো আঁধারি, তাই লোকটির পরিচয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রদীপের শিখায় নিবন্ধ লোকটির স্থির দৃষ্টি জানান দিচ্ছে তিনি গভীর মনোযোগে কিছু ভেবে চলছেন। এমন কিছু যা খুব গুরুতর।

ঠিক এমন সময়, একটা বিকট শব্দে তার যেন ঘোর ভঙ্গ হল। নীচের পাহাড়ে একটা নীল আলোর বিস্ফোরণ হতেই লোকটি উঠে গুহার মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। নীল আলোর একখানা বলয় একটি বিন্দু হতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল চোখের নিমেষেই। আর তখনই সেই উজ্জ্বল নীল আলোর আভায় দেখা গেল গুহার মুখে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন। স্বয়ং মহর্ষি শম্ভুপাদ। এতদিন পরেও তিনি জীবিত রয়েছেন। শুধু জীবিত নন, বহুবছর আগে তাঁকে দেখতে যেমন ছিল, এখনও তাঁকে দেখতে ঠিক তেমনই রয়েছে। এ অলৌকিক ঘটনা কী করে সম্ভব?

সম্ভব, দেবীর লীলায় সকল কিছুই সম্ভব। যেদিন তিনি কুঠারের আঘাতে দেবীর স্বর্ণজিহ্বাকে আটটা খণ্ডে ভেঙেছিলেন সেদিন রঙ্কিনী মন্দিরের গৃহগর্ভে এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আমরা তারপর দেখেছিলাম, সেই বিস্ফোরণে তাঁর

সারা শরীর ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে শুধুমাত্র এইটুকু ঘটনা ঘটেনি। দেবী সেদিন শম্ভুপাদের থেকে তার মৃত্যু কেড়ে নিয়েছিলেন। নাহলে সেদিনই গৃহগর্ভের প্রচণ্ড আগুনে তার নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়েই যেত। প্রথমে শম্ভুপাদ ভেবেছিলেন এই অমরত্বও, এই দীর্ঘজীবন বুঝি তার অপরাধের শাস্তি। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েও যখন তাঁকে জ্বরা গ্রাস করল না তখন বুঝেছিলেন, এর পেছনে দেবীর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

তারপর থেকেই নিভৃতে তিনি নিজের সাধনা করে গিয়েছেন। তার ক্ষুধা লাগে না, তার তৃষ্ণা লাগে না, জৈবিক কোনো কর্মেরই প্রয়োজন পড়ে না। এই সুদীর্ঘ সময় সারাদিন তিনি শুধু দেবীর সাধনা আর ধ্যান করে গিয়েছেন। আর আজ যখন কল্লকেশী পুনরায় জন্ম নিয়ে নিয়েছে ঠিক তখনই তিনি বুঝতে পেরেছেন দেবী তাঁকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাউকে না কাউকে তো তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। কল্লকেশীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার মতো তিনি ছাড়া কেই বা বেঁচে আছে?

মহর্ষি সরে এলেন গুহার মুখ থেকে। দেবীমূর্তির নীচে এতদিন ধরে সযত্নে রাখা ছিল দেবীর স্বর্ণ-খড়গখানা। মহর্ষি কুলদেবীকে প্রণাম করে সেই খড়গখানা কপালে ঠেকালেন।

— "মা, আমি পারিনি তোর জিহ্বার খণ্ডগুলো রক্ষা করতে। সে করতে পারলে... আজ কল্লকেশী কখনই জেগে উঠতে পারতো না। আমি তোর ব্যার্থ সন্তান মা। পারলে আমায় তুই ক্ষমা করিস..."

মহর্ষির দুই চোখেই অশ্রুধারা।

একটু থেমেই তিনি বলে উঠলেন, "ও জেগে উঠেই আজ সকলকে নিয়ে তোর মন্দির ধ্বংস করতে আসবে মা। ওকে আটকাতেই হবে। আমি জানি না একলা পারবো কিনা কিন্তু আমি যাবো তোর মন্দির রক্ষা করতে। শুধু তুই আমার সাথে থাকিস মা... শুধু তুই আমার সাথে সাথে থাকিস।"

মহর্ষি আশা করেছিলেন, কীভাবে কল্লকেশীকে আটকাবেন সেই বিষয়ে দৈববাণী, কোনো নির্দেশ অন্তত পক্ষে কোনো ইঙ্গিতময় স্বপ্নটুকু পাবেন। কিন্তু

এই দীর্ঘসময়ে দেবী যেমন নিরুত্তর রয়েছিলেন। আজকেও তাই রইলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মহর্ষির বুকের ভেতর থেকে। মা কী আজকেও চুপ করে থাকবেন?

মহর্ষি কিছুক্ষণ মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। নাহ, এবার বেরোতে হবে। দেরি করা চলবে না তাঁর। তাঁকে অনেকটা পথ পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নামতে হবে।

* * * * * * * *

গুহার ভেতর তখন প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়। কেউ চোখ খোলা তো দূরের কথা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। সেই সাথে পায়ের নীচে ভয়ংকর একটা গুড়গুড়ে কম্পন। কিছু একটা মাটির অনেক ভেতর থেকে উপর দিকে উঠে আসছে ধীরে ধীরে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র তারপর আরেকটা চোখ ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ, চারিদিক যেন সাদা হয়ে গেল সেই আলোয়। আর ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রবল ঝোড়ো হাওয়া আর সেই আলো দুটোই কমে এল আপনা থেকেই। ঠিক তখনই গুহার ভেতরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল একটা দমবন্ধ করা পচা দুর্গন্ধে।

আলোর তেজ কমে যেতেই সকলে চোখ তুলে অবাক হয়ে দেখল, বিকশবাহুরা ফিরে এসেছে তাদের রক্ত-মাংসের পুরোনো শরীরে। মুণ্ডিত মস্তক, গৌরবর্ণ, নির্লোমশরীর, পরনে শ্বেতবস্ত্র। তারা অবাক হয়ে নিজেদের দেখছিল। ওদিকে বিসম্ভর কাপালিক তার জরা ত্যাগ করে সেই পুরোনো ভয়ংকর শক্তিশালী চেহারায় ফিরে এসেছে। পাঁচজন লোক যেখানে দাঁড়িয়ে মাদল বাজাচ্ছিল, সেখানে ছয়খানা লতা গাছ শিকড় রূপে ধীরে ধীরে গুহার একপাশ ঘিরে ফেলছে। তাদের অমরত্ব ঘুচে তাদের মুক্তি ঘটেছে। আর মনুর মা? সেও তার পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করে তাদের পাশেই গাছ হয়ে রইল। এদিকে সকল অবদেবতা সেই সাদা আলোর স্রোতে স্নাত হয়ে এক নতুন শক্তি অনুভব করছে সারা শরীরে।

সকলেই প্রায় নিজেদের শক্তি নিয়ে বিহ্বল ছিল তাই প্রথমে কেউ খেয়াল করেনি। কিন্তু আচমকা গুহার ঠিক মাঝখান থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসতেই সকলে চমকে সেই দিকে তাকাল। ইঁদারার ঠিক ওপরেই শূন্যে ভাসছে একখানা কালো ধোঁয়ার পিণ্ড। আওয়াজটা সেখান থেকেই আসছে। ধীরে ধীরে পিণ্ডটা বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে যখন সেটা প্রায় গুহার ছাদ ছুঁয়ে ফেলল ঠিক তখনই পিণ্ডটা ফেটে চারদিকে কালো ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়ল। সকলে দেখল সেই কালো পিণ্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক অদ্ভুত দর্শন দেহ। সেই দেহ এত লম্বা যে গুহার মেঝেতে দাঁড়াতে তার মাথা ঠেকে যাচ্ছে গুহার ছাদে। মুণ্ডিত মস্তক যা পিছনের দিকে একটু বেশিই বড়। সারা শরীর ফ্যাকাসে চামড়ায় ঢাকা। তিনজোড়া হাত দেহের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চোখ জোড়া পুরোটাই কালো, ঠিক যেন নরকের গহ্বর। বড়মুখের ভেতরে দেখা যাচ্ছে কালো কালো মাড়ি, আর সেই মাড়ির ওপর বসানো ঝকঝকে করাতের ফলার মতো দাঁতের সারি। কল্লকেশী ওপরের দিকে মুখ তুলে একখানা জোরে শ্বাস নিতেই মাঝখান থেকে চেরা কালো কুচকুচে জিবটা দূর থেকেই দেখা গেল। শূন্যে ভাসতে থাকা কল্লকেশীর শরীর গুহার মেঝেতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা গায়ে গায়ে লেপ্টে রইল পোশাকের মতো হয়ে। শয়তান প্রভু কল্লকেশীর এই হল আসল চেহারা।

পূর্ণ অবয়ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই গুহার মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই একসঙ্গে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাদের আরাধ্য কে প্রণাম করল। কল্লকেশী সকলের দিকে তাকিয়ে আবার জোরে একটা শ্বাস নিল বাতাসে...

একপাশে দাঁড়ানো মড়ন্তিকার এসে কল্লকেশীকে অভিবাদন জানাল। তার চোখে মুখে এক অদ্ভুত চাপা উল্লাসের ঝিলিক পাওয়া যাচ্ছিল,

"প্রভুর জয় হোক।"

কল্লকেশী কিছু না বলে বিসম্ভরের দিকে তাকাতেই বিসম্ভর নতজানু হয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, "মহান প্রভু কল্লকেশীর জয় হোক।"

সাথে সাথে উপস্থিত সকলে, চিৎকার করে উঠল আদিম উল্লাসে, "মহান

প্রভু কল্লকেশীর জয় হোক। জয় হোক।" আকাশ বাতাস যেন মুখরিত হল সেই প্রচণ্ড জয়ধ্বনিতে।

কল্লকেশী তারই মাঝে মড়ন্তিকার দিকে তাকাল,

"সকলে এসেছে...?" কল্লোকেশীর সাপের মতো হিশহিশে স্বর ছড়িয়ে পড়ল গুহার আনাচে কানাচে।

— "প্রেত পর্বতের পিশাচগুণীন ছাড়া সকলেই হাজির..."

— "ওরা এল না?"

— "না প্রভু, ওরা বলল ওরা কারো আদেশ নেওয়া পছন্দ করে না..." মড়ন্তিকা আমাতা আমতা করে কথাটা বলে উঠতেই পাশ থেকে বিসন্তর মড়ন্তিকার উদ্দেশে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "কী? আর তুমি এটা শুনে চলে এলে...? কিছু করলে না তারপর?"

অবাক মড়ন্তিকা বিসন্তরের মুখের দিকে তাকাল। এই লোকটি একটু আগেও নুইয়ে পড়া লতা গাছের মতো তার পায়ের কাছে পড়েছিল। আর এখন জ্বরামুক্ত হয়ে এত স্পর্ধা বেড়েছে যে সে মড়ন্তিকাকে কৈফিয়ত চাইছে? মড়ন্তিকাকে? রাঢ়ভূমের পিশাচিনীকে? একজন সাধারণ মায়াধারী কাপালিকের এই দুঃস্পর্ধা দেখেই মাথার ভেতর ধক করে ক্রোধের আগুনটা জ্বলে উঠল। পারলে তাঁকে এক্ষুনি যেন সেই আগুনে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু পরক্ষণেই থমকে গেল। এখনই কিছু করা উচিত হবে না। সে কোনোরকমে নিজেকে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল,

— "তুমি প্রেত পর্বতের পিশাচ গুণীনদের ক্ষমতা জানো না কাপালিক। জানলে এ কথা..."

— "সে ক্ষমতা যতই হোক।" মড়ন্তিকার কথা মাঝপথেই থামিয়ে দিল বিসন্তর। গলার স্বরে উষ্ণতার আভাস স্পষ্ট, "মহান প্রভুর কল্লকেশীর থেকে তো বেশী ক্ষমতা নয়।" মড়ন্তিকা আড়চোখে কল্লকেশীর মুখের দিকে তাকাল। চকচক করছে শয়তান প্রভুর চোখ জোড়া। কোথাও গিয়ে নিজের বন্দনা শুনে কী আপ্লুত হওয়ার আভাস?

— "আপনি আমায় আদেশ দিন প্রভু।" বিসন্তর করজোড়ে মাথা নোয়াল,

“পিশাচিনী যা করতে অক্ষম তা আমি নিমেষেই করতে পারব। এরপরে ওরা রাজি না হলে, আমার খাঁড়ার এক কোপে কাটা ওদের মুণ্ডু আপনাদের কাছে এনে হাজির করব।”

মড়ন্তিকার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিসন্তর তার নিন্দা করে কল্লকেশীর বিশ্বাসভাজন হতে চাইছে। তারই ফাঁকে সে দেখল, বিসন্তরের কথায় কল্লকেশীর মুখে প্রসন্নতা। এই তাহলে সেই বিশ্বাসঘাতক যে ওকে ছোট করে নিজে বড় হতে চাইছে? আগে জানলে...

— “এখনই না বিসন্তর। আমার আদেশ পেলে তারপর...”

— “যথা আজ্ঞা, প্রভু।”

— “প্রভু, আপনার ভোগ...” কথার প্রসঙ্গ বদলাতে মড়ন্তিকা গুহার এক কোণে নির্দেশ করতেই দেখা গেল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দুটো কিশোরী বিস্ফারিত নয়নে কল্লোকেশীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই বিস্ফারিত চোখে আতঙ্ক। সেই বিস্ফারিত চোখে প্রাণভয়।

কল্লকেশী ওদের দিকে তাকিয়ে জিবের নাল টেনে বলল, “নিঃসন্দেহে, অত্যন্ত উপাদেয় খাবার, তবে আগে আমি রঙ্কিনীর মন্দির ধ্বংস করতে চাই। ওই মন্দির আগে ধ্বংস করে রঙ্কিনীর অস্তিত্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে তারপর আমি ভোগ গ্রহণ করব।”

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেনানীর সকলেই উল্লাস আর জয়ধ্বনিতে চিৎকার করে উঠল। কল্লকেশী তখন বাকিদের দিকে চলো, “তাহলে আর দেরি কিসের? এগোনো যাক মন্দিরের দিকে...”

মড়ন্তিকা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতির সঙ্গে মাথা নেড়ে চিৎকার করে উঠল বাকিদের উদ্দেশে, “সকলেই গুহার বাইরে সারিবদ্ধভাবে...” কিন্তু আচমকা তাঁকে থামিয়ে কল্লকেশী বলে উঠল, “দাঁড়া। তুই নয়...। আজকে সেনানীর পুরোভাগে থেকে ওদের নেতৃত্ব দেবে কাপালিক বিসন্তর।”

মড়ন্তিকার কয়েকমুহূর্ত লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। কিন্তু যখন বুঝতে পারল সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর রাগে জ্বলে উঠল যেন। সামান্য স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে প্রভু তার সঙ্গে এই ব্যবহার করলেন? তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসযোগ্যতার এই

পরিণাম। অবশ্য কল্লকেশী এর আগেও স্বার্থপরের মতো তার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল, সেই রঙ্কিনীর প্রথম জিহ্বা-খণ্ড স্পর্শ করার মুহূর্তে। সারা মুখে একটা ঘৃণার ভাব ধরা পড়ল তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল মড়ন্তিকা। এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কী চলছে তা কোনোমতেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিসম্ভর প্রবল উৎসাহে পুরো সেনানীকে নেতৃত্ব দিয়ে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

গুহার ভেতরে এখন উপস্থিত বলতে কল্লকেশী আর মড়ন্তিকা...

কল্লকেশী মড়ন্তিকার দিকে ফিরে বলল, "তুই আর তোর হায়নারা বাকি দলের সঙ্গে মন্দিরে আক্রমণ করবি..."

— "প্রভু একটা কথা ছিল..." মড়ন্তিকা কল্লকেশীকে একা পেয়ে বলে উঠল, "আমরা ভাবছি সেখানে হয়তো কেউই থাকবে না পাহারায়। কিন্তু সেখানে রঙ্কিনীর যদি কোনো পাহারাদার থেকে থাকে..."

কল্লকেশী হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "কী বলতে চাইছিস, স্পষ্ট করে বল।"

— "আপনি পুরোভাগে থাকবেন না প্রভু...। থাকলে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি পরে আসেন..."

— "আমি আক্রান্ত হব?" কল্লকেশীর ভয়ঙ্কর মুখে কুটিল হাসি। "কে আক্রমণ করবে আমায়? কার এত সাহস?"

মড়ন্তিকা মুখ তুলে বলল, "শম্ভুপাদ।"

— "শম্ভুপাদ?" কল্লকেশীর মুখে বিস্ময়, "শম্ভুপাদ কী করে?"

— "জানি না প্রভু। তবে এ খবর আমার বানানো খবর নয়। এ খবর জানিয়েছে আমায় প্রেত পর্বতের পিশাচগুণীনেরা।" মড়ন্তিকা দেখল, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কল্লকেশীর কপালের ভাঁজ অদ্ভুতভাবে গাঢ় হতে শুরু করেছে।

— "এ কথা যদি সত্যি না হয়... তাহলে নিজের হাতে তোকে শেষ করব আমি... আর যদি সত্যি হয় তাহলে..."

"তাহলে আমার কাছে একটা পরিকল্পনা রয়েছে প্রভু।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঠোঁটের খেলে গেল এক অন্যরকমের হাসি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মড়ন্তিকা বেরিয়ে এল গুহার ভেতর থেকে। তারপর সবার শেষে কল্লকেশী। কল্লকেশীকে দেখেই তার নামে ফের জয়ধ্বনি উঠল। এরই ফাঁকে বিসম্ভর এসে কল্লকেশীর পাশে দাঁড়াল।

— "প্রভু আমরা তৈরি। এখন শুধুমাত্র আপনার আদেশের অপেক্ষায়।"

কল্লকেশী এক অদ্ভুত চোখে তাকাল বিসম্ভরের দিকে। তারপর হিসহিসে গলার স্বর ছড়িয়ে বলল, "পরিকল্পনায় পরিবর্তন এসেছে।"

বিসম্ভর অবাক। এরই মধ্যে পরিকল্পনা পরিবর্তন? নিশ্চয়ই এর পিছনে ওই পিশাচিনীর প্রভাব রয়েছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল বিসম্ভর। কিন্তু মুখের সে ভাব গোপন করে বলে উঠল, "আদেশ করুন প্রভু।"

— "এই সেনার দায়িত্ব মড়ন্তিকাই নিক। ও দক্ষ এই ব্যাপারে। ও জানে কী করতে হবে?" তারপর তিনি ইশারা করলেন মড়ন্তিকার দিকে। তার ইশারা বুঝেই দলটির দায়িত্ব নিল মড়ন্তিকা। তারপর দেখতেই দেখতে পুরো দলটা মড়ন্তিকার নেতৃত্বে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

— "আর আমি প্রভু?" বিসম্ভর অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মড়ন্তিকার যাওয়ার পথে। "আমি কী করব?"

— "তুই যাবি প্রেত পর্বতে। পিশাচ সাধকদের আমার দরকার। এই কাপড়টা দিয়ে দিবি। ওরা রাজি হয়ে যাবে। তারপরেও ওরা রাজি না হলে নিজের শক্তি প্রয়োগ করবি।" কথাটা বলেই একটা রক্তমাখা কাপড় সে বাড়িয়ে দিল বিসম্ভরের দিকে। বিসম্ভর সেটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কল্লকেশীকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

* * * * * * * *

মাথার ওপরের কুণ্ডলীকৃত মেঘ যেন ঘূর্ণাবর্তের আকারে মন্দিরের ওপরে

নেমে আসছে। ঘন ঘন সাদা আলোর ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। ঠিক যেন কোনো ভয়ংকর প্রলয়ের সূচনা। রঙ্কিনী মন্দিরের দরজা হাট করে খোলা। মন্দিরের গৃহগর্ভের ভেতরে একশো আটখানা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। সেই একশো প্রদীপের সেই আলোয় রঙ্কিনী দেবীর প্রস্তরমূর্তি, মাথার রুপোর মুকুট যেন জ্বলজ্বল করছে। সেই আলোকিত মূর্তির দিকে তাকালে একপলকে মনে হয় যেন জগতে কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। কিন্তু অন্ধকার আছে, সেই সঙ্গে অপশক্তিও, যারা আজ এই মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চায়।

ঠিক এমন সময় কাছেপিঠে কোথাও একটা জোরে বাজ পড়তেই রাস্তার আর মন্দিরের বাইরের সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো একসঙ্গে নিবেই পর মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল। আর জ্বলে উঠতেই দেখা গেল মন্দিরের ডান দিক জুড়ে পীচ রাস্তার ওপরে গিজগিজ করছে কল্লকেশীর অবিনাশী সেনারা। তাদের মুখ পাথরের মতো কঠিন। ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপদেবতা, মানুষখেকো, হায়না সব আছে ওই দলে। হুঙ্কার দিতে দিতে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মন্দিরের দিকে। কিন্তু এই দলের কোথাও না দেখা গেল মড়ন্তিকাকে আর না দেখা গেল কল্লকেশীকে। বাকি সকলে এখন নতুন শক্তিতে বলীয়ান। এরা কেউই আর রঙ্কিনীকে ভয় পায় না।

ওরা ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রধান-ফটকের দিকে এগিয়ে আসতেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মন্দিরের ভেতরের একশো আট খানা প্রজ্জ্বলিত দীপ একসাথে নিবে গেল। দীপগুলো একসাথে নিভে যেতেই গৃহগর্ভ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হয়ে উঠল, কিন্তু সেটা এক মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই আবার এক মায়া বলে একশো আটখানা প্রদীপই একসঙ্গে দ্বিগুণ আলোয় জ্বলে উঠল। আর জ্বলে উঠতেই এই আগ্রাসী সেনা থমকে দাঁড়াল। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মহর্ষি শম্ভুপাদ। হাতে খোলা সোনার খড়গ। মহর্ষিকে দেখে পুরোভাগে পাথরের মতো অবিচল থাকা অপদেবতারা শিউরে উঠল।

মহর্ষি ধীরে ধীরে মন্দিরের চৌকাঠের বাইরে নেমে দাঁড়াতেই মহর্ষিকে দেখে তাদের মধ্যে একটা মৃদুগুঞ্জন উঠল। বোঝা যাচ্ছে এই সেনানীর কেউই মহর্ষির প্রতিরোধ এখানে আশা করেনি। ঠিক এমন সময়ই কাছে পিঠে কোথাও

আবার একটা বাজ পড়তেই, অদ্ভুতভাবে সেই গুঞ্জন থেমে গেল। আর তারপরেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল একখানা শিঙার আওয়াজ। মহর্ষি জানেন এই শিঙার আওয়াজ বিকশবাহুদের। এই শিঙার ধ্বনি কল্লকেশীকে আবাহনের।

সেনানীরা আচমকা দু-দিকে সরে মাঝখানে একটা সরু পথের মতো করে দিয়েছে, আর সেই পথ ধরে সামনে এগিয়ে আসছে একদল শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, মুণ্ডিতমস্তক, গৌরবর্ণ মানুষ। একদম সামনের জনই বাজিয়ে চলছে সেই শিঙ্গা। দেখতেই দেখতে সেই দল একদম প্রথমের সারিতে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকের দৃষ্টি শম্ভুপাদের দিকে নিবন্ধ।

এমন সময় একটা শিসের শব্দ, আর তারপরেই দেখা গেল ওদের আর শম্ভুপাদের মাঝে একখানা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পরক্ষনেই কালো ধোঁয়ার আস্তরণটা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মড়ন্তিকা। এখন ওকে আরও ভয়ংকর দেখতে লাগছে। চোখ দুটো থেকে নরকের সবুজ আগুন যেন ঠিকরে বেরিয়ে মহর্ষিকে দগ্ধ করে ফেলবে।

— "শম্ভুপাদ!"

— "তোর এখানে আসা উচিত হয়নি মড়ন্তিকা।" মড়ন্তিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল শম্ভুপাদ, "তোকে অনেকদিন আগে কী বলেছিলাম, মনে করে দেখ। দেবী তোর অধিকারে বাধা দেননি। তুই দেবীর পথে আসিস না। আসলে তার ফল মারাত্মক হবে। কিন্তু তুই কল্লকেশীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলি। এরপর মায়ের শাস্তির হাত থেকে তোকে কেউই বাঁচাতে..."

— "কে শাস্তি দেবে আমায়? রঙ্কিনী?" কথাটা বলেই একটা চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল মড়ন্তিকা, "সে আগে নিজে রক্ষা পাক আমাদের হাত থেকে। এই মন্দির, তোর মায়ের বিগ্রহ আমরা এক্ষুনি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলবো... তখন না থাকবে তোর দেবী, না থাকবে তার ক্ষমতা।"

— "যতক্ষণ থাকব... এই মন্দির ভাঙা তো দূর একটা ইট ও খুলতে দেব

না আমি।” মহর্ষির কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

— “তুই?” কথাটা বলেই এমন ভাবে হেসে উঠল মড়ন্তিকা যে পুরো দলটা সেই হাসিতে যোগ দিল। “তুই একলা আর আমরা এতজন... পারবি আমাদের সঙ্গে... আমার সেনানীর একটা ছোট্ট অংশই তোকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।” কথাটা বলেই সে পিছনের দলে একটা ইশারা করতেই দলের মধ্যে থেকে দু-জন পিশাচ ছুটে এল শম্ভুপাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্কিনীদেবীর সোনার খড়গে একটা আলোকবিচ্ছুরণ ঘটল। সকলে দেখল, মহর্ষি এক অলৌকিক মায়ায় খড়গটি থেকে ঠিক একইরকম প্রতিরূপ আরেকটি খড়গ টেনে বের করে হাতে ধরলেন। শুধু ধরলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে বিদ্যুৎ বেগে দু-খানা হাত চালালেন দুই পিশাচের পেট লক্ষ্য করে। সোনার জোড়া খড়গ একসাথে ঝলসে উঠল। কয়েকমুহূর্ত মাত্র, সকলে দেখল সেই দুই পিশাচ ছাই হয়ে হাওয়ায় মিশে গেল যেন।

মড়ন্তিকা আবার ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে চার জন ধেয়ে এল একসঙ্গে দাঁত মুখ নখ বের করে। যেন ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে পারলে শান্তি ওদের। মহর্ষি একটা মরণ লাফ দিয়ে একসঙ্গে দু'হাত চালালেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারটে মুণ্ডু কেটে মাটিতে পড়তে না পড়তেই চারখানা দেহ আবার ছাই হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। মহর্ষির মুখে চিন্তার রেখা। এভাবে তিনি কতক্ষণ পারবেন টিকে থাকতে? দেবীর আশীর্বাদে মহর্ষি হয়তো মারা যাবেন না, কিন্তু এইবার যদি একসঙ্গে অনেকজন এগিয়ে আসে তখন? তখন কি তিনি মন্দির বাঁচাতে পারবেন?

ঠিক এমন সময় বিকশবাহুরা সামনে এগিয়ে এল। ওদের চোখে কুটিলতা। মুখে নারকীয় হাসি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের হাত জোড়া শম্ভুপাদের দিকে তাক করে অজানা ভাষায় মন্ত্রপাঠ করে উঠতেই ওদের করতল হতে প্রচণ্ড বিধ্বংসী একটা কালো ধোঁয়া ধেয়ে এল মহর্ষির দিকে। মহর্ষি এক মুহূর্ত দেরি না করে মুখের সামনে দু-খানা খড়গকে মেলে ধরে পরস্পরের ওপর আঘাত করতেই 'ঠং!' করে একটা ধাতব শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আর তারপরেই একটা সোনালি আলোর বলয় ঢাল হয়ে মহর্ষিকে সেই

কালো ধোঁয়ার থেকে রক্ষা করল। মড়ন্তিকা জিব বের করে হেসে উঠে চিৎকার করে উঠল, "তুই একলা পারবি না শম্ভুপাদ। কখনওই একলা পারবি না।"

— "এটাই তো তোর সব থেকে বড় ভুল মড়ন্তিকা, আমি কখনওই একলা নই। মা রঙ্কিনী সব সময় আমার সঙ্গে আছে। সবসময়।" কথাটা বলার পরে তার মনে হল, অলক্ষ্যে কারোর থেকে যেন তিনি একটা নির্দেশ পেলেন। এক মুহূর্ত দেরি না করে চিৎকার করে উঠলেন, "জয় মা রঙ্কিনী!"

আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার জোড়া খড়গখানা তুলে মাটিতে একটা সজোরে কোপ মারলেন। পরক্ষণেই পায়ের তলায় যেন ভূমিকম্প অনুভূত হল। আর তারপরেই আকাশ থেকে একসঙ্গে আটখানা খানা বিদ্যুতের ঝিলিক নেমে এল ঠিক শম্ভুপাদের একহাত সামনে। সেই বিদ্যুতের তেজে শম্ভুপাদের কোনো ক্ষতি হল না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই শম্ভুপাদের দিকে ধেয়ে আসা একদল অপদেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আলোর তীব্রতা কমে যেতেই শম্ভুপাদ যা দেখলেন তার জন্য তিনি সত্যিই প্রস্তুত ছিলেন না। তার সামনে প্রাচীরের মতো তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আট জন মহিলা। এই আট জন মহিলা আর কেউ না, অষ্টমগর্ভের অষ্ট মাতারা। এদের মধ্যে বাকিদের মুখ মনে না থাকলে মহারানি কঙ্কাবতী চেহারা তার স্পষ্ট মনে আছে। এদের সকলের পরনে তাদের মৃত্যুকালীন পোশাক, এদের একহাতে ঢাল, অন্যহাতে বিরাট বড় খড়গ। তিনি মাতার ওপরে বিশ্বাস রেখেছেন এই দুঃসময়ে। তিনি অন্তর থেকেই উপলব্ধি করেছেন এই দুঃসময়েও মা তার সঙ্গে সব সময় থাকবে তাই তো এদের মাতা রঙ্কিনী পাঠিয়েছেন তাঁর সাহায্যার্থে। এই জন্যই মর্ত্যগন্ধর্বেরা তাঁকে প্রত্যেকখণ্ড জিহ্বার সঙ্গে এদের নাভিকুণ্ডলী স্থাপন করতে বলেছিলেন? মায়ের কী অপার মহিমা। আনন্দে চোখে যেন জল ভরে এল মহর্ষির।

কয়েকমুহূর্ত লাগল বিহ্বল মড়ন্তিকার ধাতস্থ হতে। আর তারপরেই সে প্রবল রাগে চিৎকার করে উঠল, "আক্রমণ!"

আর তারপরেই শুরু হল এক ভয়ংকর মহারণ। সে কী ভীষণ যুদ্ধ, ওর

হাত কাটে তো ওর পা, ওর গলা কাটে তো ওর মাথা। অষ্ট মাতা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁরা যেন মহর্ষিকে ঘিরে এক অভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। কেউ তাদের ভেদ করে মন্দিরের কাছাকাছি আসতে পারছে না। দু-একজন ওদের ফাঁক গলে মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়তেই তার জবাব দিচ্ছে মহর্ষির হাতে ধরা দেবী রঙ্কিনীর সোনার খড়গ। মুহূর্তেই ছাই হয়ে উড়ে যেতে লাগল তারা। দেখতেই দেখতে কল্লকেশীর সৈন্যসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে লাগল।

এইরকম ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে যখন ঠিক সেই সময় মহর্ষির মনে হল পেছনের রাস্তা বেয়ে একটা অদ্ভুত হুঙ্কার ধ্বনি যেন খুব দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে আসছে। চমকে উঠলেন মহর্ষি। কারা আসছে মন্দিরের বাম দিকের রাস্তা বেয়ে? আচমকা রাস্তার আলোয় চোখে পড়ল পিলপিল করে চার হাতে পায়ে লাফাতে লাফাতে মন্দিরের দিকে ধেয়ে আসছে অদ্ভুত দর্শন ভয়ংকর জীবের দল। এদের সারা শরীর মানুষের শরীরের মতো, হাড়ের খাঁচার ওপর কালো চামড়ার পাতলা আস্তরণ কিন্তু মুখগুলো বাদুড়ের মতো। এরা হল কল্লকেশীর প্রেতপিশাচী সেনানী। মানুষের কলিজা যকৃৎ এদের প্রধান খাবার। মহর্ষি জানতেন এরা বহু কাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কল্লকেশী নতুন রূপে ফিরে আসার পর সব অপদেবতা এক এক করে জেগে উঠছে। অষ্টমাতা আর সে সামাল দেবে কী করে এত জনের সঙ্গে?

ওরা প্রায় এসেই পড়ছে মন্দিরের কাছে। অষ্টমাতারা অন্যদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত। উপায় না দেখে মহর্ষি পেছনদিকে ঘুরে একাই রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু তিনি জানেন এদের সঙ্গে তিনি পারবেন না। কল্লকেশীর অনুচরদের মধ্যে এরা সবচেয়ে ভয়ংকর। এরা একসঙ্গে দলবেঁধে আক্রমণ করে। পেছন দিক থেকে আক্রমণ আসছে দেখে অষ্টমাতা সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ বৃত্তাকার একখানা মানব প্রাচীর গঠন করলেন মন্দিরের মূলফটক ও মহর্ষিকে ঘিরে। কিন্তু এত সৈন্যর সাথে তাঁরা পারবেন কেন? এদিকে অপদেবতা অন্যদিকে প্রেত পিশাচীদের দল। বিদ্যুতের বেগে হাত চলছে সকল মাতার কিন্তু এত সৈন্যকে সামলে রাখা মুখের কথা নয়। এক-এক জনকে চারিদিক থেকে বৃত্তাকার ভাবে ঘিরে

ধরে আক্রমণ করতে লাগল প্রেতপিশাচীর দল। এই আক্রমণে স্বভাবতই সেই অভেদ্য বলয় ভেঙে গেল তা এতক্ষণ মন্দির আর শম্ভুপাদের ধারে কাছে কাউকে আসতে দিচ্ছিল না। তাই আবার খড়গ হাতে আসরে নামতে বাধ্য হলেন শম্ভুপাদ। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?

আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল। আকাশের কালো মেঘের কুণ্ডলী ভেদ করে কালো ধোঁয়ায় আবৃত ছয়হাত বিশিষ্ট একটা লম্বা দেহ আকাশ থেকে নেমে সোজা শম্ভুপাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। মহর্ষি, কল্লকেশীর ভয়াল রূপের কথা আগে শুনেছিলেন কেবল, কিন্তু কোনোদিন দেখেনি। আজ সামনাসামনি সেই রূপ দেখে শিউরে উঠল শম্ভুপাদ। এ কে তার সামনে?

"শম্ভুপাদ!"

কিন্তু এই ভাব কয়েক মুহূর্তের মাত্র, পরক্ষণেই শম্ভুপাদ ধাতস্থ হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "তোর এখানে আসা উচিত হয়নি কল্লকেশী। মায়ের কোপে ধ্বংস হওয়ার থেকে তোকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না।"

— "আর তোর মায়ের মূর্তি ধ্বংস হওয়া থেকে তাঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে খাঁড়া তুলে কল্লকেশীর দিকে ছুটে এলেন শম্ভুপাদ, আর তখনই যেটা হল সেটার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিল না। কল্লকেশী দেহের চারপাশে ছড়িয়ে দিল নিজের ছয়খানা হাত। তারপরেই ছ-খানা হাতের করতল দিয়ে বেরিয়ে এল এক বিধ্বংসী আগুনের স্রোত। শম্ভুপাদ সঙ্গে সঙ্গে গুণিতক চিহ্নের মতো করে দুটো খড়গকে মুখের সামনে মেলে ধরতেই আবার সেই আলোর বলয়ের ঢাল তৈরি হল। কিন্তু সেই ঢাল সেই বিধ্বংসী স্রোতের সঙ্গে পারবে কেন?

মহর্ষি টের পাচ্ছেন, আগুনের স্রোতের প্রবাহ এত তীব্র যে তার পা মাটিতে স্থির থাকতে পারছে না। স্রোতের তেজে পা জোড়া হড়কে হড়কে আপনা থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। এই আগুনের ধারা তিনি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন না।

আর ঠিক তখনই তিনি দুটো খড়গকে একসঙ্গে করে দিতেই একটা আলোর

বিস্ফোরণ হল আর আগুনের স্রোতটা সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল যেন। মহর্ষি দেরী না করে খড়গটা উঁচিয়ে একটা জোরে লাফ দিলেন কল্লকেশীর গলা লক্ষ্য করে, কিন্তু কোনোরকমে মাথাটা ঝুঁকিয়ে মহর্ষির একখানা পা ধরে তাঁকে পিচের রাস্তার ওপরে সজোরে আছাড় মারল কল্লকেশী। সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি মন্দিরের চৌকাঠে ছিটকে পড়তেই মাথায় সজোরে আঘাত পেলেন। হাতের খড়গখানা ছিটকে পড়ল মন্দিরের গৃহগর্ভের ভেতরে। কল্লকেশী আকাশের পানে মুখ তুলে গলার ভেতর সাপের শিসের মতো একটা আওয়াজ করতেই প্রেত পিশাচীদের মধ্যে যেন একখানা কোলাহল পড়ে গেল। শম্ভুপাদ বুঝলেন কল্লকেশী নিজের সেনানীদের কিছু একটা নির্দেশ দিল। আর কী নির্দেশ দিল সেটা বুঝতে পেরেই আঁতকে উঠলেন শম্ভুপাদ। দলে দলে প্রেত পিশাচীরা লাফিয়ে লাফিয়ে মন্দির বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

আহত শম্ভুপাদ কোনোরকমে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই একখানা ভারী পা তাঁর বুকে চেপে বসল। কল্লকেশী তাঁর বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদিকে মন্দিরের ভেতরে একশো আট খানা প্রদীপের আলো একটা একটা করে নিবে যাচ্ছে। এ যে অমঙ্গলের নির্দেশ। তাহলে? শেষ রক্ষা হল না? এরা কী মায়ের মন্দির ধ্বংস করেই দেবে?

কল্লকেশী সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "দেখ শম্ভুপাদ, চোখ মেলে দেখ। কীভাবে তোর মায়ের অস্তিত্ব আমি শেষ করি। এই মন্দির ধ্বংস হলে আর কী কিছু রইবে? রইবে আর কিছু?" আর তারপরেই কল্লকেশীর বুকের রক্ত জল করা কুটিল হাসি।

শম্ভুপাদ দেখল একটা একটা করে সব প্রদীপ প্রায় নিবে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে গৃহগর্ভের ভেতরে। মাথার ওপর মেঘের কুণ্ডলীটা কালো হয়ে যেন নেমে আসছে মন্দিরের মাথায়। মহর্ষি বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পাচ্ছেন প্রেত পিশাচীরা মন্দিরের ওপরের ঘট পতাকা সব নীচে ছুঁড়ে ফেলছে।

শম্ভুপাদের চোখের দৃষ্টি তখন ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া মায়ের মূর্তির দিকে। ওদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি, অষ্টমাতার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার এদিকে

কল্লকেশীর অট্টহাসি। আর ঠিক এরই মাঝে আচমকা সমস্ত শব্দ ক্ষীণ হয়ে গেল আপনা থেকেই। আর শম্ভুপাদের মনে হল একজন কেউ খুব সুরেলা কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকছে।

"শ...ম্ভু..পা...দ..."

পরক্ষণেই শম্ভুপাদ যেন একটা অলৌকিক শক্তি টের পেল বুকের ভেতরে, তিনি সেই অবস্থাতেই চিৎকার করে উঠলেন,

"তুই কোনোদিন মানুষের পুজো পাবি না কল্লকেশী। কারণ দেবত্ব কী, সেটা বোঝা তোর কর্ম নয়। তুই বিশ্বাস করিস দেবালয় থাকলেই দেবতার মহিমা থাকে। তুই বিশ্বাস করিস দেবতাদের বাস এই বিগ্রহে। দেবতার বাস এই মন্দিরে। মন্দির, দেবালয় না থাকলে দেবী দেবতারা অস্তিত্বহীন। আরে এই মন্দির, এই দেবালয় এগুলো তো দেবতার উপাসনা করার মাধ্যম বই আর কিছুই নয়। দেবতার বাস আসলে মানুষের বিশ্বাসে। যেটা কেউ নিজে থেকে না চাইলে বাইরে থেকে কারোর পক্ষেই নষ্ট করা সম্ভব নয়। যতদিন একটি হৃদয়ের অন্তরস্থলে দেবী রঙ্কিনীর প্রতি বিশ্বাস থাকবে ততদিন তাঁর দেবীত্ব কেউ মলিন করতে পারবে না। তুইও নয়।"

আর এই কথাটা বলা মাত্রর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস জুড়ে লক্ষ লক্ষ শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাক একসঙ্গে বেজে উঠল যেন। বাতাসের পচা মাংসের দুর্গন্ধ দূরীভূত হল এক আশ্চর্য সুমিষ্ট চন্দন সুবাসে। সকলে যুদ্ধ থামিয়ে আবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। এমনকী কল্লকেশীও অবাক হল। আচমকা মহর্ষি দেখলেন মন্দিরের মেঝে ভেদ করে একখানা সাদা উজ্জ্বল আলোক পিণ্ড প্রবেশ করল দেবীর বিগ্রহে।

আর ঠিক তখনই একে অপরের থেকে বহু দূরে অবস্থিত সেই সাতটি রঙ্কিনী পীঠের গর্ভগৃহের মেঝে ভেদ করে সাতটি উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড প্রবল গতিতে ধেয়ে এল জাদুগোড়ার রঙ্কিনী মন্দিরের দিকে। তাদের আগমনে আকাশের অন্ধকার কেটে গেল। রাতের বেলা দেখে মনে হল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে দিনের আলো। ক্ষণিকের মুহূর্ত মাত্র, সাতটি আলোকপিণ্ড তীব্র গতিতে এসে দেবী রঙ্কিনী পাথরের বিগ্রহের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই এক উজ্জ্বল আলোর

বিস্ফোরণ হল মন্দিরের গৃহগর্ভের ভেতরে। আর তারপরেই এক জোরালো চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। আলোর বিস্ফোরণের তীব্রতা এত প্রখর ছিল যে সকলেই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। এমনকী কল্লকেশী আর মড়ন্তিকা পর্যন্ত।

আর তারপরেই যা হল, তার জন্য কল্লকেশী তো দূর, শম্ভুপাদও তৈরি ছিলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে মূর্হুমূহু বজ্রপাত হতে লাগল। সেই বজ্রপাতে পুড়ে ছাই হতে লাগল কল্লকেশীর সমস্ত অপসৈন্যরা। ওদিকে অষ্টমাতারা মুহূর্তেই কল্লকেশীর বলে বলীয়ান বিকশবাহুদের মুণ্ডু ধড় হতে আলাদা করতেই তারা ছাই হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ওদিকে মন্দিরের সব ক-টা ঘণ্টা বাজছে নিজে নিজেই। শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজ থামছেই না। যেন কোনো মঙ্গলময়ীর আবাহনে চরাচর মুখরিত হচ্ছে।

একে একে সবাই ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেতেই সেখানে বাকি রইল কেবল কল্লকেশী, মড়ন্তিকা, শম্ভুপাদ আর অষ্টমাতা। বিহ্বল কল্লকেশী বুঝে উঠতে পারল এটা কী করে সম্ভব? সেই মুহূর্তে মন্দিরের ভেতরের উজ্জ্বল সাদা আলোটা কমে যেতেই মন্দিরের ভেতরের দৃশ্যটা শম্ভুপাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল ছবির মত। আর তা দেখেই শিউরে উঠলেন মহর্ষি। এই শিউরে ওঠা ভয়ে নয়, আনন্দে।

মন্দিরের ভেতরে যেখানে রঙ্কিনী দেবীর বিগ্রহ ছিল ঠিক সেইখানেই এক কৃষ্ণবর্ণা কিশোরী দাঁড়িয়ে। যার শরীর থেকে দৈবিক উজ্জ্বল আভা ঠিকরে বেরচ্ছিল। সেই কিশোরীর মাথার একঢাল কালো চুল মন্দিরের মেঝেতে লোটাচ্ছে। পরনের লাল শাড়ি থেকে কস্তূরীর সুগন্ধ দিক্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়ছে।

মেয়েটি পায়ের কাছে পড়ে-থাকা সোনার খড়গখানি তুলে ধীর পায়ে মন্দিরের গৃহগর্ভের বাইরে বেরিয়ে এল।

মহর্ষির চোখে ক্রমাগত জলের ধারা সবকিছু ঝাপসা করে তুলছে যেন। এই মুখ এই চেহারা তিনি এর আগে বহুবার স্বপ্নে দেখেছেন। কখনও তিনি

এই মুখকে দেখেছেন সুবর্ণরেখার পাড়ে বসতে, কখনও দেখেছেন গুহার মেঝেতে পড়ে থাকতে, আবার কখনও দেখেছেন যুদ্ধ প্রান্তরে ধড়হীন মৃতের স্তূপ বানাতে। এ যে অন্য কেউ নন। স্বয়ং মা। মা রঙ্কিনী!

* * * * * * * *

— "মহান প্রভু কল্লকেশীর আদেশ, তোমরা এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবে..."

বিসন্তর কাপালিকের ঔদ্ধত্যমাখা স্বর ছড়িয়ে পড়ল প্রেত পর্বতের ভাঙা আশ্রমের কোণে কোণে...। আচমকা কল্লকেশীর শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিসন্তর সকলকে তুচ্ছ মনে করছে যেন। তার স্পর্ধায় প্রেত সাধকেরা যত না অবাক হল তার চেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হল।

— "তোমাদের কাছে মড়স্তিকা এসেছিল প্রভুর নির্দেশ নিয়ে। কিন্তু তোমরা সে নির্দেশ অমান্য করেছে। প্রভু তোমাদের শেষ সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের ভালো চাও তো প্রভুর স্মরণে এসো।"

— "না হলে?" প্রেত সাধকদের মধ্যে একজনের হাতে সেই রক্ত মাখা কাপড়টা যেটা কল্লকেশী দিয়েছিল এদের দেওয়ার জন্য।

— "না হলে, আমায় নিজের শক্তি প্রদর্শন করতে হবে... তখন তোমাদের কারো নিস্তার থাকবে না।" কথাটা বলেই হাতে ধরা বড় খাঁড়াটাকে ইঙ্গিত করল সে।

— "তা-ই...?" আরেকজন প্রেত সাধকের খোনা গলা ভেসে এল ভিড়ের মধ্যে, "দেখি তো, তুই কী করতে পারিস?"

— "দেখবি... দেখবি আমি কী করতে পারি?" চোয়াল শক্ত করে চিৎকার করে উঠল বিসন্তর, "তন্ত্রশক্তির প্রয়োগে... তোদের প্রত্যেকের আয়ু আমি শুষে...।"

কথাটা বলতে গিয়েই মাঝপথে থমকে গেল বিসন্তর। আচমকাই তার মনে হল সে যেন সবকিছু ভুলে গিয়েছে। মাথার ভেতরের স্মৃতির পাতাগুলো থেকে মন্ত্রগুলো কে যেন মুছে ফেলেছে একেবারে।

— "কী হল?" প্রেত সাধকদের মধ্যে একজনের কণ্ঠে উপহাস। "মন্ত্র মনে পড়ছে না?"

সত্যিই তো, তার কিছু মনে পড়ছে না। বিসম্ভর ভয়ার্ত চোখে তাকাল তাদের দিকে।

— "মনে পড়বেও না। এই জায়গাটাই এরকম। বাইরের কারো শক্তি এখানে কোনো কাজ করে না। এখানে শুধু আমাদের শক্তি কাজ করে।"

ঠিক এমন সময় পিছন থেকে একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ শুনেই বিসম্ভর চমকে উঠল। দু-জন প্রেতগুণীন ভাঙা আশ্রমের বিরাট বড় দরজাটা একটু একটু করে বন্ধ করে দিচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল, "আমায় আটকে রাখার ফল খুব খারাপ হবে। প্রভু কল্লকেশী তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে চিরতরে।"

— "আমাদের অতীতেও কেউ কিছুই করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না। সৃষ্টি যতদিন থাকবে আমরাও থাকবো অক্ষয় হয়ে রাঢ়ভূমের জমিতে। আমরা তোর প্রভুরও আগে থেকে এই রাঢ়ভূমে বসবাস করি। আমাদের হারানোর ক্ষমতা তার নেই।"

— "আর তাছাড়াও যা আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার উপর শুধু আমাদের অধিকার। তা আমাদের থেকে কেউ কোনোদিন কেড়ে নিতে পারে না।" প্রেত সাধকদের মুখের কুটিল হাসি।

— "দিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে?" বিসম্ভরের মুখে ভয়ের ছোঁয়া, "কে? তোমাদের কী দিয়েছে?"

— "যার সঙ্গে এই রক্ত মাখা কাপড় ফিরে আসবে... সে আমাদের হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে..."

— "মানে...?"

— "সে আমাদের থেকে প্রশ্নের উত্তর জেনেছিল... কিন্তু তার কাছে আমাদের দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তখন নিজের হাত কেটে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, সে আমাদের এক অমূল্য উপঢৌকন দিয়ে পাঠাবে। আর সে তার কথা রেখেছে। তুই অমূল্য। তোর মৃত্যু নেই সেটা আমরা বুঝতে

পেরে গিয়েছি। আমাদের পরিচারকেরা সাধারণ মানুষ হওয়ায় কিছুদিন পরে পরেই মারা যায়। সেখানে তুই সারাজীবন আমাদের সেবা করার সুযোগ পাবি...”

— “না...” আর্তনাদ করে উঠল বিসন্তর।

— “না নয়, হ্যাঁ। এখন তোর শুধু দরকার নিজের আসল রূপে ফিরে আসা। তাই না...?” কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত সাধক গুণীন কী একটা মন্ত্র পড়ল, আর একটা লাল ধোঁয়ার আস্তরণ এসে ঘিরে ধরল বিসন্তরকে। একটা ভয়ংকর আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল বিসন্তরের গলা থেকে। তারপর কী একটা হল যেন। কয়েক মুহূর্ত পরে সেই লাল ধোঁয়ার আস্তরণ সরে যেতেই টের পাওয়া গেল, বিসন্তরের শরীরে জ্বরা ফিরে এসেছে আগের মতো। সারা দেহের চামড়া ফেটে গাছের শিকড় গজিয়েছে। পিঠ ফেটে রক্ত ঝরছে। সারা মুখে, হাতে, পায়ে, গায়ে ঘা। কপালের ওপরে একটা পচা মাংস-পিণ্ড যাতে পোকা গিজগিজ করছে। আগে এসব সঙ্গে ছিল তবুও সে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছিল। কিন্তু এখানে এই জ্বরাগ্রস্ত রূপেই তাকে সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত প্রেত সাধকদের সেবা করে যেতে হবে। এই হল তার মতো পাপীর অপরাধের শাস্তি।

* * * * * * * *

কল্লকেশীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে প্রবল অবাক হয়েছে।

সে চিৎকার করে উঠল, “কে তুই?”

কিশোরীটি এক পা বাড়িয়ে বলল, “তোর মৃত্যু।”

কল্লকেশী শম্ভুপাদের বুকের থেকে পা সরিয়ে একপা পিছিয়ে গেল আপনা থেকেই। কিন্তু পরক্ষণেই কী একটা মনে পড়তেই সে হেসে উঠল, “আমার মৃত্যু? আমার মৃত্যু তো সম্ভবই নয়।”

কিশোরীটি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে কল্লকেশীর দিকে।

— “কেন সম্ভব নয়?”

— "কারণ আমায় রক্ষা করছে আমার পিতার আশীর্বাদ।"

মেয়েটি আরো এক-পা এগিয়ে এল, "মনে করে দেখ, তোর পিতা কী আশীর্বাদ দিয়েছিল? আগুনে পোড়ে না, কেবল এমন কোনো অস্ত্র যা তোর স্পর্শ পাবে কেবল তা দিয়েই তোর মৃত্যু হবে।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে অষ্টমাতৃকার দিকে তাকালেন। বোঝা গেল তিনি কিছু ইশারা করলেন। আর তারপরেই আবার অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। অষ্ট মাতৃকারা কিশোরীটিকে প্রণাম করতেই তাঁরা এক একজন বদলে গেল এক একটি আলোকপিণ্ডে। আর তারপরে তারা একে একে কিশোরীটির হাতে ধরা সোনার খড়গের ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই সোনার খড়গ এক উজ্জ্বল আভা বিকিরণ করতে লাগল।

— "মনে করে দেখ কল্লকেশী, অষ্টমাতৃকাদের সকলেরই আগুনে সৎকার হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ওদের অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। ওদের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান। সেই শক্তি এখন এই খড়গের ভিতরে। আর এই যে খড়গটা? এটাকে তাক করে তুই তোর ছয় হাতের করতল হতে আগুনের ধারা পাঠিয়েছিলি তা-ই না? অর্থাৎ এ পেয়েছে তোর হাতেরই স্পর্শ। অতএব..." কিশোরীটি কথা বলতেই বলতেই এগিয়ে আসছে কল্লকেশীর দিকে।

রাগে চিৎকার করে উঠল কল্লকেশী, "আমায় মারা এত সহজ নয়। এই অস্ত্র দিয়ে কেবল একবারই আঘাত করতে পারবি তুই আমাকে। আর আমি তোর সেই আঘাত বিফল করবই।"

কথাটা বলেই নিজের ছয় হাত আবার দেহের চারদিকে ছড়িয়ে দিল কল্লকেশী। সেখতেই দেখতে ছ-হাতে উৎপন্ন হচ্ছে ছ-টা আগুণের গোলক। নিশ্চয়ই এই দিয়ে সে আঘাত করবে কিশোরীটিকে। কিন্তু তার আগেই এক উজ্জ্বল চোখধাঁধানো আলো বেরিয়ে এল কিশোরীটির সারা শরীর দিয়ে। সেই আলোর দিকে একপলক ও তাকানো যায় না। কল্লকেশী সেই চোখধাঁধানো আলো থেকে বাঁচতে যেই চোখ বন্ধ করল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গতিতে কিশোরীটি এগিয়ে গেল কল্লকেশীর উদ্দেশে। তারপরেই দেখা গেল হাতের খড়গখানা মাথার ওপরে তুলে একটা ভয়ংকর লাফ দিল মেয়েটি। লাফ

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুকে দেখা দিল একটা উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো। আর সেই আলোয় সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল সোনার জ্যোতির্ময় খাঁড়াটি। শম্ভুপাদ বিস্ফারিত নয়নে দেখলেন মুহূর্তেই কল্লকেশীর দেহ... ধারালো খড়গের আঘাতে দু-টুকরো হয়ে পড়ে গেল। মারা গেল অগ্নির ভ্রষ্টপুত্র কল্লকেশী। ওদিকে কিশোরীটি কল্লকেশীর বিনাশ করেই ঘুরে দাঁড়াল মড়ন্তিকার দিকে। শম্ভুপাদ চমকে উঠলেন তাকে দেখে। একটু আগের কিশোরীর সদাহাস্যময় মুখে কল্লকেশীর রক্ত ছলকে পড়ায় তাকে দেখতে এখন অন্যরকম লাগছে। ঠিক যেন রণরঙ্গে মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাঁর হাতের খড়গখানা আপনা হতেই বিলীন হয়ে গেল বাতাসে।

আর বিলীন হয়ে যেতেই, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মড়ন্তিকা ভয়ংকরভাবে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। যেন খুব মজার কিছু ঘটেছে এক্ষুনি। মড়ন্তিকা এভাবে হাসছে কেন? শম্ভুপাদ অবাক হয়ে কিশোরীটির মুখের দিকে তাকাল। কিশোরীটির মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। শ্যামলা মুখে সদাহাস্যময় রূপটি আবার প্রস্ফুটিত। বেশ কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে মড়ন্তিকা হঠাৎ বলে উঠল, "হাতের দিব্য অস্ত্র, বিলীন হয়ে গেল একবার আঘাতের পরেই। এবার? এবার আমায় মারবি কী করে তুই?"

শম্ভুপাদের কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। তিনি কোনো ক্রমে কপালের ক্ষতস্থান চেপে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, "তোকে? তোকে মারার জন্য কোনো দিব্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাকি? তোকে তো আমার মা কটাক্ষেই শেষ করে দিতে পারে। এ তোর প্রতি আমার মায়ের অনুগ্রহ... যে তোকে এতদিন মা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।"

— "তাই?" কথাটা বলতেই একটা উপহাসের হাসি খেলে গেল মড়ন্তিকার ঠোঁটের কোলে। "এত সোজা...?"

— "রাঢ় পিশাচিনী, তোর শেষ সময় আগত। তোর আর পরিত্রাণ নেই।" দাঁতে দাঁত চেপে শম্ভুপাদ চিৎকার করে উঠতেই আবার একটা খিলখিলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মড়ন্তিকার গলায়।

— "রাঢ় পিশাচিনী!" কথাটা বলার মধ্যেই একখানা তির্যক ব্যঙ্গ ফুটে উঠল

মড়ন্তিকার কণ্ঠে, "আমি যদি রাঢ় পিশাচিনী হই। তা হলে ও কে..."

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মড়ন্তিকা নির্দেশ করল শম্ভুপাদের পেছনে। চমকে উঠে পেছন ঘুরল শম্ভুপাদ। আর যা দেখল তাতে তাঁর দুই চোখ যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এল।

রঙ্কিনী দেবীর পায়ের কাছে পড়ে থাকা দু-ফালা হওয়া কল্লকেশীর দেহটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে মড়ন্তিকার শরীরের আদলে।

— "কী, চমকে গেলি তো..." আচমকা পেছন থেকে কল্লকেশীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই চমকে সামনের দিকে তাকালেন মহর্ষি। তার যা দেখলেন, তাতে এই প্রথম খানিকটা শিউরে উঠলেন শম্ভুপাদ।

সামনে দাঁড়ানো মড়ন্তিকার দেহটা ধীরে ধীরে লম্বা হতে লাগল। আর এই লম্বা হতে হতেই গাছের ছাল ছাড়ানোর মতন করে নিজের শরীরের চামড়া ছাড়াতে লাগল মড়ন্তিকা। ঠিক যেন কোনো সাপ খোলস ত্যাগ করে নতুন রূপ গ্রহণ করছে। দেখতেই দেখতে একখানা কালো ধোঁয়া এসে মড়ন্তিকাকে ঘিরে ধরল। কয়েক মুহূর্তের মাত্র, তারপরেই ধোঁয়াটা সরে যেতেই দেখা গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে মড়ন্তিকা নয়। বরং খোদ কল্লকেশী।

শম্ভুপাদ অবাক। এ কী হল?

— "কী? অবাক হয়ে গেলি তো...?" কল্লকেশীর মুখে সেই আগের কুটিল হাসি, "দাঁড়া, তোদের একটা দৃশ্য দেখাই তাহলে ব্যাপারটা তোদের কাছে পরিষ্কার হবে..."

কথাটা বলেই কল্লকেশী দুই হাত মুখের কাছে এনে বিড়বিড় করে কী একখানা মন্ত্র পাঠ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখের সামনে চলমান ছবির মতো করে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল।

গুহার মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মড়ন্তিকা আর কল্লকেশী।

— "তাহলে আমার কাছে একটা পরিকল্পনা রয়েছে প্রভু।" মড়ন্তিকা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঠোঁটের খেলে গেল এক অন্যরকমের হাসি।

— "পরিকল্পনা?" কল্লকেশী সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করে উঠল, "কী পরিকল্পনা?"

— "শম্ভুপাদ দেবীর মন্দির পাহারা দিচ্ছে এটা জেনেই, যে আপনি আসছেন মন্দির ধ্বংস করতে। তারপরেও ও পাহারা দিচ্ছে, তার মানে ওর হাতে এমন কোনো অস্ত্র আছে যা ওকে ভয়হীন করে তুলেছে। এমতাবস্থায়, আপনি ওর সামনে সরাসরি গেলে আপনার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে প্রভু।"

— "এই হামলা বিনষ্ট করা, আর আপনাকে নিরাপদ রাখবার একটা উপায় আছে, সেটা হল আমরা দু-জনেই একে অপরের রূপ ধারণ করি। তাহলে শম্ভুপাদ বিভ্রান্ত হবে। ও আপনি মনে করে, সেই অস্ত্র দিয়ে আমার ওপর হামলা করবে। একবার সেই হামলা বিফল গেলে তখন সেই অস্ত্র বিনষ্ট হবে আর তখন ওর হাতে কিছুই করার থাকবে না... তখন আমরা আবার নিজের নিজের স্বরূপে ফিরে আসব।"

— "কিন্তু এতে করে তো তোর জীবন সংশয় হতে পারে?" কল্লকেশীর গলায় সন্দেহর ছোঁয়া। "তুই আমার জন্য নিজের জীবন সঙ্কটে ফেলবি?"

— "আমি তো এর আগেও আপনার কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা রেখেছিলাম প্রভু। তা ছাড়া... আপনার জন্য তৈরি অস্ত্রে কেবল আপনি বধ হবেন। সে অস্ত্রে অন্য কেউ বধ হবে না। অতএব আমি নিরাপদই থাকব..."

মড়ন্তিকা কল্লকেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতেই কল্লকেশী কিছুক্ষণ সময় নিল কথাটা ভাবতে। তারপর হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "বেশ ঠিক আছে। তোর প্রস্তাব মেনে নিয়ে তুই আর আমি রূপ বদল করলাম। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবি... এর পেছনে যদি তোর কোনো অন্য পরিকল্পনা থাকে তাহলে আমি তোকে নিজের হাতে শেষ করব।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কল্লকেশী ধীরে ধীরে মড়ন্তিকার রূপে পালটে গেল। আর মড়ন্তিকা কল্লকেশীর রূপে।

আর ঠিক তারপরেই শম্ভুপাদের চোখের সামনে থেকে দৃশ্যটা সরে যেতেই দেখা গেল কল্লকেশী তাঁদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

শম্ভুপাদ পুরো ব্যাপারটা এখন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। অর্থাৎ দেবী যাকে কল্লকেশী মনে করে দিব্যঅস্ত্র প্রয়োগ করলেন সে মড়ন্তিকা ছিল।

— "শম্ভুপাদ তো বোকা। কিন্তু আমি তোকে চালাক ভেবেছিলাম। এখন দেখলাম তুই শম্ভুপাদের থেকেও বোকা। কী সুন্দর আগে পিছনে না ভেবে নিজের দিব্য অস্ত্রের ভুল প্রয়োগ করলি। এরপর আমায় মারবি কী দিয়ে? আহারে! বেচারি মড়ন্তিকা। আমার জন্য বেঘোরে প্রাণ দিল নিজের।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চুকচুক করে মুখ থেকে আফসোসের একটা শব্দ বেরিয়ে এল কল্লকেশীর। শম্ভুপাদ দেখল মড়ন্তিকার দেহটা ধীরে ধীরে ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। তিনি সত্যি ভেবে পেলেন না, এরপর তারা কী করবেন? কী করে দেবী বধ করবেন কল্লকেশীকে? কিন্তু মায়ের মুখে সেই উদ্বেগের এক অংশও ধরা পড়ল না।

কল্লকেশী কথা বলা শেষ করতেই কিশোরীটির স্বর ছড়িয়ে পড়ল।

— "এই জগতে কারা সবচেয়ে বোকা জানিস কল্লকেশী, যারা অন্যদের বোকা মনে করে। যারা মনে করে আমি নিজে শক্তিশালী বাকিরা দুর্বল, আমি নিজে শ্রেষ্ঠ, বাকিরা নগণ্য। তোরও সেই দশা..."

এক মুহূর্ত থামল কিশোরীটি, তারপর একটা স্মিত হেসে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "এই যে দৃশ্য তুই আমাদের দেখালি, সেখানে মড়ন্তিকা তো তোকে বলেছিল, তোর জন্য তৈরি যে দিব্যঅস্ত্র সেটাতে তুই ছাড়া আর কেউই মরবে না। অথচ দেখ, সেই অস্ত্রের আঘাতেই মড়ন্তিকা দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। কেন? কীভাবে সম্ভব হল এটা? এই প্রশ্নটা একবারও তোর মাথায় এল না? আশ্চর্য!"

শম্ভুপাদ দেখল প্রশ্নটা শুনে কল্লকেশীর কপালে ভাঁজ দেখা দিল। সত্যি তো! এটা তো সে ভেবে দেখেনি।

— "তুই আমায় একটা দৃশ্য দেখালি, তা-ই না? এবার আমি তোকে একটা দৃশ্য দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখ..." কথাটা বলেই কিশোরীটি নিজের দুই নয়ন বন্ধ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুপাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল আরেকটি দৃশ্য।

প্রেতপর্বতের প্রেত সাধকেরা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে মড়ন্তিকাকে। আর তাদের মাঝে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে মড়ন্তিকা।

আচমকা ওদের মধ্যে থেকে একজন প্রেতসাধক গুণীন মড়ন্তিকার উদ্দেশে বলে উঠল, "আমরা একটাই তত্ত্বে বিশ্বাস করি, আর সেটা হল, এক হাতে জিনিস দাও... এক হাতে প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও।"

মড়ন্তিকা একমুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর পরনের কাপড়ের একাংশ ছিঁড়ে কোমরের কাপড়ে লুকিয়ে রাখা ছুরি দিয়ে হাতের করতল ফালাফালা করে সেই ছেঁড়া কাপড়ে হাতের রক্ত মুছে মাথার ওপর তুলে ধরল সেই কাপড়খানা।

— "এই কাপড়ে আমি নিজের রক্ত লাগিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। তিনরাত্রির মধ্যেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখব। নাহলে আমার মৃত্যু ঘটবে। আমি যা পাঠাবো তা অমূল্য হবে। আর সাথে এই রক্তমাখা কাপড়ও পাঠাব তোমাদের নিবেদনে। এই কাপড় যে জিনিসের সঙ্গে ফিরবে, তা-ই তোমাদের হবে। নাও, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। এবার তোমরা আমায় বলো আমি কল্লকেশীর সমান শক্তি কীভাবে পাব?"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। হয়তো এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব যাচাই করছে ওরা।

কিছুক্ষণ পরে প্রেত সাধকেদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "এই শক্তি তুই তখনই পাবি, যদি কোনো উপায়ে বিগ্রহ ধ্বংস হওয়ার সময় কল্লকেশীর আর তুই যদি একে অন্যের রূপ ধারণ করে থাকিস। এতে করে কল্লকেশীর শক্তি তোর দেহে আপনা থেকেই প্রবেশ করবে। আর সেই ধারণ করে তুই কল্লকেশীর সমান শক্তিশালী হয়ে উঠবি।"

— "এটা কী করে সম্ভব? কল্লকেশী কিছুতেই রাজি হবে না।" মড়ন্তিকা মাথা নাড়াতেই প্রেত সাধকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "সম্ভব হবে যদি তুই কল্লকেশীকে বলিস, শম্ভুপাদ তার জন্য একটি বিশেষ অস্ত্র নিয়ে মন্দিরে অপেক্ষা করবে সেইদিন। আর সেখানে গেলে তার বিপদ হতে পারে। কল্লকেশীর নিজের প্রাণের মায়া থাকবেই। কিন্তু সে শক্তিও সংগ্রহ করতে মরিয়া। এই সুযোগেই তুই রূপ পরিবর্তন করে সেখানে যাওয়ার কথা পাড়বি। তাহলেই হয়তো তোর কাজটা হয়ে যাবে।"

— "তবে সাবধান, সে আগে থেকে যেন তোর মনোভাব বুঝতে না

পারে।" আরেকজন প্রেত সাধক কথাটা বলতেই উঠে দাঁড়াল নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল মড়ন্তিকা,

চোখের মুখে এক চাপা উল্লাস। সে মাথা নেড়ে বলে উঠল, "নাহ, আমি তাকে নিজের মনের ভাব একটুও বুঝতে দেব না।"

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে দৃশ্যটা সরে যেতেই শম্ভুপাদ দেখতে পেল কল্লকেশী রাগে যেন থরথর করে কাঁপছে।

— "এর থেকে তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, জগতের কোনো কিছুই আমার থেকে লুকোনো যায় না। যা তোর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় ধরা পড়ে না, তা আপনা থেকেই আমার কাছে এসে ধরা দেয়। তাই আমি জগৎমাতা।" কিশোরীটির মুখে একটা কৌতুকের হাসি, "আমি জানতাম এখানে মড়ন্তিকা তোর ছদ্মবেশে আর তুই মড়ন্তিকার ছদ্মবেশেই আসবি। কিন্তু চেয়েছিলাম তুই যাতে নিজের থেকে নিজের স্বরূপে আমার কাছে এসে দাঁড়াস।

তা-ই তুই যেমন ছলের আশ্রয় নিলি, আমিও তেমন তোর সত্য প্রকাশের জন্য ছলের আশ্রয় নিলাম। তোর চোখের সামনে আমি এমন ভাব করলাম যাতে তুই মনে করিস, যে দিব্য-অস্ত্র প্রয়োগ করে ফেলেছি আর তুই নিরাপদে আছিস। কিন্তু যেটা দিয়ে মড়ন্তিকাকে ধ্বংস করলাম সেটা কোনো দিব্য-অস্ত্র ছিল না। সেটা ছিল আমার সাধারণ খড়্গ। তাই তার আঘাতে মড়ন্তিকা মারা গেল।

অষ্টমাতৃকা কোনোদিনই সেই শক্তি নয়। কারণ অষ্টমাতার শরীর আগুনে পুড়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। এখানে যাদের দেখছিলি তারা তো কেবল সেই অষ্টমাতার রূপধারী আমার আট যোগিনী। যাদের আমি শম্ভুপাদ আর মন্দির রক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম।"

— "তাহলে? তাহলে কী সেই অস্ত্র?" কল্লকেশীর কালো কালো চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল।

কিশোরীটি মৃদু হেসে বলল, "সেই অস্ত্র আর কিছুই নয়। স্বয়ং আমি... দেবী রঙ্কিনী"

— "মানে?"

— "জিহ্বার সন্ধান করার সময় তুই প্রত্যেকটা লাল শালুর মোড়কের ভেতরে একটা করে কালো পদার্থ পেয়েছিলি, সেগুলোকে তুই ময়লা ভেবে নিজের হাতে ছুঁড়ে ফেলেছিলি মন্দিরের গৃহগর্ভে, সেগুলো কী ছিল জানিস? আমার শক্তি অঙ্গরক্ষা করেছিল যেই অষ্টমাতারা, ওগুলো ছিল তাদের নাভিকুণ্ডলী। নাভিকুণ্ডলী একমাত্র জিনিস, যা আগুনে পোড়ে না। আমার শক্তিঅঙ্গের খণ্ড থেকে তুই একে একে শক্তি আহরণ করেছিলি।

যখন তুই শক্তি নিলি আমি তখন নিঃশেষ হয়েছিলাম। আমার শক্তি নিঃশেষ হওয়া দরকার ছিল, নইলে আমি নাভি কুণ্ডলীর পূর্ণশক্তি শরীরে ধারণ করতাম কেমন করে?"

কল্লকেশীর কণ্ঠে এখনও অবিশ্বাস, "এসব কী বলছিস তুই?"

— "তুই কী ভেবেছিলি জিহ্বাগুলো তুই পেয়েছিস? মূর্খ তুই! আমি চেয়েছিলাম, তা-ই তুই পেয়েছিস। আমি না চাইলে তুই কখনওই জিহ্বা গুলো পেতিস না। আমি চেয়েছিলাম তাই বিসম্ভরকে ওই অভিশাপ দিয়েছিলাম। যাতে তুই তার সূত্র ধরে এক এক করে জিহ্বার অষ্টখণ্ডের সন্ধান পাস। জগতে সব কিছুই আমার ইচ্ছায় হয়। আমার ইচ্ছা ব্যতীত এই জগতে কিছুই হয় না।"

মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল কল্লকেশী, তারপর মাথা যখন তুলল, তখন দেখা গেল, তার শরীরের শিরা-উপশিরায় যেন আগুনের প্রবাহ বইছে। নাকের গহ্বর থেকে কালো ধোঁয়ার মতো উত্তপ্ত নিঃশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে।

— "তুই কী ভেবেছিস? এইসব করে তুই আমায় শেষ করে দিবি। কখনই না।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দেহের দুই পাশে ছ-টা হাত মেলে ধরতেই, দেখা গেল সেই ছয় হাতেই তলোয়ার ধরা।

— "আমি এত সহজে হার মানবো না..." কথাটা বলেই সে মুখ দিয়ে একটা প্রবল চিৎকার করে ধেয়ে এল কিশোরীটির দিকে। কল্লকেশী একটা ভয়ংকর লাফ দিল কিশোরীটির উদ্দেশে আর তখনই জায়গাটা জুড়ে একটা আলোর বিস্ফোরণ হতেই শম্ভুপাদ একদিকে ছিটকে পড়লেন। পরক্ষণেই

আলোর তেজটা কমতে দেখা গেল কল্লকেশীর ছ-হাতের তলোয়ারের আঘাত ছয়হাতে সোনার খড়গ ধরে প্রতিরোধ করছে একটা কালো দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। মহিলার শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে এক জ্যোতির্ময় আভা। তার খোলা চুল হাওয়ায় এমন ভাবে উড়ছে যেন কালবৈশাখীর মেঘ। তার দুই নয়ন রক্তজবার মতো টকটকে লাল।

তিনি কল্লকেশীকে সজোরে ধাক্কা দিতেই কল্লকেশী ছিটকে পড়ল একপাশে। কিন্তু সে ক্ষান্ত হল না। আবার ছয় হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে এল জ্যোতির্ময়ীর দিকে। উলটোদিক থেকে এবার দেবীও ছুটে এলেন, আর তারপরেই শুরু হল এক মহারণ। পাহাড়, মন্দির, গাছ পালা সব কেঁপে উঠল থরথর করে। বইতে শুরু করল এক প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। যেন এইখানে এক্ষুনি মহাপ্রলয় নেমে আসবে। একজন আঘাত করছে তো অপরজন প্রতিরোধ করছে। এই ভীষণ সংগ্রাম চলতে চলতেই আচমকা একটা বজ্রপাত হল আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, অসি সহ কল্লকেশীর চারখানা হাত কেটে মাটিতে পড়ে গেল। সাথে সাথে এক ভয়ংকর আর্তনাদ করে পিছিয়ে এল কল্লকেশী। কয়েকমুহূর্তেই মুখের যন্ত্রণার ভাব বদলে গেল প্রচণ্ড রাগে আর তারপরেই অবশিষ্ট দুই হাতের তলোয়ার ফেলে সেই দু-হাত তাক করল রঙ্কিনীর দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে এক বিধ্বংসী লাভার স্রোত ধেয়ে এল দেবীর দিকে। মুহূর্তকাল ব্যয় না করে দেবী তার ছয় হাতের ছ-খানা খড়গ গুণিতকের আকারে নিজের সম্মুখে মেলে ধরতেই এক আলোর বলয় তৈরি হল দেবীকে ঘিরে। সেই বলয় কৃষ্ণগহ্বরের মতো সেই লাভা শুষে নিতে লাগল। শুধু কী লাভা? একসময় কল্লকেশীর মনে হল সেই আলোর বলয় তার ভেতরকার শক্তিও শুষে নিচ্ছে একই সঙ্গে। দেখতেই দেখতে একটা সময় পর ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল কল্লকেশী। বোঝাই গেল, দেবী স্বয়ং তার সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। তার মধ্যে আর কিছুই শক্তি অবশিষ্ট নাই।

দেবী প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছেন তখন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "স্মরণ কর, নিজের পাপ কল্লকেশী। স্মরণ কর। নিজের সমস্ত ভাইবোনেদের হত্যা।

দেবতাদের ওপর আক্রমণ। মর্তের নিরীহ মানুষদের ওপর তাণ্ডব। তোকে শাস্তি দিয়ে ঘুমপাড়ানোর পরেও তোর অন্যায় থামেনি। তারপরেও তুই অগণিত মানুষের সর্বনাশ করেছিস। আমায় অশুদ্ধ করেছিস। আজ আর তোর মুক্তি নেই। আজ আর তোর নিস্তার নেই।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালের ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠল এক তৃতীয় নয়ন। এমন সময় আবার যেন সেই লক্ষ লক্ষ শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা আবার বেজে উঠল চতুর্পাশে। আর তারপরেই সেই তৃতীয় নয়ন থেকে এক তীব্র সোনালি আলো স্রোত আঘাত করল কল্লকেশীকে। এক গগণবিদারী আর্তনাদ। শম্ভুপাদ কোনোরকমে চোখ মেলে দেখলেন, কল্লকেশীর ভয়ঙ্কর শরীরটা ফেটে ফেটে এক তীব্র আলো বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর তারপরেই একটা সোনালি আলোর বিস্ফোরণ। ক্ষণিকেই কল্লকেশীর দেহ ছাই হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল। শম্ভুপাদ আর চোখ মেলে তাকাতে পারলেন না। মাথাটা আপনিই ভার হয়ে এল। কিন্তু মাটিতে পড়বার আগের মুহূর্তে তার মনে হল দুটো মায়াভরা হাত যেন তাকে জড়িয়ে ধরল।

* * * * * * * *

শম্ভুপাদ চোখ যখন খুললেন, দেখলেন মন্দিরের গৃহগর্ভে শুয়ে আছেন, এক বালিকার কোলে মাথা দিয়ে। আর সেই বালিকা তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। সারা মন্দির জুড়ে চন্দনের সুমিষ্ট গন্ধ।

— "মা, মা... তুই এলি মা?" শম্ভুপাদের কণ্ঠে শ্রান্তি।

সেই মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, "তুই ডাকলি যে...। না এসে পারি?"

— "তুই এদের পাশে থাকবি তো মা..."

বালিকাটির মুখে হাসি, "থাকব। মায়েরা কখনও সন্তানকে ছাড়তে পারে? সে সন্তান যতই মাকে ভুল বুঝুক। স্বার্থ ফুরালে মা সন্তানদের কাছে ডাইনি, রক্তখাকিতে বদলে গেলেও, মা কি সত্যি সত্যি বদলে যায় রে?"

শম্ভুপাদের মুখের প্রশান্তির হাসি, “আমার ঘুম পাচ্ছে, মা...”

বালিকাটি তাঁর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, “হ্যাঁ, এবার শান্তিতে ঘুমো। তোর কাজ শেষ।”

শম্ভুপাদের দু-চোখ বেয়ে গভীর ঘুম নেমে আসছে। শেষবারের মতো চোখ মেলে দেখল, সেই বালিকা তাঁর পাশ থেকে উঠে ধীরে ধীরে একটা আলোকপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে রঙ্কিনীর পাথরের বিগ্রহের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

পূর্ব দিক ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে সূর্যের আলোয়। এক নতুন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেই মৃদু আলোয় দেখা গেল শম্ভুপাদের নশ্বর দেহটা ছাই হয়ে ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ধলভূমগড় রাজ্যের রাজগুরু মহর্ষি শম্ভুপাদ প্রতিরাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেন। পাহাড়ের কোলে জেগে থাকা রঙ্কিনী দেবী এই স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে কোনও ভয়ঙ্কর সর্বনাশের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কি! মহারানি কঙ্কাবতীই বা আজকাল রাজামশাইয়ের আশেপাশে যেতে ভয় পান কেন? কী সেই ঘটনা যার পর থেকে রাজামশাই আমুল বদলে গিয়েছেন? প্রেতপর্বতের প্রেতসাধক গুণীনদের বচন কি সত্যি প্রমাণিত হবে? মহর্ষি কি পারবেন দেবী রঙ্কিনী-র শক্তি-অঙ্গকে গর্ভপ্রাচীর দিয়ে রক্ষা করতে? নাকি শয়তানের অনুচরেরা জাগিয়ে তুলবে সেই ভয়ঙ্কর অপদেবতাকে যে আজও ঘুমিয়ে রয়েছে কালের গহ্বরে? মর্ত্যগন্ধর্বেরা কেন বললেন দেবী রঙ্কিনীর নিয়তিতে রয়েছে রক্তখাকি হওয়া? কেন আচমকাই লোকজন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে এক-একটা গ্রাম থেকে? কী হবে যেদিন সুবর্ণরেখার জল বদলে যাবে রক্তে, পাহাড়ের পাথরেরা প্রাণ পেয়ে চলাচল করবে আর রাতের অন্ধকার বদলে যাবে দিনে?
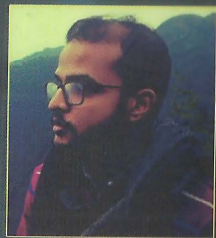
সাগর আর বিষাণ দু-জনেই খবর পায় ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়ার কাছাকাছি কোনও এক পাহাড়ি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে দীর্ঘজীবী মানুষেরা। লোকে বলে তারা নাকি অমর। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে ওরা জানতে পারে, সেই গ্রাম নাকি অভিশপ্ত! কীসের অভিশাপ! কেনই বা লোকে ভয় পায় গ্রামটি সম্পর্কে আলোচনা করতে? ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সাগর প্রতিনিয়ত পেতে থাকে নানা ধরনের হুমকি।

কেউ চায় না সাগর ঝাড়খণ্ডে যাক। কিন্তু কেন? সাগরের অতীতের সঙ্গে যুক্ত কোন্ শতাব্দী প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঝাড়খণ্ডে! সে কী পারবে সেই রহস্য ভেদ করতে? কে প্রতি অমাবস্যার গভীর রাতে রঙ্কিনী-র দরজায় নিজেকে চাবুকাঘাত করে আর চিৎকার করে 'মা আমায় ক্ষমা করো'? উত্তর দেবে অঙ্কুর বরের 'রঙ্কিনী'।

www.bivapublication.com